কাল থেকে ভালো হয়ে যাব

মাহিন মাহমুদ

কাল থেকে ভালো হয়ে যাব

প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০২২

গ্রন্থস্বত্ব : মো: রাকিবুল হাসান খান

প্রকাশনায়
মাকতাবাতুল হাসান
গিয়াস গার্ডেন বুক কমপ্লেক্স
৩৭ নর্থ ব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা
✆ ০১৭৮৭০০৭০৩০
অনলাইন পরিবেশক : rokomari.com - wafilife.com - quickkcart.com
পরিবেশক :
ISBN : 978-984-8012-83-3
Web : maktabatulhasan.com
E-mail : info.maktabatulhasan@gmail.com
fb/Maktabahasan

মুদ্রিত মূল্য : ৪৮০/- টাকা মাত্র

Kal Theke Valo Hoye Jabo
By Mahin Mahmud
Publiahed by : Maktabatul Hasan, Bangladesh

অর্পণ

বইটি লেখার প্রায় শেষ পর্যায়ে হঠাৎ আমার জীবনে এক চরম হতাশাজনক ঘটনা ঘটল। আমার প্রাণপ্রিয় মা চলে গেলেন আল্লাহর কাছে। আমরা সাত ভাইবোন যেন দুঃখের এক অকূল সাগরে পড়ে গেলাম। সবকিছু কেমন যেন স্থবির হয়ে গেল। আমাদের পুরো পৃথিবী যেন ডুবে গেল নিকষ আঁধারে।

মহান রবের কাছে নিবেদন, আল্লাহ যেন আমাদের মাকে জান্নাতুল ফেরদাউসের মেহমান বানিয়ে নেন। প্রিয় বাবার ছায়া আমাদের ওপর দীর্ঘায়িত করেন। ক্ষমা করে দেন, আমাদের সাত ভাইবোন-সহ পরিবারের সবাইকে।

সূচিপত্র

কাল থেকে ভালো হয়ে যাব ১১
নো মাস্ক, নো এন্ট্রি ১৫
প্যারালাইজড ঈমান ১৯
বকবকে আক্কেল ২৩
একটু ঠান্ডা মাথায় হিসাব করুন তো! ২৬
হুজুররাই ঠিক নাই, আমরা আর কী ঠিক হব ৩১
ঈশ্বরের হাত ৩৩
আমার একটা ছোট জান্নাত হলেই হবে ৩৫
ভয় এবং আশা ৩৭
দ্বীন মেনে চলা কি সত্যিই কঠিন? ৩৯
অশান্তি ছেড়ে প্রশান্তির দিকে ৪৪
রেজামান্দি ৪৬
কে আছ জোয়ান হও আগুয়ান ৪৭
টান ৫০
ন্যায়পরায়ণ ৫৩
তিনি আমাদের কাছে কী চান? ৫৪
কাকে ফাঁকি দিচ্ছি? ৫৯
প্রিয় আত্মসম্মানবোধসম্পন্ন বন্ধু! ৬১
জাহান্নামের কঠিন স্টেশন ৬৩
এ কেমন ভিক্ষুক! ৬৪
কখনো কি এভাবে সালাত আদায় করেছি? ৬৭
তিন সমস্যার এক সমাধান ৬৯
চির হতভাগ্য ৭১
শয়তানও আমার জন্য আফসোস করবে ৭৪
ভাবনার আয়না ৭৬
কুরআনের অসিলায় ৭৮

দোকানের নাম জুনায়েদ জামশেদ ৮০
তাওয়াক্কালতু আলাল্লাহ ৮২
বাইরে শেরোয়ানি ভেতরে পেরেশানি ৮৫
কে আমার রব! ৮৮
পুলিশের টাকায় গোশত-পরোটা ৯১
তখন কি তাকদিরের ভরসায় বসে থাকবেন? ৯৪
ব্যক্তিস্বাধীনতা : এক ভয়ানক শব্দসন্ত্রাস ৯৫
মনের পর্দাই বড় পর্দা ৯৮
মানুষ ঠিক করার মেশিন ১০১
একটু ভাবলেই বুঝতে পারব ১০৬
মিস্টার পারফেকশনিস্ট ১০৯
দোয়েল পাখির জীবন ১১১
কী অবাক পৃথিবী ১১৩
হৃদয়ে লেগেছে রং ১১৪
প্রেমে পড়েছেন কখনো? ১১৫
ইন এ রিলেশনশিপ ১১৭
আল্লাহর ফায়সালাই উত্তম ফায়সালা ১১৮
মনের খবর বুঝতে পারেন একজনই ১২১
অন্ধ ভালোবাসা ১২৩
নাফরমানি ছেড়ে দিলেই তো হয়! ১২৫
চাইতে হবে চাওয়ার মতো ১২৭
গা ঘেঁষে দাঁড়াবেন না ১২৯
তারুণ্যের আইডল ১৩০
সফলতার গল্প ১৩৩
মসজিদের কান্না ১৩৫
হেরে যাচ্ছি আমি, জিতে যাচ্ছে শয়তান ১৩৭
সিসি ক্যামেরা ১৩৯
ধরা খাওয়ার আগে ১৪২
বেঁচে গেলেই ভুলে যাই ১৪৫
অপমৃত্যু ১৪৯
নাটাইয়ের টান ১৫১

বিশ্বাসের নিশ্বাস নাই ১৫৩
হুজুর হয়ে এই কাজটা করল! ১৫৪
ভণ্ডপীরদের ভক্ত বৃদ্ধির রহস্যটা কী? ১৫৭
শিশু নির্যাতন : এক চরম নিমকহারামি ১৫৯
বাসা কিন্তু পালটাতেই হবে ১৬২
চায়ের কাপ ১৬৪
নির্বোধ জীবন ১৬৬
পাকাচুল সমাচার ১৬৮
অদ্ভুত সাইনবোর্ড! ১৭০
'প' আদ্যাক্ষরের এক অভিনেত্রী ১৭২
ধোঁকাবাজ দুনিয়াটা এমনই ১৭৫
জাদুর টাকা ১৭৬
ট্রেনের টিকেট ১৭৮
খুন করার আগে খুনির মৃত্যু ১৮০
আল্লাহর দান বিরিয়ানি ১৮৩
দুর্গন্ধের উৎস ১৮৫
ঠকবাজ-চালবাজ ১৮৬
সুইসাইড নোট ১৯২
কেন বঞ্চিত থাকব? ১৯৫
মন জয় করার সহজ অস্ত্র ১৯৭
মতবিরোধ কি অমঙ্গলজনক? ২০১
এমনটা আপনারও হতে পারত ২০৩
হুজুর, নামাজ কবে? ২০৫
কলেজ-ভার্সিটিপড়ুয়ারা কি দ্বীন থেকে দূরে? ২০৭
আয়নাতে কার মুখ দেখব ২০৯
লাইক-কমেন্টনির্ভর জীবন ২১০
অভ্যাসই মানুষের দাস ২১১
আফসোসটা অন্তত করি! ২১৭
প্রবাসী ভাইদের বলছি ২১৯
বিড়াল দাদু ২২২
পথের বন্ধু ২২৩

টাকাটা ভাংতি হবে? ২২৬
উপকারী জনপদ ২২৭
একরামি বিয়ে! ২৩১
ইমাম সাহেবের মোটর সাইকেল ২৩৪
নিজেকে রাঙাব ইসলামি রঙে ২৩৭
কে আমার বাবা? ২৩৮
একদিন আমার দোষও প্রকাশ হবে ২৪০
আমি কেমন মুসলমান? ২৪৩
অন্যকে ক্ষমা করুন ২৪৫
পালটে ফেলি চিন্তাটা ২৪৭
সেলিব্রিটি ২৫০
ছেলে আমার অভিনেতা ২৫৪
ইঞ্জেকশনের সুঁই ২৫৭
পানির ট্যাংক ২৫৯
হৃদয়ে মা জননী ২৬১
প্রিয় বাইকার, লেখাটি আপনার জন্য ২৬৯
ভয়েস অব গুলিস্তান ২৭১
ইনসাফগার রিকশাওয়ালা ২৭৩
সুস্থ থাকার নিরাপদ টিপস ২৭৭
তাহাজ্জুদের মজা ২৭৯
সচ্ছলতার সংজ্ঞা কী? ২৮০
স্ক্রু লাগানো হাত ২৮৬
একটি দুর্ঘটনা তিনজন ক্ষতিগ্রস্ত ২৮৭
কষ্ট করার নাম ইসলাম না, হুকুম মানার নাম ইসলাম ২৮৯
এসো আমরা মোমের মতো বাঁচি ২৯১
মানবতার দেয়াল ২৯৩
তালা-চাবি প্রেম ২৯৫
হিংসায় ধ্বংস, অহিংসায় বরকত ২৯৭
দ্বীন না থাকলে যা হয় ২৯৯
ভালো হয়ে যাও মাসুদ ৩০২

কাল থেকে ভালো হয়ে যাব

শয়তান আমাদের একটা বিপজ্জনক ধোঁকার মধ্যে ফেলে রেখেছে। এ ধোঁকার নাম—'কাল থেকে ভালো হয়ে যাব'।

যদি বলা হয়—

: ভাই, কাজটা কিন্তু ঠিক হচ্ছে না! মসজিদে আজান হচ্ছে, অথচ আপনি ফেসবুক নিয়ে বসে আছেন? চলেন না ভাই মসজিদে!

: হুজুর, আপনি যান আমার কাপড়চোপড় ঠিক নাই।

: এটা কোনো সমস্যা না। চলেন, বাসা থেকে পাক-পবিত্র কাপড় পরে নেবেন!

: না, ইয়ে মানে... আজকে না। দোয়া কইরেন। কাল থেকে ভালো হয়ে যাব। সব ছেড়েছুড়ে মসজিদেই পড়ে থাকব।

যদি বলা হয়—

: ভাই, মিথ্যা বলে ব্যবসা করা ঠিক না। মিথ্যা বলা মহাপাপ!

: কী করব বলেন? সত্য বললে তো লাভ বেশি করা যায় না। তাই একটু-আধটু মিথ্যা বলে নিচ্ছি। তবে কথা দিচ্ছি, কাল থেকে ভালো হয়ে যাব। এইসব ধোঁকাবাজি আর করব না।

যদি বলা হয়—

: ও ভাই, এবার অফ যান না। সুদ-ঘুষের ইনকাম আর কত? হালাল পথে চলেন না!

: হুজুর, দোয়া কইরেন। পাঁচতলাটা মাত্রই কমপ্লিট হলো। সামনের মাসে আরেকটা প্লট বুকিং দিতেছি। এরপর থেকেই!... সত্যি বলছি এরপর থেকে আমাকে আর এই লাইনে পাবেন না। একদম ভালো হয়ে যাব, দেইখেন!

কখনো কখনো নিজের বিবেককেই নিজে ধোঁকা দিতে থাকি—

: ইউটিউবে হারাম জিনিস আর দেখব না। কাল থেকে আর একবারও পর্ন সাইটে ঢুকব না। ফেসবুকে আর মেয়েদের সঙ্গে চ্যাটিং করব না।

বেগানা মেয়েদের ছবি পেলেই জুম করে তাকিয়ে থাকব না। তাদের নিয়ে খারাপ কল্পনা করব না। তাদেরকে 'ইমপ্রেস' করার জন্য গল্প-কবিতা লিখব না। তাদের একটু সান্নিধ্য পাওয়ার আশায় বইমেলায় ঘুরঘুর করব না।

: অযথা কোনো মেয়েকে ইনবক্সে বিরক্ত করব না। তাদের দুর্বলতাকে অসহায়ত্ব ভেবে 'সুযোগ' নেব না। হারাম রিলেশনে জড়াব না। যেটাতে জড়িয়েছি সেটাতেও আর কয়েক দিনই শুধু। এরপর ব্রেকাপ করে দিয়ে একদম ভালো হয়ে যাব, আর জীবনেও ওই পথ মাড়াব না।

প্রতিদিনই এসব বলছি। অথচ পরদিনই সব ভুলে যাচ্ছি।

বাচ্চারা চকলেটের জন্য কান্নাকাটি করে। ৫০০ টাকার নোট দিলেও সেই কান্না থামে না। চকলেটই তার চাই। কারণ, সে ৫০০ টাকার মূল্য বোঝে না। অথচ একটা ৫০০ টাকা দিয়ে কত কত চকলেটই না সে কিনতে পারত!

আমিও যেন আজ দুনিয়ার সামান্য 'চকলেট' এর জন্য আখেরাতের সুবিশাল নেয়ামত হাতছাড়া করতে রীতিমতো কান্না জুড়ে দিয়েছি।

কবরের আজাব থেকে মুক্তি? চাই না।

হাশরের ময়দানে আরশের ছায়া? চাই না।

পুলসিরাতের পথ সহজ হওয়া? চাই না।

বিনা হিসাবে জান্নাত? চাই না।

মহামহীয়ান আল্লাহর দিদার? চাই না।

যত যা-ই বলুন, একমাত্র দুনিয়াই আমার চাই! সব ভেসে যাক। গোল্লায় যাক আখেরাত। তবুও দোকান ছেড়ে জোহরে যাওয়া—চলবে না।

ঘুম ছেড়ে ফজরে যাওয়া—ইম্পসিবল!

বন্ধুদের আড্ডা ছেড়ে আছর-মাগরিব—হতেই পারে না!

সারা দিন কাজ করেছি—রাত হয়েছে—এখন ঘুমোতে হবে—এশা পড়া তো সম্ভবই না!

দুনিয়ার যৎসামান্য 'চকলেট' পাওয়ার আনন্দ আমাকে ধোঁকায় ফেলে রেখেছে। একেবারে বাচ্চাদের মতো হয়ে গেছি। যতই বোঝানো হোক—

দুনিয়ার সবকিছু শুধুই নমুনা। আখেরাতে আছে 'খাজানা'; আমরা বুঝতেই চাচ্ছি না!

দুনিয়ার সামান্য 'নমুনা'র প্রেমে পাগল হয়ে যাচ্ছি। লোভে চকচক করছে চোখ! নিজেকে ভাসিয়ে দিচ্ছি কামনার আগুনে। উঠতি বয়সি তরুণ বলেন, অথবা থুত্থুরে বুড়ো! কেউ থেমে নেই।

সুন্দরী একটা মেয়ে একটু হেসে কথা বলেছে কিংবা চোখ তুলে তাকিয়েছে! অথবা, ফেসবুকে-মেসেঞ্জারে নক করেছে! ব্যস, সেই মেয়ের প্রেমে যেন পড়তেই হবে। আসল না নকল, যাচাই করারও সময় নেই।

প্রিয় ভাই, নমুনাকে ছাড়ুন! যার হাতে পুরো খাজানা, তাঁর প্রেমে পড়ুন!

বাদশাহর সেই কালো বাঁদিটির কথা কি ভুলে গেছেন! যাকে কিনা বাদশাহ খুব বেশি পছন্দ করতেন। অথচ সুন্দরী-সুশ্রী, আনত নয়না অন্যান্য অনেক বাঁদি ছিল। তাদের দিকে বাদশাহর তেমন গুরুত্বই ছিল না।

আমাদের সুন্দরী বোনেরা তো ভেবেই নিয়েছেন—ছেলেরা তাদের দিকে ড্যাবড্যাবে চোখে তাকিয়ে থাকবে। না তাকালে তারা অপমানিত হন। বোনেরা বুঝতেই চান না; আল্লাহভীরু যুবকদের কাছে রূপের চেয়ে গুণের কদরই বেশি!

বাদশাহর সুন্দরী বাঁদিরাও অপমানিত হতো। তাদের গা জ্বলে যেত। একদিন তো বলেই বসল—'আচ্ছা মহামান্য বাদশাহ, একটা কথা জানতে পারি?'

'অবশ্যই পারো।'

'আমরা এত রূপবতী বাঁদি আপনার। অথচ...!'

কথা শেষ করার আগেই বাদশাহ ওদের থামিয়ে দিলেন। বললেন, 'আমি বুঝতে পেরেছি তোমরা কী বলতে চাও। কালোটাকে কেন এত পছন্দ করি, এই তো?'

'জি, মহারাজ!'

'এই প্রশ্নের উত্তর পাবে আগামীকাল। সকালবেলা আমার ধনভান্ডার কিছু সময়ের জন্য খুলে দেওয়া হবে। এই সময় হিরা, জহরত, মণিমুক্তা যে যেটা ধরবে সেটাই তার হয়ে যাবে।'

সকাল হলো। খুলে দেওয়া হলো ধনভান্ডারের দরজা। সুন্দরী বাঁদিরা ছুটে গিয়ে দামি দামি সোনার হার, হিরা খচিত অলংকার—যে যেটা পারল নিয়ে নিলো। শুধু একজন, সেই কালো বাঁদিটা, সে বোকার মতো দাঁড়িয়ে রইল বাদশাহর সিংহাসনের পেছনে।

সুন্দরীরা হাসতে লাগল তার এই বোকামি দেখে। ঠোঁট উলটে ব্যঙ্গ করে বলতে লাগল, 'এই বোকার হদ্দটাকে বাদশাহ এত পছন্দ করেন কেন কে জানে! বোকাটা এত সুবর্ণ সুযোগ পেয়েও হিরা-জহরতের কিছুই নিলো না।'

বাদশাহ তো সবই জানেন, তারপরও কালো বাঁদিটিকে প্রশ্ন করলেন, 'তুমি কি ঘোষণাটি শোনোনি?'

'জি, শুনেছি।'

'তাহলে? কেন এখানে দাঁড়িয়ে আছ? মণিমুক্তা, সোনা-গহনা নিচ্ছ না কেন? জানোই তো, যে যেটা ধরবে সেটাই তার হয়ে যাবে!'

'বাদশাহ নামদার, আমি তো ধরেছিই।'

'কী?'

'সিংহাসনে বসা বাদশাহকে। স্বয়ং বাদশাহই যদি আমার হয়ে যায়, আমার কি আর কিছু ধরার প্রয়োজন আছে?'

কালো বাঁদির কথা শুনে 'ধলাগুলো' হাঁ হয়ে গেল।

কালো একটা বাঁদি, দেখতে সুন্দর না অথচ কতটা বিচক্ষণ! বুঝতে পেরেছিল 'খাজানা'র মূল্য। আমরাই শুধু বুঝলাম না। অথবা বুঝি, কিন্তু বুঝটাকে কাজে লাগাতে লাগাতে সবকিছু হারিয়ে বসতে যাচ্ছি, নিচের গল্পের এই অফিসারটির মতো—

এক অফিসার তার সব কাজ চাকরবাকর দিয়ে করাতেন। যত অল্প কাজই হোক, নিজে করতে চাইতেন না। একদিন সকালবেলা। মাত্রই ঘুম থেকে উঠেছেন। উঠেই দেখেন তার ঘরে বানর ঢুকেছে। ঢুকেই ক্ষান্ত হয়নি, জিনিসপত্র লুটপাট শুরু করে দিয়েছে।

এক বানর স্যুট নিয়ে চলে যাচ্ছে তো আরেক বানর রওনা হচ্ছে পাজামা নিয়ে।... মাথার হ্যাট নিয়ে ভেগে যাচ্ছে এক বানর তো পায়ের

জুতা নিয়ে হাওয়া হচ্ছে অন্য আরেকটি। ভদ্রলোক বিছানায় শুয়ে শুয়েই চিৎকার করছিলেন, 'এখানে কি কোনো মানুষজন নেই? বানরগুলো তাড়িয়ে দিতে পারে না!'

চেঁচামেচি শুনে ভদ্রলোকের এক বন্ধু ছুটে এসে বললেন, 'মানুষ মানুষ বলে এত চেঁচাচ্ছ কেন, তুমি কি মানুষ নও? তুমিও তো তাড়াতে পারতে! এত অলস হলে কি চলবে?'

বন্ধুর কথা শুনে ভদ্রলোকের সংবিৎ ফিরে এলো। দৌড়ে গেলেন বানর তাড়াতে। ততক্ষণে বেচারার জামা-পাজামা নিয়ে বানরগুলো ভেগে গেছে।

'কাল থেকে ভালো হয়ে যাব' বলে এই যে অলসতায় ডুবে আছি! না জানি মৃত্যুর আগমুহূর্তে শয়তান আমার ঈমান নিয়ে ভেগে যায় কি না। প্রিয় ভাই! জামা-কাপড় চুরি হলে তো নতুন করে কেনা যায়। ঈমান চুরি হয়ে গেলে পরিস্থিতি কী হবে একবারও কি চিন্তা করেছি?

নো মাস্ক, নো এন্ট্রি

এক বন্ধুর বিয়েতে গিয়ে অবাক হলাম। ওয়েডিং সেন্টার না, যেন অপচয়ের রামরাজ্য! চারিদিকে ফুল আর ঝাড়বাতির ছড়াছড়ি। স্টেজেই মনে হয় কয়েক লাখ টাকার শ্রাদ্ধ হয়েছে। তার ওপর চলছিল নানান হিন্দুয়ানি কর্মকাণ্ড। কনেকে ঘিরে উঠতি যুবকেরা ফটোসেশন করছে।

একটাকে দেখলাম, বরের মুকুট মাথায় দিয়ে কনের গা ঘেঁষে বসে আছে! কনেকে জড়িয়ে ধরে সেলফি তুলছে! যেন সে-ই বর। আর তার পাশে সেজেগুজে বসা মেয়েটি তারই বউ! বন্ধুকে বললাম, 'এসব কী?'

'কোন সব?'

'তোর বউকে অন্যরা ভাগাভাগি করে নিয়ে যাচ্ছে, তোর খারাপ লাগছে না?'

বন্ধুটি আমার দিকে দুরকম দৃষ্টি নিয়ে তাকাল। প্রথমে বিরক্তির দৃষ্টিতে, পরে কটাক্ষ হেনে। শুধু তাকিয়েই ক্ষান্ত হলো না; বলেও ফেলল, 'ওই সব

বিধিনিষেধ এখন পকেটেই রেখে দে। এটা বিয়ে। বিয়ে জীবনে কয়বার হয়? এত কঠোর হলে কি চলে? এইটা নিষেধ, ওইটা হারাম। ধ্যাৎ! এত নিষেধাজ্ঞা কি মেনে চলা যায়, তুইই বল!'

অবাক হলাম।

আমার এই বন্ধুকে মোটামুটি দ্বীনদার হিসাবেই জানতাম। তার কথার সারাংশ হচ্ছে, 'জীবনের গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলোতে নিজের শখ-আহ্লাদকেই প্রাধান্য দেওয়া উচিত। হারাম-হালাল, আদেশ-নিষেধ নিয়ে ভাবার অত সময় কোথায়?'

ঠিক যেন নারীবাদি মেয়েদের মতো কথা, 'শরীরটাও নিজের, ইচ্ছাটাও নিজের। কাকে দেবো না দেবো আমিই জানি, মৌলবাদীদের (ইসলামের মূল বিষয়গুলো নিয়ে যারা সচেতন করেন, তাঁদের) বাধাবিপত্তি মানতে যাব কেন?'

ইসলাম মানার এ অবহেলা শুধু একজন-দুজনের মধ্যে না; পুরো মুসলিম সমাজের মধ্যেই ছড়িয়ে আছে। তাদের একটাই কথা, 'এইসব ছাড়েন তো! এত হালাল-হারাম যাচাই করে চলা কি সম্ভব? একটু আমোদফুর্তি তো করতেই হয়, তাই না!'

আমি বলব, দয়া করে এত 'ক্রেজি' হবেন না। আপনার কথামতো ইসলামি বিধিনিষেধ নাহয় একপাশে রাখলাম। এবার, সামাজিক অথবা আইনি বিধিনিষেধগুলোর দিকে একবার নজর দিন তো!

নিষেধাজ্ঞাটা নেই কোথায়?

ধরুন, প্রিয়তমা স্ত্রীকে নিয়ে পার্কে গেলেন। একটা ফুল দেখে আপনার আবেগ উথলে উঠল। প্রিয়তমার খোঁপায় গুঁজে দিতে যে-ই না ফুলে হাত দিলেন, দেখলেন পাশেই লেখা—'ফুল ছেঁড়া নিষেধ'।

অথবা একাই গেছেন পার্কে। ঘুরতে ঘুরতে ক্লান্ত। একটু ঘুমিয়ে নিতে যাবেন। লেখা—'ঘুমানো নিষেধ'।

পার্কে খুব সুন্দর একটা লেক। স্বচ্ছ পানি ঝলমল করছে। হঠাৎ দেখলেন লেকের পানিতে মাছও আছে! কী চমৎকার খলবল করছে! মনটা চনমন করে উঠল। হাতটা নিশপিশ করতে লাগল। গ্রামে থাকতে পুকুরে

কিংবা খালে নেমে কত মাছ ধরেছেন! এখানেও সেই ইচ্ছাটা চাগাড় দিয়ে উঠল। যেই না ছিপ ফেললেন, গার্ড এসে খপ করে ধরে বলল, 'বাংলা পড়তে পারেন?'

'জি পারি।'

'দেখছেন না কি লেখা আছে?'

ঘাড় ঘোরাতেই চোখে পড়ল, লেখা আছে—'মাছ ধরা নিষেধ।'

শপিং করে গেলেন। অথবা কোনো পাব্লিক প্লেসে আছেন। সিগারেট ধরাতে প্রচণ্ড ইচ্ছা হচ্ছিল। লেখা—'ধূমপান নিষেধ'।

করোনাকাল চলছে। জরুরি কাজে কোনো অফিসে ঢুকতে যাচ্ছিলেন। দরজায় লেখা—'নো মাস্ক, নো এন্ট্রি'। মাস্ক ছাড়া প্রবেশ নিষেধ।

নতুন একটা গাড়ি কিনেছেন। পরিবারের সবাইকে নিয়ে সেই গাড়িতে চড়ে বন্ধুর বাসায় বেড়াতে যাচ্ছেন। বন্ধু দুপুরের খাবারের দাওয়াত দিয়েছে। এখন বাজে বারোটার বেশি। তাড়াতাড়ি যাওয়া দরকার। শর্টকাট রাস্তা খুঁজছিলেন। পেয়েও গেলেন। গাড়িটা যে-ই না ঘোরাতে যাবেন, চোখে পড়ল নিষেধাজ্ঞা—'ইউটার্ন নিষেধ'।

অনেকটা পথ ঘুরে এসে নিলেনও ইউটার্ন। পরক্ষণেই পড়ে গেলেন একটা লোকাল বাসের পেছনে। যত্রতত্র যাত্রী তুলছে দেখে সতর্ক করার জন্য হর্ন বাজাতে যাবেন, পারবেন না। হয়তো কাছেই কোথাও লেখা—'হর্ন বাজানো নিষেধ'।

আরও কিছুদূর গেলেন। সামনে যানজট। আপনার দরকার দ্রুত এগিয়ে যাওয়া। গাড়িগুলোকে ওভারটেক করে যে এগিয়ে যাবেন, সম্ভব হলো না। লেখা—'ওভারটেকিং নিষেধ'।

জ্যামের মধ্যেই হঠাৎ দেখলেন একটা ফাঁকা রাস্তা। 'ফাঁকা মাঠে গোল দিতে' এগিয়ে যেতেই থমকে গেলেন। বিজিবির সদস্যরা রাইফেল হাতে দাঁড়িয়ে আছে। ফাঁকা পেয়ে সুযোগ বুঝে চলে যাবেন? ইম্পসিবল!

লেখা—'সংরক্ষিত এলাকা। প্রবেশ নিষেধ।'

এত টেনশন নিয়ে গাড়ি চালাচ্ছেন। তৃষ্ণায় বুকের ছাতি ফেটে যাচ্ছে। পানি কেনার জন্য একটা দোকানের সামনে দাঁড়ানোর চেষ্টা করতেই চোখে পড়ল—'এখানে পার্কিং নিষেধ'।

কী আর করা।

তৃষ্ণা নিবারণ হলো না!

ক্লান্ত হাতে গাড়ি চালাচ্ছেন। গাড়ির গতি শ্লথ হয়ে এসেছে। এবারও নিষেধাজ্ঞা—'এই পথ দিয়ে ধীর গতির মোটরযান চলাচল নিষেধ'।

গতি বাড়াবেন? তাতেও সমস্যা। লেখা—'গতি বাড়াবেন না। সর্বোচ্চ গতিসীমা ... কি. মি.।'

এরপর আরও আছে!

ডানে মোড় নিষেধ। বামে মোড় নিষেধ।

ওপরে ওঠা নিষেধ। নিচে নামা নিষেধ।

... দেখলেন তো? আপনার নিজের গাড়ি কোটি টাকার ওপরে মূল্য হলেও কি নিজের মতো করে চালাতে পারছেন? পারছেন না।

এখন আপনিই বলুন। বিধিনিষেধ না মেনে যদি গাড়িটি চালান, আপনার জন্য কি মঙ্গলজনক হয়ে? কখনোই না। হয়তো অ্যাকসিডেন্ট করে হাসপাতালের দীর্ঘস্থায়ী বাসিন্দা হয়ে যেতে পারেন। অথবা জীবনটাই কাটাতে হতে পারে 'ক্রাচের সেনাপতি' হয়ে চার দেয়ালের ভেতরে।

একটু বোঝার চেষ্টা করুন। 'জীবনগাড়িটি' চালাতে হলেও বিধিনিষেধ মানা জরুরি। নয়তো অ্যাকসিডেন্ট নিশ্চিত! এই অ্যাকসিডেন্ট কেউ আটকে রাখতে পারবে না। তথাকথিত সুশীলরা যতই আপনাকে 'স্বাধীনতা'র দিকে উসকে দিক, সময়মতো ওরাও তল্পি গুটিয়ে পালাবে! বিপদে আপনার পাশে এসে দাঁড়াবে না।

কেয়ামতের কঠিন দিনের কথা মনে করুন। যেখানে ওই সব সুশীলদের কোনোই 'বেইল' নেই! নরকের কোন বিভীষিকার মধ্যে পড়ে থাকবে, তারই তো ঠিক নেই, আপনার খবর নেবে কোত্থেকে?

প্যারালাইজড ঈমান

আপনার কাছে একটা স্মার্টফোন আছে। ফোনটি বিক্রি করতে চান। কিন্তু ফোনটিতে অনেক সমস্যা আছে। পাওয়ার বাটন ঠিকমতো কাজ করে না। সমস্যা আছে ভলিউম বাটনেও। সাউন্ড বাড়ানো কমানো যায় না। তা ছাড়া, প্রায়ই ফোন হ্যাং হয়ে যায়। চার্জও থাকে কম।

এখন এটি কীভাবে বিক্রি করবেন? সত্য বলে, নাকি মিথ্যা বলে? সত্য বললে কেউ কিনবে না। মিথ্যা বললে অন্যকে ঠকানো হবে। কী করবেন এখন? ভাবনায় পড়ে গেলেন। এই যে ভাবনাটা, 'কী করব এখন, কোনদিকে যাব'—এর নাম ঈমান। ঈমান আছে বলেই এমন ভাবনাটা এসেছে।

দোকান থেকে কিছু কিনেছেন। বিল হয়েছে ৪০০ টাকা। আপনি দোকানদারকে একটা ৫০০ টাকার নোট দিলেন। আপনার ফেরত পাওয়ার কথা ছিল ১০০ টাকা। কিন্তু দোকানদার ভেবেছিল, আপনি ১০০০ টাকার নোট দিয়েছেন। বেচারা ভুল করে আপনাকে ৫০০ টাকা বেশি দিয়ে ফেলল!

এখন আপনি কী করবেন?

আনন্দিত মনে চুপচাপ কেটে পড়বেন, নাকি অতিরিক্ত টাকাটা ফেরত দেবেন—এখানেই আসে ঈমানের প্রশ্ন।

আবার এমনও লোক আছে, রাস্তায় ১০ টাকা পড়ে থাকলে ওঠায় না। কিন্তু টাকাভরতি পুরো একটা মানিব্যাগের লোভ সে সামলাতে পারে না। অথবা একটা বাটনফোন পড়ে আছে, সে হয়তো ভ্রুক্ষেপও করল না। কিন্তু একটা স্মার্টফোনের লোভ থেকে সে বাঁচতে পারে না। কিছুক্ষণ এদিক-ওদিক তাকায়। এরপর সুযোগ পেলেই মানিব্যাগটা অথবা স্মার্টফোনটা পকেটে ঢুকিয়ে নেয়।

অর্থাৎ ঈমান আছে, কিন্তু এতটাই দুর্বল যে, এই ঈমান নিয়ে তার পক্ষে মূল্যবান কোনো কিছু আত্মসাৎ করার লোভ সামলানো কঠিন হয়ে পড়ে।

এ প্রসঙ্গে একটা ঘটনা মনে পড়ল। কয়েক মাস আগের কথা। দোকান থেকে কাপড় কিনে রিকশায় উঠেছি। তিন ব্যাগ কাপড়। তিনটা ব্যাগ একসঙ্গে নিয়ে বসতে কষ্ট হচ্ছিল। তাই একটা ব্যাগ রেখেছি রিকশার হুডের পেছনটায়। বাকিগুলো সামনেই। গন্তব্যে পৌঁছে রিকশা থেকে নেমে ভাড়া পরিশোধ করে বাসায় প্রবেশ করেছি। কিন্তু ততক্ষণে ঘটে গেছে দুর্ঘটনা। সামনের বড় ব্যাগগুলোই শুধু নামিয়েছি, পেছনের ব্যাগটা নামাতে আর মনে ছিল না। রিকশাওয়ালাও লক্ষ করেনি। সে ভাড়া নিয়ে চলে গেছে।

কিছুক্ষণ পর বাসার কলিংবেল বেজে উঠল। দরজা খুলতেই দেখি রিকশাওয়ালা দাঁড়িয়ে আছে। ব্যাগ যে ফেলে এসেছি, তখনো আমার মাথায় আসেনি। আমি অবাক গলায় বললাম,

'কী ব্যাপার ভাই, কী হয়েছে? ভাড়া কি কম দিয়েছি?'

'না।'

'তাহলে?'

'আপনার একটা ব্যাগ আমার রিকশায় ফেলে এসেছিলেন। সেটা ফেরত দিতে এসেছি।'

ব্যাগ ফেরত পেয়ে এত খুশি হলাম যে, বলার অপেক্ষা রাখে না। খুশি হয়ে কিছু টাকা রিকশাওয়ালাকে উপহার দিলাম। সে চলে যাওয়ার পর ব্যাগটা খুললাম। খুলেই বিস্মিত হতে হলো। ব্যাগের ভেতর থেকে একটা জামা গায়েব। আমার স্পষ্টই মনে আছে, চারটা জামা ছিল। কিন্তু এখন আছে তিনটা।

আর কোনো যাত্রীও ওঠেনি। যদি উঠতও, নিলে সে পুরো ব্যাগটাই নিয়ে যেত, ব্যাগ খুলে একটা রেখে বাকিগুলো ফেরত দিত না।

তার মানে, জামাটা রিকশাওয়ালাই রেখে দিয়েছে। সে হয়তো ভেবেছে, ফেরত তো দিচ্ছিই। একটা রেখে দিলে আর কী এমন ক্ষতি হবে! তিনটা যে দিচ্ছি, এ-ই তো বেশি।

অর্থাৎ কারও কারও ঈমান কখনো কখনো ছোটখাটো গুনাহ থেকে তো তাকে বিরত রাখে, কিন্তু বড় গুনাহ থেকে বাঁচাতে পারে না।

'নামাজ না পড়লে কী হবে, ঈমান ঠিক আছে'—বলা মানুষগুলোর ঈমান আছে সবচেয়ে অসুস্থ অবস্থায়। একেবারে প্যারালাইজড রোগীর মতো। 'পর্দা না করলে কী হবে, ঈমান ঠিক আছে। রোজা না রাখলে কী হবে, ঈমান ঠিক আছে। হজে না গেলে কী হবে? সত্য-মিথ্যা মিশিয়ে ব্যবসা করলে কী হবে—আমাদের ঈমান তো ঠিক আছে।'

অদ্ভুত কথা।

ধরুন, আপনি আজকে চমৎকার একটা পাঞ্জাবি গায়ে দিলেন। নামি কোনো ব্রান্ডের আউটলেট থেকে অনেক দাম দিয়ে কিনে আপনাকে কেউ গিফট করেছে। সারা দিন পাঞ্জাবিটা গায়ে দিয়ে আনন্দিত মনে ঘোরাঘুরি করলেন। পাঞ্জাবি দেখে সবাই অনেক প্রশংসা করল।

প্রশংসা শুনে আহ্লাদে আপনি আট-আট 'ষোলোখানা' হয়ে গেলেন। দারুণ একটা দিন পার হলো। রাতের বেলা বাসায় এসে পাঞ্জাবিটা খুলে হ্যাঙারে ঝুলিয়ে রেখে ঘুমাতে গেলেন। ঝামেলা বাধল সকালেই। ঘুম থেকে উঠে দেখেন পাঞ্জাবির একটা হাতা নেই।

কোথায় গেল হাতা?

তদন্তে ধরা পড়ল আসল ঘটনা। হাতাটা ইঁদুরের পেটে চালান হয়ে গেছে। কে জানে, বেচারা হয়তো পাউরুটি কিংবা পিৎজা ভেবে কুচিকুচি করে চেটেপুটে খেয়ে নিয়েছে! আপনি কি এখন বলবেন, 'হাতা গেছে তো কী হয়েছে? আমার পাঞ্জাবি তো ঠিক আছে!'

পরদিন দেখেন অন্য হাতাটিও নেই। এর পরদিন পিঠের একাংশও নেই। চলে গেছে ইঁদুরের পেটে। তবুও কি বলবেন, 'পিঠের অংশ আর হাতাই তো গেছে। পাঞ্জাবি তো ঠিক আছে।'

ঠিকই যদি থাকে, যান তো দেখি এই পাঞ্জাবি পরে বন্ধুর বিয়েতে! যান না দূরের কোনো ট্যুরে! যেতে কি পারবেন কাছেরই কোনো বাজারে?

কেন পারবেন না?

দামি পাঞ্জাবিই তো ছিল! প্রিয়জনই তো গিফট করেছে! তবুও কেন পারছেন না? কারণ এটা এখন আর পাঞ্জাবির পর্যায়ে নেই। এটা হয়ে গেছে কোনো দেশের 'মানচিত্র' অথবা পাতিল মোছার 'ন্যাকড়া'।

ঈমান আছে, নামাজের খবর নেই।

ঈমান আছে, জাকাত নেই।

ঈমান আছে, হালাল-হারামের পরোয়া নেই। টুপি নেই। দাড়ি নেই। কাপড়টা টাখনুর ওপরে উঠানো নেই। আমল-আখলাকের বালাই নেই... ভালোভাবে চিন্তা করে দেখুন তো, এই 'আধুরা' ঈমানে তাহলে আছেটা কী? এ তো হচ্ছে ওই মুদি দোকানটার মতো, যেখানে সাইনবোর্ড আছে মাল নেই।

সাইনবোর্ডে লেখা—এখানে সকল ধরনের মুদি ও মনোহারি মালামাল পাওয়া যায়—অথচ ভেতরটা খালি। কাস্টমার এসে জানতে চাইছে, 'চাল আছে?'

'নেই।'

'ডাল আছে?'

'নেই।'

'লবণ, পেঁয়াজ, মশলা?'

'জি না, নেই। অন্যকিছু লাগবে?'

আরে ভাই, যা থাকার কথা তা-ই তো নেই, অন্যকিছুর কথা জানতে চেয়ে লাভ কী?

যতই মাল-মশলাহীন হোক, নিজ দাবিতে অটল—এমন লোকও আছে বিস্তর! সর্বদা আল্লাহর হুকুমকে পাশ কাটিয়ে চলা কোনো লোককে যদি বলা হয়, 'মিয়া আপনি তো একটা বেঈমান!' সে খেপে যাবে। কিছুতেই মেনে নিতে চাইবে না। প্রয়োজনে আপনাকে একহাত দেখে নেবে। এমনকি মেরে আপনার নাকমুখ ফাটিয়েও দিতে পারে! তবুও 'বেঈমান' শব্দটি সে নিজের জন্য কিছুতেই সহ্য করবে না।

অথচ সে পর্দা নিয়ে কটাক্ষ করে। দাড়ি-টুপির কথা শুনলেই নাক সিটকায়। কুরআনের কোনো আয়াত তার চিন্তা-চেতনা আর মতাদর্শের বিপক্ষে গেলে চেঁচিয়ে মাঠ গরম করে। মুখে বলে 'রাসুলকে ভালোবাসি', অথচ রাসুলের আদর্শ মেনে চলা লোকদেরকে ছোট নজরে দেখে। গালাগালি করে। বিরুদ্ধে লেগে থাকে। তো, এই ঈমান তার জন্য দুনিয়াতেই-বা কী উপকারে এলো, ওপারেই-বা কী কাজে আসবে?

ঈমানের সঙ্গে পরিশুদ্ধ আমলও 'প্লাস' হওয়া চাই। ঈমান আছে আমল নাই; কাজ হবে না। ঈমান হচ্ছে 'এক' সংখ্যাটির মতো। এর ডানে যত বেশি সংখ্যা বসবে ততই তার মান বাড়বে। একের ডানে একটি শূন্য বসলে, ১০। আরেকটি বসলে, ১০০। এভাবে ১ হাজার, ১০ হাজার, ১ লাখ। কিন্তু বামে যদি কয়েক ট্রিলিয়ন সংখ্যাও বসান, লাভ হবে?

কোনো লাভ নেই।

'বামপন্থি' হওয়া মানে তো বঞ্চিত হয়ে খালি হাতে ওপারে যাওয়া। নিজের 'কু'-মতাদর্শ অন্যদের ওপর চাপিয়ে দিয়ে 'বুদ্ধিজীবী' উপাধি পাওয়া কত বামপন্থি যে অন্ধকার কবরে নিঃস্ব হয়ে পড়ে আছে; সেই হিসাব কে রাখে! অতএব, ঈমান ছেড়ে বামপন্থি হবেন, নাকি ঈমান নিয়ে ডানপন্থায় যাবেন; তা এখন আপনাকেই নির্ধারণ করতে হবে।

বকবকে আঙ্কেল

নরসিংদীর মাধবদীর দিকে যাচ্ছি। পাশের সিটে মধ্যবয়সী এক ভদ্রলোক। চুপচাপ বসে আছেন। আলাভোলা চেহারা। সৌজন্যতাবশত জানতে চেয়েছিলাম—'কোথায় নামবেন?'

এটাই যেন কাল হলো। ভদ্রলোকের কথার মেশিন সেই যে চালু হলো আর বন্ধ হওয়ার নাম নিলো না।

: ভৈরব।

: ভাড়া কত নিলো?

: ৬০ টাকা। লোকাল বাস তো! ডাইরেকে গেলে ২০০ টাকা নিত। আর বইলেন না, ওরা যা শুরু করেছে দিনে দুপুরে ডাকাতি। কোনো মাইন্য গইন্য (শ্রদ্ধাবোধ বোঝাতে চেয়েছিলেন বোধ হয়) নাই। এই দ্যাশে কোথাও আপনি মাইন্য গইন্য পাবেন না। (বুঝতে পারছিলাম না, বাসভাড়ার সাথে 'মাইন্য গইন্য'র সম্পর্ক কী? বুঝলাম একটু পরেই। বেচারা হজ করে এসেছেন। এবং সবসময়ই প্রসঙ্গ ছাড়াই সে বিষয়টা হাইলাইট করতে চান, যত অপরিচিত মানুষের সঙ্গেই হোক।) মনে করেন

এই যে আমি হজ করে এলাম। হজে যাওয়া কী যে কষ্ট! দুইবার হজ করেছি। আপনে করেছেন?

: আমি ডানে বামে মাথা নাড়লাম। করিনি।

: এইটা ঠিক করেন নাই। দেরি করা ঠিক না। আমি তো একে একে দুইবার করে ফেললাম। এইবারও যাব। আহ! ওখানে সবাই সবাইকে মানে। শ্রদ্ধা করে। আর এইখানে? আমারে জিগায়, আপনে ছোট হজ করছেন, নাকি বড় হজ? কন তো দেখি! এইটা কোনো কথা? হজের কি ছোট বড় আছে? হজ তো হজই। সৌদি আরব যাইতে হয়। প্লেন আছে, এয়ারপোর্ট আছে, পাসপোর্ট করতে হয়। কষ্ট তো একই। এইটা কি আর সবাই পারে?

বাসে উঠলে এমনিতেই আমার মাথাব্যথা করে। এই সময় কথা বলা, কথা শোনা, পত্রিকা পড়া, মোবাইল ব্যবহার ইত্যাদি এড়িয়ে চলি। বাসে এগুলো পীড়াদায়ক মনে হয়।

ভদ্রলোক যেন আমাকে পেয়ে বসলেন। থামছিলেনই না। আমি বিপদে পড়ে গেলাম। কেন যে সৌজন্যতাবোধ দেখাতে গিয়েছিলাম! বিপদ থেকে বাঁচার জন্য পকেট থেকে মোবাইল ফোন বের করলাম। কোনো নাম্বার ডায়াল না করেই কানে দিয়ে এমন একটা ভাব নিলাম, যেন কারও সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ কোনো কথা বলছি।

ভেবেছিলাম এতে ভদ্রলোকের 'কথামেশিন' থেমে যাবে।

মোটেও থামল না।

মেশিন আগের চেয়েও নতুন উদ্যমে চালু হলো। এরপরের টপিকটা আরও বিপজ্জনক!

: আপনে তো হুজুর মানুষ। দাড়ি নিয়া কিছু কথা বলি। মনে কিছু করবেন না। দাড়ি রাখি নাই দেখে এলাকার ছেলেপিলেরা বলে, কীসের হজ করলেন কাকা! দাড়িটাই রাখতে পারলেন না? আমি তো জানি কীজন্য দাড়ি রাখি নাই। কী বলেন, জানি না? মনে করেন দাড়ি রাইখা যদি আজেবাজে কাজ করি, তাইলে দাড়ির অপমান হইব না? অগোর খালি একটাই কথা— দাড়ি রাখেন না, নামাজ পড়েন না। অগোর চেয়ে কি আমার বুঝ কম? আমি তো জানি, কেন আমি নামাজ পড়ি না।

ভদ্রলোকের বকবকানি চলতেই থাকল। আমাকে কিছু বলার সুযোগও দিলেন না। তাকেও কোনো অজুহাতে থামানো গেল না। পকেটে টিস্যু আছে। ইচ্ছা করছিল, কানে টিস্যু গুঁজে দিয়ে বসে থাকি। কিন্তু এই ভদ্রলোকের কাছে টিসুফিস্যু পাত্তা পাবে বলে মনে হলো না। এরই মধ্যে আমার গন্তব্য এসে গেল। নেমে যেতে বাধ্য হলাম। নয়তো কথা বলার সুযোগ পেলে বলতাম—

: হাজি সাহেব, ছেলেপিলেরা তো ঠিকই বলেছে। হজ একটা ফরজ কাজ। আল্লাহ আপনাকে দিয়ে সেই কাজটা করিয়েছেন। অথচ আপনি 'আজেবাজে কাজ'-এর বিনিময়ে হজের গুরুত্বকে তুচ্ছ করে দিচ্ছেন। আজেবাজে কাজ আপনাকে দাড়ি রাখা থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছে। এত টাকা খরচ করে মক্কায় গিয়ে আল্লাহর ঘর তাওয়াফ করে এসেছেন, অথচ আপনার মহল্লায় আল্লাহর যে ঘরটি আছে সেটিতে প্রবেশ করতে পারছেন না। এর চেয়ে দুর্ভাগ্যের বিষয় আর কী হতে পারে?

এই 'বকবকে' আঙ্কেলের মতো অনেকেই আছে, দ্বীনকে নিজের খেয়াল-খুশি মতো ব্যবহার করছে। 'শয়তানি' করতে পারবে না বলে নির্দ্বিধায় আল্লাহর আদেশগুলো ছেড়ে দিচ্ছে। অথচ বলা হয়েছে—'নিশ্চয় নামাজ মানুষকে মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে।' [সুরা আনকাবুত, ৪৫]

এরা নামাজের ধারেকাছেও যাবে না পাপ কাজ ছেড়ে দেওয়ার ভয়ে। এদের কথা হলো—আল্লাহর হুকুম ছাড়তে পারব কিন্তু মিথ্যা বলা, গিবত করা, কবিরা গুনাহ করা কিছুতেই ছাড়তে পারব না।

আচ্ছা, এই ভাইয়ারা কি খিদে মিটে যাওয়ার ভয়ে খানা ছেড়ে দেয়? না কি সুস্থ হয়ে যাওয়ার ভয়ে ওষুধ ছেড়ে দেয়?

তা তো ছাড়ে না। বরং খাবার সামনে পেলে বাপকেও ভুলে যায়। আর যদি বিয়ে বাড়ির খানা হয় তাহলে তো কথাই নেই! পুরো খান্দানকে ভুলে গপাগপ খেতে থাকে।

তেমনই অসুখ-বিসুখে কখনো দৌড়ায় ডাক্তারের কাছে—যত টেস্ট আছে দেন। তবুও সুস্থ হওয়া চাই! কখনো দৌড়ায় কবিরাজের কাছে—লতাপাতা, ডালপালা যা আছে খাওয়ান, তবুও সুস্থতা চাই!

শরীরের খিদে তো গলা পর্যন্ত মেটায়, কিন্তু অন্তরের খিদের ব্যাপার এলে শুরু করে নানান রকম টালবাহানা। দেহের সুস্থতার জন্য তো লন্ডন-আমেরিকা দৌড়ায়, কিন্তু আত্মার সুস্থতার জন্য বাড়ির কাছের মসজিদে যেতে পারে না।

আল্লাহ হেদায়েত দিন।

একটু ঠান্ডা মাথায় হিসাব করুন তো!

'চাচা, কেমন আছেন?'

'আছি কোনোরকম।'

'চাচা, যদি কিছু মনে না করেন একটা কথা বলি?'

'বলেন।'

'আছি কোনোরকম না বলে, যদি বলেন—আলহামদুলিল্লাহ! আল্লাহ ভালো রেখেছেন, তাহলে আল্লাহ খুশি হতেন। আল্লাহকে তো আমরা সবাই খুশি করতে চাই, তাই না?'

'না। আমি চাই না।'

প্রিয় পাঠক, এ পর্যন্ত পড়ে নিশ্চয় থমকে গেছেন! চাচা মিয়ার ওপর মনে মনে খেপে গিয়ে বলছেন, 'বলে কী লোকটা? সে নাকি আল্লাহকে খুশি করতে চায় না।'

দয়া করে খেপে যাবেন না। পৃথিবীতে উলটাপালটা বুঝ নিয়ে এমন অনেক মানুষই বেঁচে আছে! রেগে-খেপে না গিয়ে একটু বুঝিয়ে বললে অনেকেই ভুল ধারণা বা ক্ষোভ থেকে ফিরে আসে।

শুধু এই চাচা মিয়াই না; অনেককেই দেখেছি মহান আল্লাহর ওপর অসন্তুষ্টি প্রকাশ করতে। এদের কেউ আছে অজ্ঞতাবশত এমনটা করে। কেউ আছে 'জ্ঞানের বিশালতার কারণে' অহংকারবশত উলটাপালটা কথা বলে। অনেকে আবার হতাশ গলায় বলে ওঠে, 'আল্লাহর কাছে কত কিছু চাইলাম কিছুই দিলো না!'

এই চাচা মিয়াও এই ক্যাটাগরিরই। তার কথা হলো, 'নামাজ-রোজা করে দেখছি, কিছুই পাই না। এজন্যই নামাজের ধারেকাছে যাই না।'

আসলে পৃথিবীটাই চলছে 'গিভ অ্যান্ড টেক' নীতিতে। কিছু দাও তো কিছু পাবে। পাওয়া ছাড়া দেওয়ার চিন্তা কেউ করতেই চায় না; বরং দিয়েও অনেক সময় পাওয়ার আশা করা যায় না—স্বার্থপরের মতো আচরণ।

অবস্থাটা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, আল্লাহর কাছ থেকেও আমরা এমনটাই আশা করি। মানে, আল্লাহ আগে আমাকে ধনসম্পদ দিক, এরপরই আমি নামাজ-রোজার দিকে যাব; তার আগে না। জঘন্যতম স্বার্থপর আর কাকে বলে!

আচ্ছা, একটু ঠান্ডা মাথায় হিসাবটা করুন তো! পৃথিবীতে যেদিন আপনি এলেন, সেদিন থেকে হিসাব করুন। না, বরং আরেকটু পেছনে যান। যখন আপনি মায়ের পেটে ছিলেন, তখন থেকে শুরু করুন হিসাবটা। প্রয়োজনে একটা ক্যালকুলেটর নিন।

মায়ের পেটে আপনার তখন চারমাস চলছে। ভেতরটা পুরোপুরি অন্ধকার। কোনো আলো-বাতাস নেই। বাইরে থেকে কেউ আপনাকে খাবার সাপ্লাই দেওয়ার মতো নেই। না ফুডপান্ডা, না হাংরিনাকি, না পাঠাও-উবার ইটস।

তাহলে কে দিলো খাবার সাপ্লাই?

এরপর আপনি দুনিয়াতে এলেন। মুখফুটে কারও কাছে কিছু চাওয়ার মতো শক্তি নেই। কী করে বোঝাবেন, ক্ষুধা লেগেছে? হাত-পা ছুড়ে কান্না করা ছাড়া আর কোনো ক্ষমতা তো নেই! আপনার কান্না দেখে মায়ের মনে গভীর মমতা তৈরি হলো। তিনি বুঝতে পারলেন আপনি এখন ক্ষুধার্ত! মায়ের কাছেই আছে আপনার উপযোগী খাদ্য। যার বিকল্প কিংবা সমকক্ষ আর কিছু নেই।

এবার বলুন, আপনার জন্য সময়োপযোগী এই খাবারটি মায়ের শরীরে কে পৌঁছে দিলো? কেই-বা মায়ের মনে আপনার প্রতি গভীর মমত্ববোধ তৈরি করে দিলো?

আপনি ধীরে ধীরে বড় হচ্ছেন।

খাবারের চাহিদা বাড়ছে।

শুধু বুকের দুধে চলছে না। প্রয়োজন ভাত, মাছ, মাংসের। আপনি তো চাকরি করছেন না। ব্যবসা-বাণিজ্য করার মতো অবস্থানে এখনো পৌঁছতে পারেননি। কৃষিকাজ করবেন? সেই সক্ষমতাও নেই। দুর্বল, অসহায়, জরাগ্রস্ত আপনি! এই অসহায় অবস্থায় বয়সোপযোগী আহারের ব্যবস্থা কে করে দিলো?

এই যে সাত, আট, নয় বছর... এভাবে আরও বড় হলেন। তখনো আপনার ওপর নামাজ ফরজ হয়নি। রোজা, হজ, জাকাত, কুরবানি কিছুই বাধ্যতামূলক করা হয়নি। কিন্তু ততদিন পর্যন্ত আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু ঠিকই আল্লাহ আপনার কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। এবার বলুন, এর আগপর্যন্ত আল্লাহকে কি আপনি কিছু দিয়েছেন? দিতে হয়নি। অথচ তারপরও তিনি আপনার প্রয়োজন পূরণ করে এসেছেন।

হিসাব করুন তো, কী দেননি আল্লাহ? জামা-জুতা, আহার, আনন্দ, হাসি, নিশ্চিন্ততা, সুস্থতা। হাত, পা, চোখ, কান, নাক-সহ সুস্থ-সবল সব অঙ্গ-প্রতঙ্গ—কী দেননি!

কখনো কখনো তাকে ভুলে গেছেন। শুধু ভুলেই যাননি, তাঁর নাফরমানিও করেছেন। কিন্তু তবুও তিনি বলেননি—

এক ওয়াক্ত নামাজ ছেড়েছ, একটা হাত আমাকে দিয়ে দাও!

একবার মিথ্যা বলেছ, একটা কান আমি নিয়ে নিলাম!

একবার কারও ওপর জুলুম করেছ, একটা চোখ দিলাম অকেজো করে।

বলেছেন কী?

বলেননি।

চিন্তা করুন, তিনি কত দয়ালু! তবুও আপনি বলছেন, আল্লাহ আমাকে কিছুই দেয়নি! না চাইতেই যিনি আপনাকে সবকিছু দিচ্ছেন, তাঁর বিরুদ্ধেই অভিযোগ? তাঁর কাছ থেকেই মুখ ফিরিয়ে নেওয়া? তো, আর কে আছে আপনার কথা শুনবার? কে আছে আপনার সব জরুরত পূর্ণ করবার?

কেউ তো নেই!

তিনি ছাড়া আর কেউ নেই। তিনি আমাদের কাছে চেয়েছেন কম! দিয়েছেনই বেশি। যতটুকু চেয়েছেন, আমার প্রয়োজনেই চেয়েছেন। এক ওয়াক্ত নামাজ পড়লে আমারই লাভ। ইবাদতে মনোযোগী হলে আমারই

লাভ। গুনাহ থেকে বেঁচে থাকলে ফায়দা আমারই। দ্বীনের পথে চললে ফায়দা আমারই।

আল্লাহর এতে কোনো লাভ বা ক্ষতি নেই। কুরবানির পশুর রক্ত, গোশত, হাড্ডি, চামড়া সবই আমার। আল্লাহ এর কিছুই নেন না।

একবার এক ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা হচ্ছিল। তিনিও (নাউজুবিল্লাহ) আল্লাহর ওপর ভীষণ অসন্তুষ্ট। রোজার দিনে রোজা রাখতেন না। তার নাকি কষ্ট হয়। ভদ্রলোক একটা চাকরি করতেন। বেতন বেশি, কিন্তু কঠোর পরিশ্রম করতে হয়। কোম্পানির কাজে তাকে দেশের বিভিন্ন জায়গায় সফর করতে হয়।

সফরে কখনো কখনো সকালের খাবার দুপুরে, দুপুরের খাবার রাতে খেতে হয়। কাজের চাপে সারা দিন কিছু খাওয়ার সুযোগ হয়নি, এমনও হয়েছে। তো, ভদ্রলোক বলছিলেন, 'ইসলাম মানা বহুত কঠিন! এই গরমে সারা দিন পানিটা পর্যন্ত না খেয়ে থাকা যায়? আল্লাহ কেন মুসলমানদের এত কঠিন অবস্থায় ফেলল?'

এই প্রশ্নে মেজাজ গরম হয়ে যাওয়ার কথা। আল্লাহকে নিয়ে প্রশ্ন তোলে! কত্ত বড় সাহস! আমি মেজাজ গরম না করে প্রসঙ্গ পালটে শান্ত গলায় জানতে চাইলাম, 'ভাই, আপনি তো ইঞ্জিনিয়ার, তাই না?'

'জি! ছোটখাটো ইঞ্জিনিয়ার না; দেশে-বিদেশে আমার কাজের অনেক সুনাম আছে!'

'মাশাআল্লাহ, খুব ভালো। আপনার ব্যাচে আপনার মতো সুনাম অর্জন করা আর কেউ কি আছে?'

ভদ্রলোক গর্বের সঙ্গে বললেন, 'প্রশ্নই ওঠে না! ক্লাসে আমাদের ব্যাচের সবগুলা ছিল পাক্কা ফাঁকিবাজ। পরীক্ষায় একজনও আমার চেয়ে ভালো রেজাল্ট করতে পারত না।'

'মাশাআল্লাহ, খুব ট্যালেন্ট ছাত্র ছিলেন আপনি। আচ্ছা! একটা কথা বলুন তো!'

'কী কথা?'

'ছোটবেলায় আপনার বাবা যখন আপনাকে স্কুলে ভর্তি করেছিলেন, তখন যদি আপনি বলতেন—'ওহো! পড়াশোনা এত্ত কঠিন আমি আর পড়ব না'। তাহলে কি আজ এত ভালো ইঞ্জিনিয়ার হয়ে মর্যাদার আসনে বসতে পারতেন?'

ভদ্রলোক স্মৃতিকাতর হয়ে বললেন, 'নাহ। কখনোই না। কত কষ্ট করে পড়াশোনা করেছি! গরিবের সংসার। বাবা ঠিকমতো খরচ পাঠাতে পারত না। কতদিন না খেয়ে থেকেছি! দামি শার্ট, দামি প্যান্ট না কিনে টিউশনির টাকা বাচিয়ে কত কষ্ট করে পরীক্ষার ফি দিয়েছি।'

ভদ্রলোক আরও কিছুক্ষণ স্মৃতিচারণ করলেন।

আমি বললাম, 'জি, এটাই বলতে চেয়েছিলাম। ... না খেয়ে কষ্ট করেছেন বিধায়ই আজ আপনি বড় ইঞ্জিনিয়ার হতে পেরেছেন। সারা দিন না খেয়ে আল্লাহর হুকুম 'রোজা' পালন করলে আপনারই মর্যাদা বাড়বে, আল্লাহর তাতে কিছু যাবে আসবে না।'

প্রিয় ভাই, দুনিয়াটা একটা পরীক্ষা কেন্দ্রের মতোই। পরীক্ষায় ভালো রেজাল্ট করেছেন বলেই আপনি আজকে মর্যাদার আসনে বলতে পেরেছেন। মহান আল্লাহ আমাদেরকে কোনো পরীক্ষা ছাড়াই বেহেশত দিয়ে দেবেন, এই কথা ভাবা কি উচিত হবে?

ভদ্রলোক শিক্ষিত মানুষ। কথাটা সহজেই বুঝে ফেললেন। অনেকে আছে বুঝতে চায় না। অথবা বুঝেও 'বে-বুঝ'-এর মতো আচরণ করে। কেউ কেউ আছে নিজের ওপর দোষ নিতে চায় না। কোনো না কোনোভাবে অন্যের ওপর দোষ চাপিয়ে দিয়ে 'নির্দোষ' থাকতে চায়। তাদের কথাগুলো দেখুন, পরের গল্পে।

হুজুররাই ঠিক নাই, আমরা আর কী ঠিক হব

চায়ের দোকানে অনেকগুলো লোক আড্ডা দিচ্ছে। একজন মাওলানা সাহেব চা খেতে এসেছেন। চায়ে চুমুক দিয়েছেন কি দেননি, এমন সময় মসজিদে আজান হলো। আড্ডা দেওয়া লোকগুলো এবার মাওলানা সাহেবকে তিরস্কার করতে লাগল, 'আপনার কি আল্লাহর ভয় নাই?'

'কেন ভাই?'

'আজানের পরেও চা খাইতেছেন? হুজুর হয়ে এমন একটা কাজ কীভাবে করতে পারছেন?'

মাওলানা সাহেব বললেন, 'ভাই, চা'টা খেয়েই জামাত ধরব। আল্লাহর রহমতে সবসময়ই আমার জামাতে নামাজ পড়া হয়।'

'সবসময় পড়েন আর যা-ই করেন, আজানের পর চা খাওয়া ঠিক না। তাড়াতাড়ি যান।'

বোঝেন অবস্থা! আড্ডাবাজ লোকগুলো কিন্তু মুসলমানেরই সন্তান। নামাজ কিন্তু তাদের ওপরও ফরজ ছিল। অথচ নিজেরা যে ফরজ ছেড়ে দিয়ে গুনাহগার হচ্ছে এ নিয়ে কোনো মাথাব্যথা নেই, অন্যজন কেন আজানের সময় চা খাচ্ছে—এটাই যেন মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে!

কেউ কেউ এই বলে দায় এড়ানোর চেষ্টা করে, 'হুজুররাই ঠিক নাই, আমরা আর কী ঠিক হব!'

প্রিয় ভাই, আপনার কাঁধে তো আর হুজুরদের পাপের শাস্তি চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে না। হুজুররা আপনারটা খাচ্ছেও না। তাদের রিজিকেরটাই তারা খাচ্ছে। তো, আপনি কেন তাদের নিয়ে টেনশন করছেন? আপনি বরং আপনার নিজের পরিণতি নিয়ে ভাবুন।

ইবাদতের সব দায় হুজুরদের ওপর চাপিয়ে দিয়ে যে পার পেতে চাচ্ছেন, আদৌ কি এতে পার পাওয়ার সুযোগ আছে? কখনোই না।

আপনার হিসাব আপনাকেই দিতে হবে।

খিদে লেগেছে আপনার। হুজুররা খেয়ে দিলে তো আর হচ্ছে না। আপনার খাবার আপনাকেই খেতে হবে। প্রচণ্ড গরমে হাঁসফাঁস করছেন আপনি। হুজুররা বাতাস খেলে তো আর আপনার শরীর শীতল হবে না। আপনার বাতাস আপনাকেই খেতে হবে।

নামাজ পড়া কোনো মৌলভি-মাওলানার হুকুম না। 'গুনাহ থেকে বাঁচো, পুণ্যে পরিবর্তন হও'—এটাও কোনো পীর-বুজুর্গের নির্দেশ না। এগুলো আল্লাহ তাআলার নির্দেশ। অতএব, আল্লাহর নির্দেশ মানার ক্ষেত্রে হুজুরকে টেনে এনে বিশেষ কোনো লাভ হবে কি? কখনোই না। হুজুর না মানলে হুজুরের ক্ষতি, আপনি না মানলে আপনার ক্ষতি।

হুজুরদের ভালো ভালো কাজগুলো দেখে দেখে তো আমি নিজেকে পরিবর্তন করি না! খারাপ কাজগুলোকে কেন 'দলিল' হিসাবে উত্থাপন করি?

প্রিয় ভাই, কোনো অজুহাতেই কাজ হবে না। আপনার বিবেক ভালো করেই জানে, আপনি ভালো করছেন না মন্দ করছেন। আপনার পেছনে যে ভদ্রলোক (!) আঠার মতো লেগে আছে সেই ভদ্রলোকের নাম হচ্ছে মি. ইবলিস! ইবলিসের কথা আমলে নিলেন তো মরলেন। ধোঁকার মধ্যে রেখে সে আপনাকে 'শেষ নিশ্বাস' পর্যন্ত নিয়ে যাবে এবং এতেই তার কেল্লা ফতেহ!

শুধু কেল্লা কেন, আপনার কল্লাটাও সে জয় করে নিলো। যদি এই কল্লাটা আল্লাহর সেজদায় নত করে নিতেন, তাহলে সে পরাজিত হতো।

খেলোয়াড় যখন সব প্লেয়ারকে কাটিয়ে গোলবারে বল ঢুকিয়ে দেয়, গোলকিপারের যেমন বোকার মতন তাকিয়ে থাকা ছাড়া আর কিছু করার থাকে না, (নরাধম ইবলিসের কথায় চললে) অন্তিম সময়ে আপনার-আমার অবস্থাও এমনই হবে। কবর, হাশর, পুলসিরাত আর মিজানের পাল্লার দিকে তাকিয়ে থাকা ছাড়া কিছুই করার থাকবে না।

ঈশ্বরের হাত

দুনিয়ার এই খেলার মাঠে আমাদের সামনে দুইজন প্রশিক্ষক। একজন হচ্ছেন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। অন্যজন মরদুদ শয়তান। একজন চির সত্যবাদী, আরেকজন ভ্রষ্ট। ভুল প্রশিক্ষকের সাজেশন মেনে খেললে, কখনোই ট্রফি নিয়ে হাসিমুখে মাঠ থেকে বের হওয়া যায় না। গো-হারা হেরে, মুখ কালো করে, 'দুর্গন্ধযুক্ত রুমালের গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে' বিদায় নিতে হয়।

ওখানে ম্যাচফিক্সিংয়ের সুযোগ নেই। ঘুষের বিনিময়ে রেফারি আপনার ফাউলকে দেখেও না দেখার ভান করবে; এই ভাবনাও অবান্তর। ম্যারাডোনার মতো হাত দিয়ে গোল করে 'ঈশ্বরের হাত' অর্থাৎ সবই আল্লাহর ইচ্ছা, আমার কী দোষ—বলে চালিয়ে দেবেন, সেই ভাবনাও অমূলক। ওখানে 'গোল'-এর হিসাব হবে স্বর্ণ মাপার নিক্তির চেয়েও নিখুঁত ব্যবস্থাপনায়।

জাররা জাররা। ফাঁকি দেওয়ার বিন্দুমাত্র সুযোগ নেই।

কিছু ভাই বলে থাকেন, 'হুজুররা একটু বেশিই বলে। অযথাই দোজখের ভয় দেখায়। আল্লাহ কি এত কঠোর নাকি? তিনি তো অতি দয়াবান! আমাদেরকে দোজখে দেবেন—এ তো হতেই পারে না!'

অর্থাৎ আল্লাহর দয়ার ওপর গভীর বিশ্বাস তো আছে, কিন্তু তাঁর হুকুম মানার প্রতি চরম উদাসীন! এই ভাইয়েরা বুঝতেই চান না, দুনিয়া একটা পরীক্ষাকেন্দ্র। কেন্দ্রে ঢুকেছেন, সময়সীমা মাত্র তিন ঘণ্টা। তিন ঘণ্টা পর সাদা খাতা জমা দিলে অথবা কিছুই না লিখে 'বাঁদড়ামো' করে বেড়ালেও কি পরীক্ষক আপনাকে পাশ করিয়ে দেবে?

নিশ্চয় না!

নিঃসন্দেহে আল্লাহ দয়াবান। সন্দেহের কোনো কারণ নেই। তাঁর রহম থেকে নিরাশ হওয়া যাবে না। তাই বলে অবাধ্যতার চরমে পৌঁছেও রহমতের আশা করা কি চূড়ান্ত ধৃষ্টতা নয়?

মুজাদ্দিদে মিল্লাত আশরাফ আলি থানভি রহ. বলেন, 'এটার নাম আশা নয়, এ হচ্ছে আল্লাহর রহমতের সঙ্গে তামাশা।'

উমর রা.-এর কাছে একবার এক যুবক এসে বলল,

: আমিরুল মুমিনিন, গুনাহ তো ছাড়তে চাই, কিন্তু পারি না।

: কেন?

: গুনাহ করার সময় মনে হয়, আল্লাহ তো রাহমানুর রাহিম। মাফ করে দেবেন। তাহলে আর গুনাহ করতে অসুবিধা কী? এই ভেবে করেই ফেলি।

উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন—

: ওহে আল্লাহর বান্দা, সারাক্ষণ যদি আল্লাহর রহমতের আশায় বসে থাকো, তাহলে আল্লাহর আজাবকে স্মরণ করবে কখন?

মোটকথা আল্লাহ তাঁর রহমতের প্রতি যেমন মুমিনদের আশান্বিত হতে বলেছেন, তেমনই তাঁর পাকড়াওকেও ভয় পেতে বলেছেন। ভয় ও আশার ক্ষেত্রে মুমিন হবে ভারসাম্যপূর্ণ। মুমিন যেমন আল্লাহর রহমতে আশান্বিত হয়ে তাঁর শাস্তির কথা ভুলে যাবে না, তেমনই শাস্তির ভয়ে তাঁর দয়া ও অনুগ্রহ থেকে নিরাশও হবে না।

সুতরাং প্রথমে নেক-আমল সম্পাদন করতে হবে এবং গুনাহ থেকে বিরত থাকতে হবে। এরপর নিয়মিত তওবাও করতে হবে। এগুলো না করে যদি কেউ নিজ প্রবৃত্তির অনুসরণ করতে শুরু করে, আবার জান্নাত পাওয়ার ওপর অযাচিতভাবে আশাও করতে থাকে, তাহলে এর অর্থ হবে আল্লাহর পাকড়াও থেকে নির্ভয় হয়ে থাকা।

এমন লোকদের বিষয়ে ইরশাদ হয়েছে—'তারা কি আল্লাহর পাকড়াও থেকে নিশ্চিন্ত হয়ে গেছে? বস্তুত আল্লাহর পাকড়াও থেকে তারাই নিশ্চিন্ত হতে পারে, যাদের ধ্বংস ঘনিয়ে আসে।' [সুরা আরাফ, ৯৯]

আমার একটা ছোট জান্নাত হলেই হবে

কেউ কেউ মজা করে বলেন, 'আমার একটা ছোটখাটো জান্নাত হলেই চলবে। অত বড় দরকার নেই।'

প্রিয় ভাই, ছোটটার জন্যই-বা কী এমন পুণ্য করা হচ্ছে? ধরে নিই কিছুই না করে 'ঈমান যেহেতু আছে, ১০ দুনিয়ার সমান জান্নাত পাব'—এই বিশ্বাস হৃদয়ে লালন করে বসে আছি। কিন্তু শুধু এই বিশ্বাসের ওপর ভরসা রেখে বসে থাকার সিদ্ধান্ত কতটা সঠিক?

ধরুন, কক্সবাজার থেকে ঢাকায় যাবেন। বাস খুঁজছেন। এই রুটে কম করে হলেও চার রকমের বাস আছে। স্লিপার কোচ, এসি, নন এসি, লোকাল এবং চরম লোকাল! দুর্ভাগ্যবশত আপনার কাছে কোনো টাকাই নেই। অল্প যা ছিল পকেটমার নিয়ে গেছে। এখন আপনি স্লিপার কোচের কাউন্টারে গিয়ে নক করে যদি বলেন, 'ঢাকায় যাব'—কাজ হবে?

স্লিপার আর এসি বাস তো দূরের কথা, লোকালেও উঠতে পারবেন বলে মনে হয় না। হয়তো বলবেন, 'অত বিলাসিতায় কাজ নেই। আমি 'চরম লোকাল' দিয়েই কাজ চালাতে পারব।'

তবুও সুবিধা করতে পারবেন না। এত দূরের পথ ফ্রি ফ্রি কেউ আপনাকে নিতে রাজি হবে না। অবশ্য একভাবে সম্ভব, যদি ড্রাইভারের দয়া হয়। তবে সেই দয়ায় কি মাঝখানের সিটের যাত্রীদের মতো আরাম করে যেতে পারবেন?

হয়তো বসতে হবে একেবারে পেছনের সিটে। নয়তো বসতে হবে গেটের কাছে ইঞ্জিনের ওপর। একে তো ইঞ্জিনের গরম। তার ওপর গেট দিয়ে ওঠা যাত্রীদের পায়ের গুঁতো—এসব সহ্য করে আপনাকে গন্তব্যে পৌঁছুতে হবে।

প্রিয় ভাই, ওপারের হিসাবটাও এমনই। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন দয়া করে সব মুসলমানকেই বেহেশত নামক গন্তব্যে পৌঁছাবেন। কিন্তু আগুনে সেদ্ধ করার পর। সেই আগুন বাসের ইঞ্জিনের মতো 'অল্প গরম আগুন' না।

বড় যন্ত্রণাদায়ক সে আগুনের উত্তাপ! সেটা সহ্য করার যোগ্যতা তো কারোরই নেই!

আমাদের কারও কারও ধারণা, জীবনে যত খারাপ কাজই করি না কেন, কিছুদিন জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করব, এরপর তো নিশ্চিত জান্নাত! সেখানে আনন্দ আর আনন্দ! কোনো দুঃখ নেই। ভালোই হবে, এখানেও পাপের মজা পেলাম, ওখানেও জান্নাত পেয়ে অনন্তকালের আরাম-আয়েশ ভোগ করতে পারলাম। অসুবিধা কী, একটু দোজখ ঘুরে গেলামই নাহয়!

কী আজব ধারণা!

যেন তারা তাদের ঈমান গ্রহণযোগ্য হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চয়তা পেয়ে গেছে। অথবা মৃত্যুর আগপর্যন্ত ঈমানের ওপর থেকে, ঈমান নিয়েই কবরে যেতে পারবে এমন গ্যারান্টি কার্ডও হাতে এসেছে। অথবা আল্লাহ তাদের বলে দিয়েছেন যে, জাহান্নামে থাকার সময়টা দ্রুতই শেষ হয়ে যাবে, চিন্তার কোনো কারণ নেই।

আফসোস! জাহান্নামের একমুহূর্তের একটু শাস্তিও দুনিয়ার কোনো শাস্তির সাথে তুলনা করা যায় না, সেই শাস্তির ব্যাপারেও আমরা কেউ কেউ নিজেদের মতো করে ভেবে নিয়েছি।

ধরে নিই, এত উত্তপ্ত আগুনে অঙ্গার হওয়ার পর জান্নাতে যাওয়া হলো। কিন্তু তখন কি এইটুকুতেই সন্তুষ্ট থাকতে পারব? মনে হয় না। এখন হয়তো 'ছোট জান্নাত হলেও চলবে' বলছি। কিন্তু তখনকার অবস্থা হবে সম্পূর্ণই ভিন্ন। একজন ফার্স্টক্লাস বেহেশতির তুলনায় আমার অবস্থান দেখে তখন আফসোসে ফেটে পড়া ছাড়া আর কোনো উপায় থাকবে না।

ভয় এবং আশা

কঠোর লকডাউন চলছে। এর মধ্যে আমাদের এক আত্মীয় মারা গেলেন। চাঁদপুরে। জানাযায় না গেলে হচ্ছেই না। ঢাকা থেকে চাঁদপুর। অনেকটা পথ। গণপরিবহন বন্ধ। বাস-মিনিবাস কিছুই চলছে না। জায়গায় জায়গায় পুলিশ টহল দিচ্ছে। কষ্ট হবে যেতে। তবুও রওনা দিলাম।

যাওয়ার সময় অনেক টাকা ভাড়ায় প্রাইভেটকার তো পেলাম, আসার সময় বাধল বিপত্তি। কোনো গাড়ি নেই, একমাত্র ট্রাক ছাড়া। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে একটা ছোট সাইজের 'পিকাপ-ট্রাক' খালি পেলাম।

অনেক যাত্রী।

পুরুষদের পাশাপাশি মহিলারাও।

কী করবে? গন্তব্যে যেতে তো হবে!

একদিকে লকডাউন। অন্যদিকে অফিস খোলা। না গিয়ে উপায়ও নেই। চাকরি বাঁচাতে কিংবা অতীব জরুরি প্রয়োজনে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে।

জায়গা কম। ছোট্ট ট্রাকে গাদাগাদি করে বসে পড়লাম। গাড়ি চলছে। পুলিশদের টহল অতিক্রম করে এগিয়ে যাওয়া কঠিন। ড্রাইভার সাহেব ভয়ে ভয়ে গাড়ি চালাচ্ছেন। ধরা পড়লেই বিপদ! 'খরচাপাতি' তো দিতেই হবে, গাড়ি আটকে লাইসেন্সও বাতিল করে দিতে পারে!

বিপদ ছিল যাত্রীদের জন্যও। মাঝপথে গাড়ি থেকে নামিয়ে দিলে হাঁটাপথ ছাড়া উপায় নেই। আমাদের গাড়িতে কিছু যাত্রী দাঁড়িয়ে ছিল, বাকিরা কষ্ট করে বসে বসে আল্লাহকে ডাকছিল। হঠাৎ এক জায়গায় এসে দাঁড়ানো যাত্রীরা মাথা নিচু করে ফেলল।

ঘটনা কী?

জানা গেল সামনে পুলিশের ব্যারিকেড আছে। ওখানে কয়েকজন পুলিশ টহল দিচ্ছে। তাদের ভয়েই মাথা নামিয়ে ফেলা।

'তো? লাভ কী? যারা বসে আছে তাদেরকে কি দেখবে না? পুলিশের চোখ ফাঁকি দেওয়া তো আর সোজা কথা না!'

আমার কথা শুনে একভাই বললেন, 'বসে থাকলেও দেখবে দাঁড়িয়ে থাকলেও দেখবে। ফাঁকি দেওয়ার উপায় নেই। কিন্তু এই যে মাথাটা একটু নামিয়ে ফেললাম, এতে একটা সুবিধা অন্তত আছে।'

'কী সুবিধা?'

'এই যে ওদের ভয়ে মাথাটা নামিয়ে লুকানোর চেষ্টা করেছি, এতে ওদের মনে একটু হলেও দয়া হবে। ভাববে, ভয় তো পেয়েছে! এটাই-বা কম কীসে!... এই অসিলায় মায়া করে ছেড়েও তো দিতে পারে!'

কথাটা খুবই ভালো লাগল। অসিলা। আশা। ভয়। মায়া। দুনিয়ার পুলিশদের হৃদয়ে মায়া-মমতা থাক বা না থাক, আল্লাহ কিন্তু রাহমানুর রাহিম। অতি দয়ালু। আল্লাহর ভয়ে যদি আমি গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার চেষ্টা করি! হয়তো পুরোপুরি বাঁচতে পারলাম না, চেষ্টাটাও যদি করি; এটাও কি একটা অসিলা হিসাবে দাঁড়িয়ে যেতে পারে না?

বলতে তো পারব, 'আল্লাহ, আমি চেষ্টা করেছি। দয়া করে মাফ করে দিন!'

একটা ঘটনা শুনেছিলাম। এক বৃদ্ধ তাঁর সন্তানদের বলছিলেন, 'আমার মৃত্যুর পর দাড়িগুলোতে ময়দা মেখে দিয়ো।'

'কেন?'

'আল্লাহকে যেন বলতে পারি, হে আল্লাহ, আপনি তো বলেছেন সাদা দাড়িওয়ালাদের দেখলে (বুড়ো বয়সের কারণে) শাস্তি দিতে আপনার লজ্জা লাগবে। আপনার এ কথার ওপর ভরসা রেখে আমি আমার কাঁচা দাড়িগুলোকে সাদা বানিয়ে আপনার দরবারে হাজির হয়েছি। দয়া করে আমাকে নাজাত দিয়ে দিন!'

মূলত আল্লাহ কোনো না কোনো অসিলা খুঁজবেন। পতিতা নারী যদি সামান্য এক কুকুরকে বাঁচিয়ে দিয়ে নাজাত পেতে পারেন, আমরা বঞ্চিত হব না নিশ্চয়! বান্দাকে তিনি নাজাত দিতেই চান। শাস্তি দিতে চান না। তাঁর ক্রোধের তুলনায় রহমতই প্রবল।

তবে ভয় এবং আশা—এর মাঝেই ঈমানের বাসা। শুধু আশা নিয়ে বসে থেকে ভয়হীন হয়ে যাওয়া চরম বোকামি। পিতা খুব ক্ষমাশীল, এই আশায় যে সন্তান লাগামহীন হয়ে যায়, সে কি কখনো ক্ষমা পাওয়ার যোগ্য বিবেচিত হতে পারে? বরং যে সন্তান এমন পিতা পেয়ে নিজেকে আরও বেশি অনুগত হিসাবে প্রমাণিত করতে চেষ্টা করে, সে-ই হয় পিতার সবচেয়ে আদরের।

দ্বীন মেনে চলা কি সত্যিই কঠিন?

কারওয়ান বাজারের মোড়ে দাঁড়ালে দেখবেন শত শত মানুষ বাসে বাদুড়ঝোলা হয়ে অফিসে যাচ্ছে। শার্ট, প্যান্ট, কোর্ট, টাই পরা একেকজন। ভদ্র চেহারার। সিট পায়নি। রড ধরে ঝুলে আছে। কেউ কেউ ভেতরেই ঢুকতে পারেনি। ঢুকবে কী করে? জায়গা নেই। পা-দানিতে কোনোরকমে পা রাখতে পেরেছে। কেউ কেউ হাতলে হাত দিতে পেরেছে শুধু। বাকি পুরো শরীরটাই বাইরে বেরিয়ে আছে।

তাদের কোনো একজনকে জিজ্ঞাসা করুন, 'ভাই, এত কষ্ট করে কোথায় যাচ্ছেন?'

'অফিসে!'

'তাই বলে এত রিস্ক নিয়ে! জানের মায়া বলেও তো একটা কথা আছে!'

'আরে রাখেন ভাই! চাকরি বাঁচলে জানের মায়া। সময়মতো অফিসে না গেলে চাকরি থাকবে?'

'তো, বেতন কত আপনার?'

'২০ হাজার।'

'বলেন কী! মাত্র ২০ হাজারের জন্য এত কষ্ট করছেন? এটা কি ঠিক হচ্ছে?'

'কষ্ট তো হবেই। কিচ্ছু করার নেই। কষ্ট না করলে কি মাস শেষে বাসার বাজারটা আপনি করে দেবেন?'

এবার তাকে প্রশ্ন করে দেখুন, 'ভাই, দুনিয়ার জন্য তো প্রতিদিনই অনেক কষ্ট করছেন, আখেরাতের জন্য কি সামান্য সময়ও দিতে পারছেন?' কোনো জবাব পাবেন না।

একজন সেলসম্যানকে প্রশ্ন করুন!

: কী কাজ করেন আপনি?

: সেলস এক্সিকিউটিভ।

: কত মাইনে পান?

: এইতো, ১৫ হাজার সামথিং!

: এক মাস কাজ করার পর এই বেতনটুকু পেতে আপনাকে কী কী পদ্ধতিতে কাজ করতে হয়?

: সকাল আটটায় বাসা থেকে বের হই। সাড়ে আটটার মধ্যে অফিসে যাই। আমার সেদিনকার সেলস টার্গেট কত, সেটা জেনে নিয়ে মার্কেটে নেমে পড়ি। দোকানে দোকানে গিয়ে পণ্যের অর্ডার নিই।

: সব দোকানদার কি অর্ডার দেয়?

: নাহ্। একেকটা দোকানদারের পেছনে প্রচুর শ্রম দিতে হয়। পণ্যের গুণাগুণ বর্ণনা করতে হয়। অন্যটার চেয়ে আমারটা ভালো—এই কথা প্রমাণ করতে হয়। বিভিন্ন অফার দিই। সামান্য দুই পয়সার ব্যবসায়ীকেও স্যার স্যার বলে মুখে ফেনা তুলতে হয়।

: এতে কি কাজ হয়? অর্ডার দেয়?

: না এরপরও বেঁকে বসে। কেউ কেউ 'মাল লাগবে না' বলে একরকম দূর দূর করে তাড়িয়েও দেয়।

: বলেন কী! এরপরও এই কাজ করে যাচ্ছেন?

: উপায় নেই। এটাই জীবন। কষ্ট না করলে পয়সা আসবে কোত্থেকে?

দেখলেন তো? কত কঠিনতম কাজই-না আমরা করতে পারছি! রাজমিস্ত্রির কাজগুলো দেখুন। রোদে পুড়ে, বালু মেখে, ঘর্মাক্ত শরীরে কী পরিমাণ পরিশ্রমই-না করছে!

কুলি-মজুর কিংবা রিকশাওয়ালাদের দেখুন! কী পরিশ্রমই-না করছে! কই 'কঠিন' মনে করে তো তারা এ কাজ ছেড়ে দেয় না! বরং এর বাইরেও বাড়তি কোনো কাজ করে আরও বেশি আয় বাড়ানোর চেষ্টা করে।

অনেককেই দেখেছি, সারা দিন ডিউটি করেও তৃপ্তি মেটে না, ছুটির পর বাইক কিংবা 'উবার' নিয়ে বেরিয়ে পড়ে বাড়তি ইনকামের আশায়। শুধু তা-ই না।

এক ভদ্রলোকের কথা জেনেছি, সকালবেলা স্যুট-কোট পরে অফিস যেতেন। রূপ পালটে যেত সন্ধ্যার পর। বাসার কাছের এক রিকশার গ্যারেজে ড্রেসগুলো পালটে, সাধারণ জামাকাপড় পরে রিকশা নিয়ে বেরিয়ে পড়তেন।

কী করা?

আয় তো বাড়াতে হবে! মান-ইজ্জত নিয়ে বসে থাকলে চলবে? মি. ইবলিস তো আছেই পেছনে লেগে। সে সবসময় অভাবের ভয় দেখাতে থাকে। বলতে থাকে, 'আয় বাড়াও! নয়তো ভবিষ্যতে বিপদে পড়ে যাবে!'

অথচ আমার-আপনার ভবিষ্যৎ হলো আখেরাত। সেই ভবিষ্যতের কথা চিরশত্রু ইবলিস কখনো মনে করিয়ে দেবে না। ভুলিয়ে রাখবে। আমাকে আপনাকেই নরাধম ইবলিসের বিরুদ্ধে কঠোর ভূমিকা রাখতে হবে।

এটাই জীবন বা জীবনের রূপ মনে করে কঠোর পরিশ্রম করে যাচ্ছি। অথচ এই জীবনই শেষ নয়। মরণের পরেও একটা অনন্ত জীবন আছে। সেই জীবনেও অভাব-অনটন আছে।

দুনিয়াতে যেমন টাকার অভাবে সংসার চলবে না বলে মনে করি, সেই জীবনেও নেকির অভাবে বিপদ আসবে বলে মনে করতে হবে। অভাব আসার ভয়ে যেমন কঠোর পরিশ্রম করতেও দ্বিধা করি না, ওই জীবনের পুঁজি সংগ্রহের জন্য ইসলাম মেনে চলতেও দ্বিধা করা যাবে না।

এখানে বেতন নিচ্ছেন আপনি, কাজটা কি অন্য কেউ করে দেয়? দেয় না। আপনার কাজ আপনাকেই করতে হয়। তবেই মাস শেষে বেতন পাওয়া যায়। ওখানকার জীবন সাজানোর বিষয়টাও এমনই। আপনার ইবাদত অন্য কেউ করে দেবে না।

প্রিয় ভাই, আপনার হাশর আপনাকেই তৈরি করতে হবে। আপনার কবর আপনাকেই আলোকিত করতে হবে। আপনার পুলসিরাতের পথ আপনাকেই কণ্টকমুক্ত করতে হবে। কথাগুলো হয়তো একটু কঠিন হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এটাই বাস্তবতা।

দুনিয়া করব, কিন্তু আখেরাত বাদ দিয়ে নয়; বরং দুনিয়াকে আখেরাত উপার্জনের মাধ্যম মনে করা চাই! কৃষক মাথার ঘাম পায়ে ফেলে ক্ষেতে কাজ করে। কিন্তু ফসলের সুফল ভোগ করে বাড়িতে গিয়ে।

কর্মকর্তা-কর্মচারী অফিসে কাজ করে। বেতনের সুফল ভোগ করে পরিবার-পরিজন নিয়ে।

প্রবাসীরা বিদেশে কঠোর পরিশ্রম করে পয়সা উপার্জন করে। সেখানেই কিন্তু তা উড়িয়ে দেয় না। সেই পয়সার সুফল ভোগ করে দেশে এসে। কোনো প্রবাসী যদি মনে করে, মালয়েশিয়া, জাপান, ইতালি, আমেরিকা এত সুন্দর দেশ! ফুর্তির নানান সামগ্রী আছে এখানে। টাকা খরচ করলে হাতের কাছেই সব পাওয়া যায়। কী দরকার দেশে টাকা পাঠানোর? এখানেই উড়িয়ে দিই!... তাহলে কি দেশে এসে কোনোরকম সুফল সে ভোগ করতে পারবে?

নিশ্চয় না!

বরং কী পরিমাণ ক্ষতিগ্রস্ত হবে, বলার অপেক্ষা রাখে না।

সে যদি বাড়িতে ফোন করে বলে, 'আমি অমুক তারিখে দেশে আসছি। আমাকে স্বাগত জানানোর জন্য গাড়ি নিয়ে এয়ারপোর্টে অপেক্ষা করো।'

কেউ তাতে সাড়া দেবে না। মা-বাবা, বন্ধুবান্ধব সমানে তিরস্কার করতে থাকবে, 'আর কোনো কথা খুঁজে পাও না, না? তোমাকে জানাব স্বাগত? আরে বেওকুফ! স্বাগত জানানোর মতো এমন কোন কাজটা তুই করেছিস? দেশে এসে করবিটা কী তুই? খাবি কী, পরবি কী? সব তো ফুর্তি করেই শেষ করে দিয়েছিস! তোর জন্য ঘৃণা ছাড়া আমাদের মনে আর কিছু জমা নেই।'

বিপরীতটাও ভাবুন। উপার্জিত টাকা-পয়সা সব আগে থেকেই দেশে পাঠিয়েছিল। একটা টাকাও অহেতুক খরচ করেনি। এখন, দেশে আসার সময় হয়েছে। বাড়িতে জানাতেই সবার মধ্যে সে কী আনন্দ!

মা-বাবা, ভাই-বোন, বন্ধুবান্ধব সবাই খুশি! এয়ারপোর্টে অভ্যর্থনা জানাতে সবাই অপেক্ষা করছে।

ফুলের ডালি হাতে প্রহর গুনছে প্রিয়তমা স্ত্রী।

হাসি আর আনন্দ নিয়ে অপেক্ষা করছে পরিবারের অন্যরা।

মায়ের চোখে, বাবার চোখে আনন্দাশ্রু! কতদিন পর বুকের ধন বুকে ফিরে আসছে। গাড়িতে বাড়ি ফিরতে ফিরতে বাবার যেন কথাই ফুরায় না! ছেলের পাঠানো টাকায় কোথায় কী করেছে, সবকিছুর ফিরিস্তি দিচ্ছে।

উত্তরের বিলে জমি কেনা,

বড় বাজারে দোকান কেনা,

বাড়িতে পাঁচতলা দালান,

ঢাকায় একখণ্ড জমি,

সবকিছুর হিসাব আনন্দের সঙ্গে বুঝিয়ে দেওয়া হচ্ছে। মা বলছে, 'তোমার এখন আর কোনো চিন্তা নাই বাবা! এতদিন কষ্ট করে পয়সা উপার্জন করেছ, এখন বাকি জীবন আরাম-আয়েশে কাটাবে।'

প্রিয় ভাই, দুনিয়ার জীবন তো সহজেই বুঝে আসে। ওপারের জীবনটাকেও এভাবেই ভাবতে হবে। এখান থেকে যা পাঠাব, ওখানে তাই ভোগ করব। বুঝলেই সহজ, না বুঝতে চাইলেই কঠিন। বরং দুনিয়া উপার্জনের চেয়ে আখেরাত উপার্জনই অনেক সহজ। কঠোর পরিশ্রম তো নেইই, রয়েছে সুখ আর বিপুল পরিমাণ মানসিক প্রশান্তি।

অশান্তি ছেড়ে প্রশান্তির দিকে

ওই ঘটনাগুলো তো অনেকেরই জানা। দিনের পর দিন ঘুমের ওষুধ খেয়েও ঘুমাতে পারত না সাদা চামড়ার অমুসলিম লোকগুলো। ডাক্তারের পেছনে পানির মতো টাকা ঢেলেছে। কাজ হয়নি। রাত পার হয়ে গেছে, চোখের কোণে এককোটা ঘুমও ধরা দেয়নি। ডাক্তার বলেছে, 'পরিশ্রম বাড়ান। ঘুম বাড়বে।'

সাদা চামড়ারা তো এমনিতেই কাজপাগল মানুষ। কাজ ছাড়া একদণ্ডও বসে থাকতে চায় না। কত আর বাড়াবে পরিশ্রম? ডাক্তারের পরামর্শ মানতে তাও করেছে।

উঁহু, যেই লাউ সেই কদু।

পরিশ্রম বাড়িয়েও ঘুমের কোনো উন্নতিই হয়নি।

এদেরই একজন একদিন এক মসজিদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। মসজিদের ভেতরে যা দেখল, তাতে তার চক্ষু চড়কগাছ! এক লোক বই হাতে কী যেন পড়ছে, আর তার সামনে গোল হয়ে বসে থাকা বাকিরা নাক ডেকে ঘুমুচ্ছে! এই দৃশ্য তাকে বিচলিত করল। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে উপভোগ করল দৃশ্যটি। কৌতূহল ধরে রাখতে পারল না সে। মসজিদের ভেতরে প্রবেশ করল।

লোকগুলো তখনো ঘুমুচ্ছে। যিনি কিতাব পড়ছিলেন, তার কাছে জানতে চাইল সাদা চামড়ার লোকটা। 'আচ্ছা, এরা কোন ওষুধ খেয়ে এভাবে নিশ্চিন্তে ঘুমুতে পারছে? ওষুধের নামটা একটু লিখে দেবেন? আমরা তো গত কয়েক বছরেও এমন নিশ্চিন্তে ঘুমুতে পারিনি!'

'চাইলে এমন ঘুম আপনিও ঘুমাতে পারেন।'

'কীভাবে?'

'এটা একটা হাদিসের তালিমের মজলিস। যখন তালিম হয়, সাকিনা নামক এক বিশেষ রহমত বর্ষিত হতে থাকে। এর প্রভাবেই এরা এভাবে নিশ্চিন্তে ঘুমুতে পারছে।'

সাদা চামড়াওয়ালা লোকটা পরীক্ষা করার জন্য তালিমে বসে পড়ল। এবং আশ্চর্যের বিষয়, কিছুক্ষণের মধ্যে সেও ঘুমিয়ে গেল। কোনোরকম ওষুধ ছাড়া, ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঘুমুতে পারার এই ঘটনা অন্যান্যদের কানে ছড়িয়ে পড়ল মুহূর্তেই। গাড়ি নিয়ে তারাও ছুটে এসে তালিমে বসল।

মসজিদ তো এমনিতেই বেহেশতের বাগান। তার ওপর চলছিল পবিত্র কুরআন ও হাদিসের তালিম। ঘুমিয়ে পড়তে সময় লাগল না তাদেরও।

দ্বীনের মজলিসেই যদি এত প্রশান্তি থাকে, দ্বীনের ওপর চললে নিশ্চয় আরও প্রশান্তি পাব! এই ঘটনার পর ওই লোকগুলো দলে দলে মুসলমান হতে লাগল। দ্বীনের সৌন্দর্য ইউরোপ আমেরিকায় বানের পানির মতো ছড়াচ্ছে, আর অগণিত মানুষ ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় নিচ্ছে।

নওমুসলিম ভাইদের ঈমানের অবস্থা দেখলে অবাক হতে হয়। মুসলিম হতে পেরে তারা এত বেশি আনন্দিত হয়, যে আনন্দের তুলনা হয় না। দ্বীনকে এত শক্তভাবে আঁকড়ে ধরে, শত বাধাবিপত্তিতেও তা থেকে বিচ্ছিন্ন হয় না।

অথচ আমরা মুসলমানের সন্তান হয়ে বলছি—'দ্বীনের ওপর চলা খুব কঠিন!'

এজন্যই আমাদের ভেতর থেকে অশান্তি দূর হচ্ছে না। লাখ টাকা উপার্জন করলেও অভাব যাচ্ছে না।

যাবে কীভাবে, দ্বীন তো নেই!

যেই পরিবারে দ্বীন আছে, সেই পরিবারে বরকত আছে। মাসে ৫ হাজার টাকা উপার্জন হলেও সেই পরিবারে বয়ে চলে প্রশান্তির সুবাতাস! তারা জানে অল্পতেই তুষ্ট থাকতে। তাঁরা পারে অভাব এলেও ধৈর্য ধরতে। তারা বুঝতে পারে, সামান্য এই অভাব ক্ষণিকের। মহান রিজিকদাতা অচিরেই এত পরিমাণ দেবেন, যা কখনো ফুরিয়ে যাওয়ার নয়!

রেজামান্দি

সকাল হয়েছে। আপনি আপনার বাসভবনে ঘুমিয়ে আছেন। জঙ্গল থেকে একটা বাঘ এসে আপনাকে জাগিয়ে তুলল। আপনি বিছানা থেকে উঠলেন। বাঘটা গা বিছিয়ে দিলো। আপনি নিশ্চিন্তমনে বাঘের পিঠে চড়ে রওনা করলেন পুকুরের দিকে। পুকুরে নামতেই ছুটে এলো একদল কুমির। সঙ্গে যোগ দিলো একটা জলহস্তি। আপনার সঙ্গে কিছুক্ষণ ঝাঁপাঝাঁপি করল।

এরই মধ্যে বাঘটা নিয়ে এলো আপনার প্রিয় প্যাডেল বোটটি। বাঘ-সমেত আপনি সেটাতে চড়ে বসলেন। পুকুরে ঘোরাঘুরি করলেন কিছুক্ষণ। তীরে আসতেই আপনাকে স্বাগত জানাল সিংহ মামা। সাদা ভাল্লুক এগিয়ে এলো গামছা নিয়ে। কালো চিতা ছুটে এলো লুঙ্গি নিয়ে।

অদূরেই দাঁড়িয়ে ছিল শিম্পাঞ্জিটা। সে এসে হেসে হেসে আপনার কুশল জানতে চাইল। গোসলপর্ব শেষ। এবার নাশতা খাওয়ার পালা। খেতে বসলেন। আপনি কিন্তু একা খাচ্ছেন না! এতক্ষণ যাদের সঙ্গে গোসল আর জলকেলিপর্ব সারলেন, তারাও বসে গেল খেতে। আপনিও খাচ্ছেন, বাঘ, ভাল্লুক, সিংহ, শিম্পাঞ্জিরাও আপনার সঙ্গে খাচ্ছে। এবার বলুন, পুরো ঘটনাটা কেমন মনে হচ্ছে?

অবিশ্বাস্য নাকি শ্বাসরুদ্ধকর?

অবিশ্বাস্য মনে হলেও ঘটনাটি সত্যি। ব্রাজিলের এক পরিবার এভাবেই দিনের পর দিন একদল হিংস্র প্রাণীর সঙ্গে বসবাস করে আসছে। পরিবারের লোকজন যখন ঘুমোয়, বাঘ-সিংহও একই ঘরে ঘুমুচ্ছে। পরিবারের শিশু, বুড়ো, প্রাপ্তবয়স্ক সদস্যের সঙ্গে একসঙ্গে খাচ্ছে, গোসল করছে, আনন্দ করছে।

শিশুদের সঙ্গে বাড়ির সামনের খোলা বাগানে খেলছে, দুষ্টুমি করছে। হিংস্র এ জন্তুগুলোকে কেউ ভয় পাচ্ছে না। এমন কী শিশুরাও না। যেন ওরা একই পরিবারের সদস্য।

হিংস্র জন্তুদের সঙ্গে জীবনযাপনের পেছনে যে শক্তিটি মূল ভূমিকা পালন করেছে, তা হচ্ছে 'রাজি' করিয়ে নেওয়া। পরিবারের কর্তাব্যক্তিটি হচ্ছে একজন পশুপ্রেমী। বাড়তি আদর-যত্ন দিয়ে লোকটা পশুদের মন জয় করে নিয়েছে। পোষ মানিয়ে নিজেদের পক্ষে করে নিয়েছে বলেই আজ সে এক বিরাট অসাধ্য সাধন করতে পেরেছে। যা সবার পক্ষে সম্ভব নয়।

এর জন্য প্রয়োজন সঠিক কর্মকৌশল, পরিশ্রম, আর অধ্যাবসায়। একজন ইসলামবিমুখ লোক যদি আল্লাহর সৃষ্টি ভয়ংকর জীব-জন্তুদের রাজি করিয়ে ফেলতে পারে, মুসলমান হয়ে স্বয়ং আল্লাহকে কেন আমরা রাজি করিয়ে ফেলতে পারি না? আমার নিত্যদিনের কাজে-কর্মে, শয়নে-স্বপনে কেন তাঁর রেজামান্দিকে অনুকূলে আনতে চেষ্টা করি না?

কেন পারি না নিজের নফস আর শয়তানের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে মহান আল্লাহকে খুশি করে চলতে!

কে আছ জোয়ান হও আগুয়ান

একটা মিথ্যা মামলায় আপনি জড়িয়ে গেছেন। আপনার বিরুদ্ধে ওয়ারেন্ট জারি হয়েছে। পুলিশ আপনাকে খুঁজছে। ভয়ে আপনি বাসায় ঢুকতে পারছেন না। কখন ধরা পড়েন, ঠিক নেই; পালিয়ে বেড়াচ্ছেন।

কখনো বন্ধুর বাসায়।

কখনো আত্মীয়স্বজনদের বাড়িতে।

কখনো বা রেলস্টেশনের ফুটপাতে।

একদিকে পুলিশের ভয়, অন্যদিকে পরিবারের সদস্যদের নিয়ে চিন্তা। পুলিশ এসে ঝামেলা করছে নাতো! বাসার লোকজনদের হেনস্থা করছে নাতো! পেরেশানির অন্ত নেই। গন্তব্যহীন ছুটতে ছুটতে একদিন আপনি ধরা পড়ে গেলেন। আপনাকে নিয়ে যাওয়া হলো জেলখানায়। দাঁড় করানো হলো খোলা আকাশের নিচে প্রচণ্ড রোদের মধ্যে। হাত উঁচু করে দুহাতে দুখানা দশনম্বরি ইট ধরিয়ে দেওয়া হলো।

কপালের ওপর একটা পাঁচ টাকার কয়েন রেখে বলা হলো এভাবে সূর্যের দিকে তাকিয়ে থাকতে হবে। কয়েনটা যেন মাটিতে না পড়ে। পড়লেই আরও কঠিন শাস্তি। পিঠের ওপর সপাং সপাং পড়বে বেতের আঘাত।

আদেশ শিরোধার্য।

আপনি ওভাবেই দাঁড়িয়ে আছেন। দরদর করে ঘামছে আপনার সারা শরীর। রোদের তীব্রতায় চেহারা ও চোখ লাল হয়ে গেছে। বুকের ছাতি ফেটে যাচ্ছে পিপাসায়। কণ্ঠনালী শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাচ্ছে। 'স্যার, মাফ করে দেন' বলে এতক্ষণ ধরে অনুরোধ করতে পারলেও এখন আর পারছেন না। গলা দিয়ে কথা বের হচ্ছে না। ইটের ভারে ধরে গেছে হাত। পা-দুটো আর নিতে পারছে না শরীরের ভার।

এ কষ্ট সহ্যসীমার বাইরে। রোদে তেতে আছে আসমান ও জমিন। প্রাণ প্রায় ওষ্ঠাগত। একটু ছায়া আর এক ফোঁটা পানির জন্য হৃদয়টা হাহাকার করছে। মনে হচ্ছে এত কঠিন শাস্তির চেয়ে মরে যাওয়াই ভালো।

ঠিক এই সময়ে কেউ যদি একটা ছাতা নিয়ে আপনার সাহায্যে এগিয়ে আসে, আপনার তখন কেমন লাগবে? শুধু ছাতাই না; সঙ্গে এক জগ ঠান্ডা পানিও এনেছে; লোকটাকে কী পরিমাণ দরদি মনে হবে? লোকটার এ দয়ার কথা কি সারা জীবনেও ভুলতে পারবেন?

এর চেয়েও কঠিন একটা দিন আছে সামনে। আপনার, আমার, সবার। মাথার সামান্য ওপরে উত্তপ্ত সূর্য। পায়ের নিচে তপ্ত জমিন।

একটু কল্পনা করুন, ঘামের সাগরে হাবুডুবু খাচ্ছে সবাই। চাইলেই কেউ পালিয়ে যেতে পারছে না। পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে নিজেকে লুকিয়ে ফেলারও কোনো সুযোগ নেই। না কোনো বন্ধুর বাসা আছে, না আছে আত্মীয়স্বজনের সহমর্মীতা।

সূর্যের প্রচণ্ড উত্তাপে শরীরের হাড়মাংস গলে পড়ার মতো অবস্থা। কেউ কারও জন্য ছাতা কিংবা ছায়া নিয়ে এগিয়ে আসবে না। আরশের ছায়া ছাড়া কোনো ছায়াও থাকবে না। সেই কঠিন দিনে সাত প্রকার লোক আরশের ছায়ায় জায়গা পাবে। এর একদল হলো যৌবনে যারা ইবাদত করে।

প্রিয় ভাই, আর্মিতে চাকরি নিতে চাইলে 'জোয়ান' হওয়া লাগে। বয়স্ক কেউ চান্স পায় না! কোনো প্রতিষ্ঠানের সামান্য কোনো কর্মচারী নিয়োগের ক্ষেত্রেও বুড়ো কাউকে পাত্তা দেওয়া হয় না। বুড়ো তো দূরের কথা, মধ্যবয়সীদের দিকেও কেউ ফিরে তাকায় না। অনেক প্রতিষ্ঠান তো নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে বয়সও নির্ধারণ করে দেয় ১৮ থেকে ৩০।

এর বেশি হলে আবেদন করার দরকারই নেই।

আমাদের রবও যুবক বয়সটাকে বেশি পছন্দ করেন। যৌবনের ইবাদত তাঁর কাছে বেশি প্রিয়।

কারণ কী?

যৌবনকাল হলো শয়তানের ধোঁকায় পড়ে বিপথে যাওয়ার বয়স। ধোঁকা থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রেখে যে যুবক তার রবের কাছে আত্মসমর্পণ করে, সে রবের প্রিয় হবে না তো কে প্রিয় হবে?

আগে তো সিনেমা দেখতে সিনেমাহলে যেতে হতো। পর্নগ্রাফির সিডি কিনতে যেতে হতো সিডির দোকানে। লজ্জা লাগত। কেউ আবার দেখে ফেলে নাকি! কেউ কিছু বলে ফেলে নাকি!

আর এখন?

কেউ দেখে না। লোকলজ্জার ভয়ও নেই। ঘরের দরজাটা বন্ধ করলে পুরোপুরিই নিজস্ব জগৎ। যে জগতে আর কারও প্রবেশাধিকার নেই। যা চাই, যেভাবে চাই, সবই পাওয়া সহজ। চোখের সামনে নেট-দুনিয়ার অবিরত হাতছানি। নিজেকে পাপ-পঙ্কিলতায় নিমজ্জিত রেখে রাতের পর রাত, দিনের পর দিন কাটিয়ে দিলেও কেউ নেই বাধা দেওয়ার। কেউ নেই কিছু বলার।

গুনাহের শত-সহস্র ছাতার ছায়া থেকে বেঁচে থেকে ইবাদতের কষ্ট সইবে যে যুবক, সে আরশের ছায়ায় স্থান পাবে না তো কে পাবে?

টান

দৃশ্যপট : ১

নদীর পাড়ে সুন্দর একটা মসজিদ। জানালা দিয়ে হুহু করে বাতাস আসছে। পাশের ফুলবাগান থেকে আসছে হৃদয় পাগল করা ফুলের ঘ্রাণ। সেই ঘ্রাণ বাতাসে মিশে এক মোহময় আবেশ তৈরি করেছে। মসজিদের বাইরেটা যতটা সুন্দর, ভেতরটা তার চেয়েও মনোমুগ্ধকর। কারুকার্যখচিত পাথরগুলো মেহরাবের সৌন্দর্য বাড়িয়ে দিয়েছে।

কার্পেটগুলো যেন লালগালিচা। স্বাগতিক কোনো দেশ কোনো রাষ্ট্রপ্রধানকে বিমানবন্দরে অভ্যর্থনা জানাতে যেভাবে লালগালিচা বিছিয়ে দেয়, যেন সেভাবেই আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের অভ্যর্থনা জানাতে সুদৃশ্য কার্পেটগুলো নিজেকে বিলীন করে দিয়েছে।

একটু পর আজান হলো। মুয়াজ্জিন সাহেব সুমধুর সুরে আহ্বান করছিলেন—মঙ্গলের দিকে আসুন! কল্যাণের দিকে আসুন! আজানের পর দীর্ঘ আধঘন্টা কেটে গেছে। নিস্তব্ধ মসজিদ। দু-চারজন বৃদ্ধলোক ছাড়া আর কেউ সেই সুমধুর ডাকে সাড়া দেয়নি।

দৃশ্যপট : ২

মসজিদের অনতিদূরেই বাজার। কেউ কেনাকাটা করছে। কেউ পণ্য বিক্রির জন্য নানান ভঙ্গিমায় খদ্দেরকে ডাকছে। কেউ কেউ অযথাই চেঁচিয়ে বেড়াচ্ছে। হইচই আর চেঁচামেচিতে কান ঝালাপালা। চায়ের দোকানগুলো জমে আছে আড্ডাবাজিতে। রাজনীতি, গালাগালি, একে অন্যের কুৎসা রটনায় কেটে যাচ্ছে মুহূর্তের পর মুহূর্ত।

কত সময় যে চলে গেছে, খবর নেই। চা খেয়েছে পাঁচ টাকার, কিন্তু আড্ডা চলছে লাগাতার! বসার জায়গা নেই তাতে কী, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই চলছে গলাবাজি।

অমুকের ছেলে কী করেছে, তমুকের মেয়ে কার সঙ্গে ভেগে গিয়েছে, কার সংসার ভেঙে তছনছ হয়ে গিয়েছে, কে কার খেতের আইলে লাঙ্গল

চালিয়েছে, কোন নেতা কার গম চুরি করে উদরপূর্তি করেছে এসব অহেতুক কথাবার্তায় বাজারটা ক্লেদপূর্ণ হয়ে আছে। কেউ কেউ এই ক্লেদের ভেতরে বসে আছে ঘণ্টার পর ঘণ্টা।

কোনো ক্লান্তি নেই, সময়গুলো নষ্ট হওয়ায় কোনো আক্ষেপ নেই। মসজিদের প্রতি দূরে থাক, বাড়ির প্রতিও টান অনুভব করছে না! কোনো জরুরি প্রয়োজনে বাড়ি গেলেও অস্থির হয়ে পড়ে, কখন আবার ফিরে আসবে 'ক্লেদপূর্ণ' প্রিয় জায়গাটায়।

মসজিদের পাশেই আরেক জায়গায় দেখা গেল একদল তরুণের জটলা। মাথায় মাথা ঠুকে কী যেন করছে! কাছে গিয়ে দেখা গেল গেমস খেলছে। পাবজি, ফ্রি-ফায়ার, ভাইস সিটি আরও কত হাবিজাবি! সকালে এসে বসেছিল, এখন দুপুর গড়াচ্ছে। বসেছে তো বসেছেই, ওঠার নাম নেই।

খাওয়া নেই, নাওয়া নেই!

কোনোদিকে কোনো মনোযোগ নেই।

এই যে একটু আগেই আজান হলো, নামাজের সময়ও পেরিয়ে যাচ্ছে, কিচ্ছু আসে যায় না তাতে। চোখের সামনে মোবাইল ফোন নিয়ে বুঁদ হয়ে বসে আছে। অন্য কোনো কিছুর প্রতি টানই অনুভব করছে না! মনে হচ্ছে পৃথিবী উলটে গেলেও এখান থেকে উঠবে না। মাথার ওপর ফ্যান নেই, বাতাস নেই, গরমে ঘেমেনেয়ে একাকার হয়ে গেছে, তবুও এসবের প্রতি 'টান' কমছে না।

অথচ মসজিদ কত শান্তির জায়গা! হৃদয়ের টান রাখতে বলা হয়েছে মসজিদের প্রতি। সাত দল লোক আরশের ছায়ায় আশ্রয় পাবে, এর মধ্যে এক দল হলো তারা, যাদের হৃদয়টা সারাক্ষণ মসজিদের দিকে আটকে থাকে। কোনো কারণে বাইরে এলেও হৃদয়টা আনচান করতে থাকে, কখন আবার মসজিদে যাবে।

এই গুণ ছিল সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে। দরজায় কেউ নক করেছে। বাড়ির বাচ্চাটা দরজা খুলে দিয়ে বলছে, 'আসসালামু আলাইকুম। কাকে চাই?'

'তোমার বাবার কাছে এসেছি।'

'বাবা তো বাসায় নেই।'

'কোথায় গেছেন?'

'মসজিদে।'

'কখন আসবেন?'

'বলতে পারছি না। মসজিদ হলো বেহেশতের বাগান। সব প্রয়োজন পূর্ণ হওয়ার স্থান। কখন আসবেন বলতে পারছি না'

আর আমাদের অবস্থা—'তোমার বাবা কোথায়?'

'মসজিদে।'

'কখন আসবে?'

'এক্ষুনি চলে আসবে। নামাজ পড়া ছাড়া মসজিদে আর কী কাজ?'

অন্যদিকে...

'বাবা কোথায়?'

'বাজারে।'

'কখন আসবে?'

'আমি কী করে বলব? বাজারে গেছে। কত লোকের সঙ্গে দেখা হবে। তাদের সঙ্গে বসে চা খাবে, গল্প করবে, এরপর বাজার করে কখন বাড়ি আসবে কে জানে।'

আর, সাহাবাদের জীবনে...

'তোমার বাবা কোথায়?'

'বাজারে গেছেন।'

'কখন আসবে?'

'বাজার তো সবচেয়ে নিকৃষ্ট জায়গা ওখানে একটুও দেরি করবে না। জরুরত সেরেই চলে আসবে। আপনি বসুন।'

আমাদের বাজার আর মসজিদের অবস্থা যদি সাহাবারা দেখতেন, মুনাফেক ছাড়া আর কিছু বলতেন কিনা কে জানে।

ন্যায়পরায়ণ

রেলস্টেশন। প্রচণ্ড শীত! অনেক লোক প্রায় উদোম গায়ে ফ্লোরে শুয়ে আছে। শীতে কাঁপছে। হঠাৎ সেখানে আগমন ঘটল এক মহামানবের!

ভদ্রলোক একা না।

সঙ্গে তার বেশ কজন সহচর। হাতে একগাদা কম্বল। ভদ্রলোক তাদের হাত থেকে একটা করে কম্বল নিচ্ছিলেন আর পরম মমতায় উদোম লোকগুলোর গায়ে পরিয়ে দিচ্ছিলেন।

সহচরদের মধ্যে একজনের হাতে ক্যামেরা। ক্যামেরায় ভদ্রলোকের 'মহান কাণ্ডগুলো' বন্দি করা হচ্ছিল এবং লাইভ প্রচার করছিল। প্রথমে ভদ্রলোককে মহামানব মনে হলেও জারিজুরি ফাঁস হলো কিছুক্ষণের মধ্যেই। আসলে সামনে নির্বাচন। নির্বাচনকে সামনে রেখেই তার এ মহা আয়োজন।

লাইভ দেখতে থাকা লোকদের কমেন্টে জানা গেল আরও তথ্য। তিনি বোনের সম্পদ গ্রাস করে 'পয়সাওয়ালা' হয়েছেন। যিনি বোনের হকই আদায় করতে পারেন না; তিনি নির্বাচনে জয়ী হওয়ার পর কী করে জনগণের হক আদায় করবেন?

ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ বা জনপ্রতিনিধি আরশের ছায়ায় স্থান পাবেন। কেমন হতে হবে তাকে? যিনি জনগণের মাল লুট করে কোটিপতি হন? যার খাটের নিচে পাওয়া যায় রিলিফের মাল? যিনি দেশের টাকা বিদেশে পাচার করে বনে যান মিলিওনিয়ার?

কখনোই না।

তাকে হতে হবে উমরের মতো। যিনি অর্ধ-দুনিয়ার জনপ্রতিনিধি ছিলেন। অথচ রাতের আঁধারে ছুটে যেতেন জনতার দুয়ারে। ভাবতে পারেন? শুধু ছোট্ট একটা ওয়ার্ড-কমিশনার না। একটা উপজেলার এমপি, দফতরবিহীন ছোটখাটো কোনো মন্ত্রী কিংবা শুধু একটা বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী না। অর্ধ-দুনিয়ার প্রতিনিধি! তিনি ছুটে যাচ্ছেন প্রজাদের দরজায়।

ডোর টু ডোর।

ভিলেজ টু ভিলেজ।

কার কী লাগবে, কে কোন অসুবিধায় আছে, কার ঘরে জ্বলছে না চুলা, না খেয়ে কে আছে কষ্টে, কার নেই পোশাক-পরিচ্ছদ, কে আছে সংকটে; সবার সমস্যা নিয়ে ভাবতেন। সমাধান দিতেন। তার পরেও আতঙ্কে থাকতেন, হাশরের ময়দানে কোনো প্রজা অভিযোগ করে কিনা! বান্দার হকের আদালতে পাকড়াও হয়ে যাই কিনা!

জনপ্রতিনিধির আচরণ হবে এমন। চিন্তাচেতনা হবে আখেরাতমুখী। তবেই মিলবে ছায়া। ...আরশের ছায়ায় জায়গা পাওয়া খুব কঠিনও নয়, আবার খুব সহজও নয়!

তিনি আমাদের কাছে কী চান?

ঢাকার কাছেই নরসিংদীতে 'ড্রিম হলিডে' নামে একটা পার্ক আছে। বাংলায় বললে—'স্বপ্নের ছুটির দিন'। অর্থাৎ আপনার স্বপ্নের ছুটির দিনগুলো এখানে অতিবাহিত করুন। আমরা আপনার স্বপ্নের মতো করে সাজিয়েছি আমাদের আঙিনা। চলে আসুন যেকোনো ছুটি বা উৎসবের দিনে।

৬০ একরের বিশাল আয়তন নিয়ে তৈরি। অনেক টাকায় টিকিট কেটে ভেতরে ঢুকতে হয়। অথচ ভেতরে সবকিছু কৃত্রিম। কৃত্রিমতার ছড়াছড়ি। পাহাড় আছে।

লেক আছে। ঝরনা আছে।

দৈত্য-দানব, জিন-পরি, ভূতুড়ে বাড়ি—সব।

কৃত্রিমতায় মোড়ানো এ জগৎটি তৈরি করতে কী পরিমাণ টাকা খরচ করা হয়েছে জানেন? জানলে নিশ্চয় চোখ কপালে উঠবে!

হুমায়ূন আহমেদ। লেখক, ঔপন্যাসিক, নাট্যকার। বাংলাদেশে তিনি অন্যতম লেখক, যিনি লেখালেখিকে পেশা হিসাবে বেছে নিয়ে 'সফল' হয়েছেন।

সৌখিন মানুষ ছিলেন।

গাজিপুরে বানিয়েছেন 'নুহাশপল্লি' নামের বিশাল বাগানবাড়ি। মনের মতো করে সাজিয়েছেন স্বপ্নের বাগানবাড়িটি। কোথাও কোনো অপূর্ণতা রাখতে চাননি। তৈরি করেছেন দিঘি-লীলাবতী, ট্রি হাউজ, ভূতবিলাস, পদ্মপুকুর। পুকুরের মাঝখানে কৃত্রিম দ্বীপ। রয়েছে মৎস্যকন্যা আর নানান শিল্পকর্ম। আছে বিশাল টিনশেডের বারান্দা-সহ বৃষ্টিবিলাস কটেজ। বানিয়েছেন দৃষ্টিনন্দন সুইমিংপুল।

স্বপ্নকে পূর্ণতা দিতে নিশ্চয় তাকে বিশাল অর্থ ব্যয় করতে হয়েছে! সেন্টমার্টিনে বানিয়েছেন 'সমুদ্র বিলাস' নামে বিরাট কটেজ! বহু টাকা ওখানেও ব্যয় হয়েছে।

হুমায়ূন আহমেদ তার একটি বইয়ে ইয়াকুব নামে এক ধনী লোকের সফলতার কথা লিখেছেন। লোকটার একমাত্র নাতনীর বয়স ছয়। বিদেশে থাকে। এই প্রথম দেশে আসবে। আদরের ছোট্ট নাতনিকে তিনি সারপ্রাইজ দিতে চান। সিদ্ধান্ত নিলেন, নাতনিকে একটা বিশাল উদ্যান উপহার দেবেন। সেই উদ্যানে সব থাকবে। একজন ইঞ্জিনিয়ারকে দায়িত্ব দিলেন। বললেন, 'টাকা-পয়সা নিয়ে চিন্তা করবেন না। উদ্যান দেখে আমার নাতনি যদি বলে—ওয়াও! এত্ত সুন্দর! তাহলেই আমার সন্তুষ্টি! বিনিময়ে আপনি যা পারিশ্রমিক চাইবেন তাই পাবেন।'

পানির মতো টাকা খরচ হলো।

সময় লাগল।

বানানো হলো পাহাড়, জলাশয় আর জোছনা দেখার জন্য চমৎকার পরিবেশ। তৈরি হলো বিশাল উদ্যান। হঠাৎ জানা গেল নাতনি আসবে না। ইয়াকুব সাহেবের মন ভেঙে গেল। আফসোসে বুক ভারী হলো—কী লাভ হলো এত টাকা খরচ করে?

গল্পের শেষদিকটা চমৎকার ছিল। ইয়াকুব সাহেবের নাতনি অবশেষে এসেছিল। উদ্যানে পা রেখে বলেছিল—'ওয়াও!'

এই 'ওয়াও'-টা শোনার জন্য ইয়াকুব সাহেবকে কত কোটি টাকা ব্যয় করতে হয়েছিল তা আর নাই-বা জানলাম।

এ তো গেল গল্পের কথা। বাস্তবে এমন অনেক কিছু আছে পৃথিবীজুড়ে। আমার আপনার চোখদুটোকে স্বপ্নালু করতে বিশ্বের আনাচে কানাচে ছড়িয়ে আছে এমন অনেক কৃত্রিমতা। যা দেখতে গিয়ে আপনি কাড়ি কাড়ি টাকা খরচ করেন। বহু সময় ব্যয় করেন। ব্যবসা-বাণিজ্য, চাকরি-বাকরি ফেলে দিনের পর দিন ঘুরতে থাকেন।

কী উদ্দেশ্যে?

পৃথিবীর এ কৃত্রিম সৌন্দর্য উপভোগ করবেন বলে।

প্রিয় ভাই, আমাকে-আপনাকেও পৃথিবীতে পাঠানো হয়েছে একটা উদ্দেশ্যে। আমরা কেউ নিজ ইচ্ছায় আসতে পারিনি। আল্লাহ পাঠিয়েছেন।

কেন পাঠালেন তিনি?

পুরোনো একটা গান আছে। 'দুনিয়াটা মস্ত বড়... খাও দাও ফুর্তি করো...!' কী বোকা বোকা গান। খাওয়া-দাওয়া ছাড়া যেন আর কোনো কাজ নেই। পেটুক আর লোভী নাহলে কেউ এই গান রচনা করে?

প্রিয় ভাই, জীবনের একটা উদ্দেশ্য থাকা চাই! একটা ঘর বানাতে হলে আমরা আগে উদ্দেশ্য ঠিক করি। কেন বানাচ্ছি?

ধরুন, কেউ গাছ লাগাচ্ছে। আপনি প্রশ্ন করলেন—'কী ভাই, কী করছেন?'

'দেখতেই তো পাচ্ছেন গাছ লাগাচ্ছি।'

'কেন?'

'কেন আবার? আপনি কি পাগল? জানেন না, মানুষ কেন গাছ লাগায়?'

'বলেন না, জানতে চাচ্ছি!'

'ফল খাব ফুল আসবে। যা দেখে-খেয়ে হৃদয় প্রশান্ত করব!'

উদ্দেশ্য আছেই।

গোবর তো ফেলনা জিনিস। ধরুন, কেউ একজন গোবর ঘাঁটাঘাঁটি করছে। তাকে প্রশ্ন করুন, 'ভাই, কী করছেন?'

'দেখছেনই তো গোবর ঘাঁটছি!'

'গোবর ঘাঁটছেন কেন? পাগল নাকি আপনি?'

'আপনিই পাগল। কেন গোবর ঘাঁটছি বুঝতে পারছেন না? এগুলো দিয়ে ছোট ছোট দলা তৈরি করব। এরপর রোদে শুকাতে দেবো। শুকনো দলাগুলো জ্বালানির কাজে লাগবে—বুঝতে পারছেন আহাম্মক!'

দেখলেন তো, আহাম্মক বানিয়ে দিলো। রাগ করবেন না। আসলে উদ্দেশ্য ছাড়া কেউই কাজ করে না। এমনকি গোবরও ঘাঁটে না। ছোট থেকে ছোট কাজ, কিংবা বড় থেকে বড়; সব কাজের পেছনেই উদ্দেশ্য থাকে। আর, মহান আল্লাহ এই বিশাল পৃথিবী বানিয়েছেন। আকাশ-নদী, সাগর-পাহাড়, গাছপালা, ফুল-ফল বানিয়েছেন এমনি এমনি?

উদ্দেশ্য ছাড়াই?

প্রিয় ভাই, আপনার পাঁচতলা বাড়িটির ছোট্ট একটা পানির ট্যাংক বানাতে কত্ত টাকা খরচ হয়ে গেল! বাড়ির সামনে ছোট্ট একটা বাগান বানাতে কত পরিশ্রম করলেন। অথচ আমাদের রব পৃথিবীজুড়ে বিশাল বিশাল সাগর-সমুদ্র বানিয়ে রেখেছেন। তৈরি করে দিয়েছেন আমাজন, কঙ্গো রেইন ফরেস্ট অথবা সুন্দরবনের মতো অসংখ্য বনাঞ্চল।

কার জন্য?

আমাদের উপকারের জন্যই।

আমাদের বেঁচে থাকার জন্য জরুরি উপাদানগুলোর একটি হলো সবুজ বনাঞ্চল। পৃথিবীজুড়ে অসংখ্য সুন্দর সুন্দর বন আছে, যেগুলো সব মিলিয়ে পৃথিবীর এক-তৃতীয়াংশ। 'পৃথিবীর ফুসফুস' হিসাবে খ্যাত এই সবুজ জায়গাগুলো থেকে প্রাপ্ত বিশুদ্ধ অক্সিজেন—যুগযুগ ধরে বেঁচে থাকতে সাহায্য করছে মানুষকে।

মহাবন আমাজনের কথাই ধরা যাক।

এটি এতই বড় যে, যুক্তরাজ্য এবং আয়ারল্যান্ডের মতো ১৭টি দেশের সমান এর আয়তন। গরম আবহাওয়া, প্রচুর বৃষ্টিপাত আর আর্দ্রতার কারণে আমাজন বন উদ্ভিদ ও প্রাণবৈচিত্র্যে ভরপুর। কেবল আমাজনেই রয়েছে পৃথিবীর প্রায় অর্ধেক প্রজাতির গাছ!

উইকিপিডিয়ার তথ্যমতে আমাজনে আছে—১২০ ফুট উঁচু উঁচু গাছ। ৪০ হাজার প্রজাতির উদ্ভিদ। আড়াই মিলিয়ন প্রজাতির কীটপতঙ্গ। ৩৭৮ প্রজাতির সরীসৃপ। ৪২৮ প্রজাতির উভচর এবং ৪২৭ প্রজাতির স্তন্যপায়ী

প্রাণী-সহ হাজারও প্রজাতির জানা-অজানা প্রাণী। এদের ঘিরেই গড়ে উঠেছে বিশ্বের অন্যতম শক্তিশালী ইকোসিস্টেম।

এই ইকোসিস্টেম যদি কৃত্রিম উপায়ে তৈরি করতে হতো, তাহলে কত কোটি টাকা খরচ হতো, সেই হিসাব কি আমরা রাখি?

সুন্দরবন সম্পর্কেই-বা আমরা কতটুকু জানি?

পৃথিবীর বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বন। প্রায় ১০ হাজার বর্গকিলোমিটারের এই বনের ৬০ শতাংশ বাংলাদেশে পড়েছে। যদি টঙ্গী থেকে নারায়ণগঞ্জ পর্যন্ত ঢাকার সীমানা বিবেচনা করা হয় তাহলে সুন্দরবন প্রায় ২০টি ঢাকা শহরের সমান!

আমাদের সামগ্রিক জীবনের ওপর আল্লাহপ্রদত্ত ভারসাম্যপূর্ণ প্রাকৃতিক পরিবেশের অবদান আমরা স্বচক্ষে দেখি না বলে আমাদের কাছে তা তেমন গুরুত্ব পায় না।

একটি গবেষণায় উঠে এসেছে, সুন্দরবন আমাদের প্রায় ২৪টি ইকোসিস্টেম সেবা প্রদান করে আসছে। যদি অর্থের বিনিময়ে এই সেবা গ্রহণ করতে হতো, তাহলে এর পেছনে বছরে কয়েক মিলিয়ন ডলার ব্যয় করতে হতো!

তো, এই বিশাল আয়োজন আমাদের রব কেন করেছেন? কেনই-বা আমাদেরকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন? খেয়েদেয়ে ফুর্তি করতে?

না, নিশ্চয়!

মহামহীয়ান আল্লাহ এই সুবিশাল পৃথিবীর অসামান্য আয়োজন করেছেন আমাদের উপকারের জন্য। আর, আমাদের পাঠিয়েছেন তাঁর আদেশ মানার জন্য। নিষেধ থেকে বাঁচার জন্য। এককথায় বললে, তাঁর ইবাদত করার জন্য।

ব্যস, এইটুকুই।

আমাদের কাছে আমাদের প্রিয় রব, আর কিছু চান না। কোনো অর্থও না। ধনদৌলতও না। তবুও কি আমরা তাঁর হুকুম মানা থেকে দূরে সরে থাকব?

কাকে ফাঁকি দিচ্ছি?

: নামাজ পড়েছেন?

: আমরা তো চাষাভূষা মানুষ! দিন আনি দিন খাই। আমাগো কি নামাজ পড়লে চলব? নামাজ পড়লে কাজকাম করুম কখন?

: আপনি পড়েছেন?

: আমরা তো চাকরিজীবী! পরের চাকরি করি। সময়ের আগেই ডিউটিতে যেতে হয়। নয়তো কপালে থাকে বসের চোখ রাঙানি! নামাজের সুযোগ কই?

: আপনি?

: ব্যবসা করি। মাত্রই দোকানটা খুলছি। নামাজে তো যাইতেই হবে। এইটা তো ভালো কাজ। কিন্তু দোকান রাইখা নামাজে গেলে দোকান দেখবে কে বলেন?

: ছোট ভাই, কী করো তুমি?

: পড়াশোনা।

: নামাজটা পড়েছ?

: কী যে বলেন! পড়াশোনার যে চা-প! নামাজ পড়ার সময় কই? তা ছাড়া, ... ইয়ে... মানে... কাপড়টাও পাক-পবিত্র নাই। ক্যামনে কী করি বলেন?

... এভাবেই কিছু মানুষ এড়িয়ে যায়। মহান রবের মস্তবড় হুকুম মানা থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে চায়।

হঠাৎ একদিন। খবর পাওয়া যায়, চাষী করম আলী আর নেই! ইহধাম তাকে বিদায় জানিয়েছে।

... অফিসে যাচ্ছিলেন আনোয়ার সাহেব। চাকরিজীবী ভাইটি। সময়মতোই পৌঁছতে চেয়েছিলেন। সময় তাকে সহায়তা করেনি। একটা

অ্যাকসিডেন্টে পঙ্গু হাসপাতালে ভর্তি হতে হয় তাকে। অথর্ব, অকাজের হয়ে কাটে তার বাকি জীবন।

... ব্যবসায়ী মহাজন সাহেব! দোকান দোকান করেই কাটত তার সারা বেলা। ব্যবসার হিসাব কিতাব মেলাতে গিয়েই হঠাৎ একদিন দুপুরে ব্যথা ওঠে বুকে। নামাজ পড়ার সময় ছিল না যে লোকটির। আল্লাহকে দেওয়ার মতো সময় কখনো হয়নি যার। হ্যাঁ, তিনিই। হাসপাতালে নেওয়ার আগেই চলে গেলেন ওপারে।

... আর, ওই যে ছাত্র ভাইটি! নামাজে যার ছিল চির গাফলতি! অল্প বয়সে সেও চলে গেল একদিন। বড় আশা ছিল তার। জীবনকে নিজের মতো করে সাজাবার। জীবনের রং, রস, গন্ধে মাতাল ছিল তার মন। আল্লাহকে চেনার তার সময় ছিল কখন?

এখন, আমরা কী ভাবছি?

আমি কি চাষী করম আলী?

আমি কি আনোয়ার সাহেব?

আমি কি ব্যবসায়ী মহাজন?

কিংবা সেই ছাত্রটি?

এত তাড়াতাড়ি মরব নাকি আমি! এখনো তো অনে-ক দেরি!

অথচ মৃত্যু প্রতিদিনই আমার সামনে থেকে কাউকে না কাউকে নিয়ে যাচ্ছে। নশ্বর থেকে অবিনশ্বরের পথে কেউ না কেউ পাড়ি জমাচ্ছে। যেতে হবে আমাকেও। তবুও হুঁশ হয় না, আজানের শব্দেরা দোলা দেয় না। খোলে না বন্ধ হয়ে থাকা হৃদয়মিনার।

এভাবে কতদিন আর?

প্রিয় আত্মসম্মানবোধসম্পন্ন বন্ধু!

বড়লোকের মেয়ের বিয়ের অনুষ্ঠান হচ্ছে। বিশাল এবং অত্যাধুনিক কনভেনশন সেন্টারে জমকালো আয়োজন। অতিথিরা আসছেন। একেকজন দামি দামি গাড়ি থেকে নামছেন।

জমকালো পোশাকে।

স্যুটেড-বুটেড হয়ে।

অতিথিদের চেহারায় আভিজাত্যের ছাপ। প্রতিটি পদক্ষেপে ভারিক্কি ভাব। মুচকি হেসে একে অন্যের সঙ্গে কুশল বিনিময় করছেন। কথায়, হাসিতে, চলনে-বলনে বড়লোকি গাম্ভীর্যতা। এমন একটি অনুষ্ঠানে হঠাৎ আপনার আগমন। আপনি এক মধ্যবিত্ত অতিথি। পোশাক-পরিচ্ছদে নেই আভিজাত্য। সাদামাটা। অনাড়ম্বর।

সবাই ভ্রু কুঁচকে তাকিয়ে আছে। 'কে এই লোক? এমন এক অনুষ্ঠানে এইসব লোক দাওয়াত পায় কী করে?'

আপনার তাতে মন খারাপ। ইগোতে লাগছে। এভাবে অপমান! তখনই বেরিয়ে যেতে ইচ্ছা করছে। পারছেন না। পাত্রপক্ষের পুরোনো বন্ধু আপনি। দাওয়াত পেয়ে বউবাচ্চা-সহ উপস্থিত হয়েছেন। চলে যেতে দেখলে লোকেরা খারাপ ভাববে। প্রশ্ন তুলবে। আসার পর সমালোচনা। চলে যেতে চাইলেও সমালোচনা।

লজ্জায় আপনার মাথাকাটা যাচ্ছে। 'কেন যে এলাম!'

আরেকদিনের ঘটনা।

অফিস থেকে ট্যুরে যাওয়া হচ্ছে। ট্রেনে দুই ধরনের টিকেট কাটা হলো। কর্মকর্তাদের জন্য ভিআইপি কেবিন। কর্মচারীদের জন্য সাধারণ শোভন চেয়ার। আপনার অহংবোধ প্রবল। সহকর্মীদের সঙ্গে বলাবলি করছেন—

: এটা কোনো কথা হলো? আমাদের দেওয়া হলো চেয়ারে। আর, উনারা যাচ্ছেন কেবিনে শুয়ে; আরামসে। সব জায়গাতেই বৈষম্য আর ভেদাভেদ। আলাদা চোখে দেখা। কিচ্ছু ভালো লাগে না।

ঘটনা আরও আছে। আপনি যে বাড়িটিতে ভাড়া থাকেন। এই তো, সেদিনও। বাড়িওয়ালা সামান্য কারণে আপনাকে ডেকে নিয়ে চরম অপমান করল। আপনি নাকি ভাড়া দিতে দেরি করেন। আপনার নাকি সময়জ্ঞান নেই।

অথচ আপনি প্রতিমাসের পাঁচ তারিখের আগেই ভাড়া দিয়ে যাচ্ছেন। প্রবলেম থাকতেই পারে কখনো কখনো। দুয়েক দিন দেরি হলেই শুনতে হয় নানান গঞ্জনা। অপমানিত হতে হয় উঠতে বসতে।

শুধু কি তাই?

'পানি এত বেশি খরচ হয় কেন?'

'কারেন্ট বিলের টাকা কি আসমান থেকে আসে নাকি?'

'টয়লেটের বাতি সারা রাত জ্বালায় রাখেন কেন?'

ইত্যকার নানান ভর্ৎসনা মাথায় নিয়ে আপনাকে দিনযাপন করতে হয়। বাড়িওয়ালা নিজেকে ভাবে সম্রাট শাহজাহান, আপনাকে ভাবে তার বাড়িতে আশ্রিত। অথচ মাসের পর মাস আপনি টাকা দিয়ে থাকছেন। তবুও 'দয়ার দান' মনে করে থাকতে হচ্ছে।

কী এক অসহ্য বৈষম্য!

আপনার কখনো কি মনে হয় না, একজন এমন আছেন; যার কাছে ভেদাভেদ নেই?

বৈষম্য নেই?

ধনী-গরিব তারতম্য নেই?

সবাই সমান!

তিনি পাঁচ বেলা ডাকছেন। মসজিদে। একবার সেখানে গিয়ে দেখুন। চৌধুরি আর চাকলাদার, মালিক আর ড্রাইভার, বাড়িওয়ালা-ভাড়াটিয়া, কর্মকর্তা-অফিসপিয়ন এক কাতারে দাঁড়িয়ে আছেন। কেউ অহংবোধে ভুগছে না। বোধটাই যেন চেঞ্জ হয়ে গেছে! অফিসের ডাইরেক্টর নাক কুঁচকে বলছে না—'একী! টেবিলে টেবিলে চা আর পানি পরিবেশনকারী ছোকরাটা আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে কেন?'

বিশাল বাড়ির মালিক কপালে বিরক্তির রেখা টেনে বলছে না—'তুমি সামান্য দুই টাকার ভাড়াটিয়া। তোমার জায়গা তো এখানে না! পেছনের কাতারে। যাও যাও পেছনে গিয়ে দাঁড়াও।'

কী বিস্ময়কর!

ক্ষমতা দেখানোর সে চিন্তাটাই যেন আল্লাহর ঘরে এসে বিলুপ্ত হয়ে গেছে! এরপরও কি আপনি ভেদাভেদহীন এ কাতারে এসে দাঁড়াবেন না?

জাহান্নামের কঠিন স্টেশন

বিকেলবেলা দাওয়াতের কাজে বেরিয়েছি। ওমানের 'মাবেলা' এলাকার এক ফ্যাক্টরির ওয়ার্কারদের দাওয়াত দেওয়া হচ্ছিল। কথা বলছিলেন এক ইন্ডিয়ান আলেম। সবাই মনোযোগ দিয়ে তার দ্বীনি কথাগুলো শুনছিল। কথা শেষে কিছুদূর ফিরে আসতেই এক বাঙালি যুবক হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এসে বলল, 'আপনাদের সাথে কিছু কথা ছিল।'

আমরা দাঁড়ালাম। সে নিজেকে গুছিয়ে নিয়ে বলল, 'আমাদের ম্যানেজার একজন ইন্ডিয়ান অমুসলিম। নামাজের সময় মুহূর্তের জন্যেও ছুটি দেয় না। চাকরি থেকে ছাঁটাই করার হুমকি দেয়। বড় কষ্ট হয় এজন্য যে, নামাজগুলো সময়মতো আদায় করতে পারছি না। কাজ শেষে বাসায় গিয়ে কাজা আদায় করতে হয়। এই অবস্থায় নামাজ কাজা করার জন্য আল্লাহ কি আমাকে শাস্তি দেবেন? দোজখে কি আমার আজাব হবে?'

... এতটুকু বলেই সে হুহু করে কাঁদতে লাগল। তার কান্নার আওয়াজ চুলায় বসানো ডেগের গরম পানির মতো টগবগে শোনা যাচ্ছিল। কান্নার তীব্রতায় কথাও বলতে পারছিল না। আমরা তাকে থামাব কী, নির্বাক চোখে তাকিয়ে রইলাম।

নামাজ কাজা করার জাহান্নামে যে শাস্তি হবে সেই ভয় তার চোখে-মুখে। আমরা তার পিঠে সান্ত্বনার আলতো পরশ ছোঁয়ালাম। কান্নার ঢেউ কিছুটা দমে এলে সে বলল,

'এখান থেকে পালিয়ে গিয়ে যে অন্য কোথাও কাজ নেব, সেই উপায়ও নেই। ধরা পড়লে সোজা জেলে দিয়ে দেবে। আপনারা আমার জন্য দোয়া করবেন...!'

দাওয়াত দিয়ে ফিরে এসে সারাটা বিকেল ঘোরের মধ্যে কাটল আমার। নামাজ তো আমিও পড়ি। হয়তো দায়িত্ববোধ থেকেই কাজটা হয়ে যায়। কিন্তু আল্লাহর ভয়, জাহান্নামের আজাবের কথা কখনো কি অনুভূত হয় আমার?

এই ভাইটি ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও, সুযোগের অভাবে নামাজ পড়তে না পারায় হৃদয়ের যে অনুভূতি প্রকাশ করল, যে কষ্ট সে পাচ্ছে; আমরা যারা অফুরন্ত সময় সুযোগ পেয়েও অবলীলায় দিনের পর দিন নামাজ কাজা করে দিচ্ছি, তাদের কি এই অনুভূতি হয় যে—আমাদেরও তো একদিন সর্বশক্তিমানের আদালতে দাঁড়াতে হবে, জাহান্নামের কঠিন স্টেশন তো আমার সামনেও রয়েছে!

কী উপায় হবে?

কী জবাব দেবো?

... কখনো কি ভেবেছি? একটু ভাবি। এই ভাবনাও আমাদের অনেক উপকারে আসতে পারে। খুলে দিতে পারে মহাকল্যাণের দ্বার।

এ কেমন ভিক্ষুক!

আপনি একজন সেলিব্রিটি মানুষ। সবাই আপনাকে সম্মান করে। গুণগান গায়। একবার এক বিরাট ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানের সম্মাননা অনুষ্ঠানে আপনাকে দাওয়াত দেওয়া হলো। মান্যগণ্য অনেকেই এসেছেন। অনুষ্ঠানের একপর্যায়ে সবাইকে সম্মাননা ক্রেস্ট প্রদান করা হচ্ছিল।

একেকজনকে স্টেজে ডাকা হচ্ছিল আর ভরা মজলিসে তার গুণগান গেয়ে ক্রেস্ট প্রদান করছিল।

এবার আপনার পালা। আপনি স্টেজে গেলেন। সবাই আপনার দিকে তাকিয়ে আছে। আপনি অপেক্ষা করছেন। এখন আপনারও গুণকীর্তন করা হবে।

কিন্তু এ কী!

মাউথপিস হাতে লোকটা এমন করছে কেন? হিজিবিজি কীসব বলছে কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। এত দ্রুতগতিতে কথা বলছে যে, কোনো কথাই স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে না। কেমন যেন জোকারের মতো করছে। আপনার অসামান্য গুণের কথা শুনে বাহবা দেবে দূরে থাক, অডিয়েন্সসুদ্ধ লোকজন হেসে গড়াগড়ি খাচ্ছে।

আপনি অপমানিত বোধ করছেন। ডেকে এনে এত্তগুলো লোকের সামনে এভাবে অপমান! মেজাজ চটে গেল আপনার। এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে বড় ধরনের ব্যবসার ডিল করার কথা ছিল। সিদ্ধান্ত বাতিল করলেন।

আরেকদিনের কথা।

আপনার দুয়ারে ভিক্ষুক এসেছে। আপনিও প্রস্তুত ছিলেন ভিক্ষা দেওয়ার জন্য। কিন্তু ভিক্ষুকের একটা আচরণে আপনার মেজাজটাই বিগড়ে গেল। কারও কাছে কিছু চাইতে হয় বিনয়ের সঙ্গে। যেন দাতার মন গলে যায়। অথচ এই ভিক্ষুক হাত-পা ছুড়ে এমন সব অঙ্গভঙ্গি করছিল আর এত দ্রুত ভিক্ষা চাইছিল, যেন আপনার সঙ্গে মজা করছে! বিনয় ও নম্রতার ধারে-কাছে দিয়েও সে যাচ্ছে না।

চরম ঔদ্ধত্য প্রকাশ করছে। আপনার কি ইচ্ছা করবে তাকে টাকা-পয়সা দিয়ে সাহায্য করতে? শুধু আপনি কেন, কারোরই ইচ্ছে করবে না। এরকম ভিক্ষুকের প্রতি কারও দয়া হবে দূরে থাক, ফিরেও তাকাবে না। দরজা থেকে দূর দূর করে তাড়িয়ে দেবে।

আরেকদিনের ঘটনা।

জরুরি কাজে বিদেশ যাবেন। কিছু কাগজপত্র সত্যায়নের জন্য এমপি মহোদয়ের সিগনেচার দরকার। অনেকদিন ধরেই পেছন পেছন ঘুরছেন। এমপি সাহেবের শিডিউল পাচ্ছেন না। তিনি আজকে ঢাকা যাচ্ছেন তো পরশুদিন চিটাগাং। আজকে অমুক জায়গায় মিটিং তো কালকে তমুক কনফারেন্সে বক্তৃতা। আপনি বারবার অনুরোধ করে তাকে রাজি করালেন। এত ব্যস্ততার মধ্যেও তিনি আপনার কাজটি করে দিতে সময় বের করলেন।

একদিন আপনাকে ডেকে পাঠালেন তার বাসভবনে। সব কাজ ফেলে আপনাকে বললেন, 'কই, দেখি কী করতে হবে?'

অদ্ভুত ব্যাপার, যখন তিনি আপনার প্রতি মনোযোগী হলেন, তখন আপনি আপনার মনটাকে নিয়ে গেলেন অন্য কোনো দিকে। তার আগ্রহের প্রতি ভ্রুক্ষেপই করলেন না, অন্য কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। এখন আপনিই বলুন, আপনি কি আপনার কাজটা তাকে দিয়ে করাতে পারবেন? তিনি কি আপনার প্রতি প্রচণ্ড বিরক্ত হবেন না? তিনি কি রেগে গিয়ে বলবেন না, 'মিয়া, তোমার কি মাথা খারাপ? কোনদিকে তাকিয়ে আছ? আমার কাছে এসে আমাকেই অবজ্ঞা করছ?'

এবার আসুন আমাদের নিজেদের ইবাদতের ব্যাপারেও একটু ভাবি! মসজিদ আল্লাহর ঘর। প্রতিদিন পাঁচ বেলা তিনি তাঁর দরজায় আমাদের ডেকে নেন। যখন তিনি আমাকে সাহায্য করার জন্য, আমার কথা শোনার জন্য মনোযোগী হন, আমি তখন এতটাই অবহেলা প্রকাশ করি, যেন তাঁর কাছে আমার কোনো কিছুই চাওয়ার নেই।

মুখে তো বলতে থাকি, 'আমরা আপনারই ইবাদত করি, আপনার কাছেই সাহায্য চাই'; কিন্তু অন্তরটা পড়ে থাকে অন্য জায়গায়।

আমার দাঁড়ানো!

আমার রুকু!

আমার সেজদা—কোনো কিছুই সঠিকভাবে আদায় করি না। সবকিছুতেই তাড়াহুড়া। ভিক্ষুক হয়ে যাঁর দরজায় দাঁড়িয়েছি, তার প্রতিই চরম উপেক্ষা প্রদর্শন করছি। সুরা-কেরাত কী পড়ছি না পড়ছি নিজেও জানি না। তিন রাকাত পড়েছি, নাকি চার রাকাত, নিজেরই হিসাব নেই।

তো, এই নামাজ দিয়ে কী করে আল্লাহকে রাজি করাব? আমার নামাজের গতি-প্রকৃতি যদি হয় পুরোনো নেকড়ায় পেঁচিয়ে মুখে নিক্ষেপ করার মতো, কী করে আশা করতে পারি আল্লাহর দিদার?

অভিশপ্ত ইবলিসের শত বাধাবিপত্তিকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে যদি জায়নামাজে দাঁড়াতেই পারি, তবে কেন পারি না নামাজটাকে প্রেমময় করতে? কেন পারি না মহান আল্লাহর প্রেমে নিজেকে বিলীন করে দিতে?

কখনো কি এভাবে সালাত আদায় করেছি?

মাওলানা তারিক জামিল হাফিজাহুল্লাহু একবার এক কারগুজারি শুনিয়েছিলেন। তিনি বলেন, আমরা একবার এক অমুসলিম ছেলেকে দাওয়াত দিয়ে মুসলিম বানালাম। এরপর তাকে সালাত পড়ার মতো কিছু মাসআলা আর সুরা ফাতেহা শিক্ষা দিলাম।

ফরজ, সুন্নত, নফল—সব সালাতই সে এই এক সুরা দিয়েই পড়ত।

কিন্তু একেকটা রাকাত সে এত লম্বা করে পড়ত যে, অবাক হয়ে যেতাম। এমন অবস্থা হয়েছে যে, ও নামাজে দাঁড়ালে আমরা বয়ান, তালিম ইত্যাদি শুরু করতে পারি না।

আমরা বললাম, 'ভাই, তোমার হয়েছেটা কী? ইসলাম গ্রহণের পূর্বে কি তুমি আরও কোনো সুরা মুখস্থ করেছিলে নাকি!'

'না।'

'তাহলে? মাত্র এক সুরা দিয়ে এত লম্বা নামাজ কীভাবে পড়ছ?'

এই নওমুসলিম তখন এক অবাক করা কথা বলল। বা আমাদের বিবেককে নাড়া দেওয়ার জন্য যথেষ্ট ছিল। 'তোমরা তো পুরোনো মুসলিম। তোমাদের সঙ্গে তোমাদের মালিকের সম্পর্কও পুরোনো। তাই তোমরা যখন সুরা ফাতিহার প্রথম আয়াত পড়ো, মালিক অতি তাড়াতাড়ি গ্রহণ করে ফেলেন। এরপর তোমরা সামনের আয়াত পড়ে ফেলতে পারো। কিন্তু আমি তো নওমুসলিম। মালিকের সঙ্গে সম্পর্কও নতুন। আমি যখন পড়ি, তখন অপেক্ষায় থাকি আমার এ আয়াত মালিকের কাছে গ্রহণযোগ্য হলো কি না। এজন্য একই আয়াত বারবার পড়তে থাকি। যতক্ষণ পর্যন্ত তিনি আমার হৃদয়ে এই কথা পৌঁছে না দেন যে, হ্যাঁ আমি তোমার হামদকে গ্রহণ করে নিলাম, ততক্ষণ পড়তেই থাকি।'

আল্লাহু আকবার! একজন নওমুসলিমের নামাজের বিবরণ শুনে বিস্মিত হতে হয়। কত গুরুত্বের সঙ্গে নামাজ পড়ত সে! তার কথা হচ্ছে, 'যার

সঙ্গে কথোপকথন হচ্ছে, তার পক্ষ থেকে যদি কোনো জবাবই আমি শুনতে না পাই, তো কেমন কথোপকথনকারী হলাম আমি!'

আর আমাদের অবস্থা দেখুন! নামাজে দাঁড়িয়েছি, যেন আল্লাহকে বলছি—'নিন, পড়ে নিলাম। আপনি গ্রহণ করলে করুন, না করলে নাই। আমার হাতে সময় নাই।'

নামাজে দাঁড়িয়েছি। ইমাম সাহেব সুরা পড়ছেন। আরশে আজিম থেকে অবতীর্ণ হওয়া পবিত্র বাণীগুলো একের পর এক তেলাওয়াত করছেন। কী সুমধুর তেলাওয়াত! কী চমৎকার অর্থপূর্ণ একেকটি আয়াত!

> (জান্নাতের) মিশ্রণ হবে তাসনিমের পানি। এটা এমন এক ঝরনা, যার পানি পান করবে নৈকট্যশীলগণ। [মুতাফফিফিন, ২৭-২৮]

অথচ আমি তাতে ভ্রুক্ষেপও করছি না। অনুভব করছি না বেহেশতি ঝরনার সৌন্দর্যকে। আমি এমনই নামাজি, আমার নজরে ভাসে কিছুক্ষণ আগে ইউটিউবে দেখা নায়াগ্রা জলপ্রপাত। মন মজে থাকে নরওয়ে কিংবা নেদারল্যান্ডের কোনো গার্ডেনে। ওদিকে, আমার জন্য অপেক্ষা করছে—তাসনিমের ঝরনা, হুরে ঈন, নহরে হায়াত... আরও কত কী!

আমাকে শোনানো হচ্ছে—

'তারা থাকবে সুউচ্চ জান্নাতে।' [সুরা গাশিয়া, ১০]

আমার তাতে মন নেই। আমি তখন বিশ্বের উঁচু উঁচু দালানের ছবির দৃশ্যে বুঁদ হয়ে আছি। অথচ আমার সামনে অপেক্ষা করছে ইয়াকুত নির্মিত টাওয়ার। এমন এমন অট্টালিকা, যার গাঁথুনি হবে মেশকের। ইট হবে স্বর্ণের। দরজার প্রস্থ হবে দৃষ্টির সীমা বরাবর।

সেসব সুশোভিত, সুরম্য বাসভবনের 'চাবি'র জন্য দাঁড়িয়েছি, অথচ মন পড়ে আছে 'পেট্রোনেজ টাওয়ার' কিংবা 'বুর্জ খলিফা'র সৌন্দর্যে।

অদ্ভুত নামাজি আমি!

তিন সমস্যার এক সমাধান

গরিব কৃষক বাকের। নিজে দ্বীনদার হলেও বউটা খুব খিটখিটে। নামাজ রোজার ধার ধারে না। সারাক্ষণ অভাব অভাব বলে ঘ্যানঘ্যান করে। বাকের যতই বোঝাক—আল্লাহর ওপর ভরসা রাখো, সময়মতো নামাজ আদায় করো, আল্লাহই আমাদের অভাব দূর করবেন—ততই যেন বউটা অবুঝ হয়ে উঠছিল।

দুপুরে ভাতঘুম দিতে গিয়ে বাকের আজ একটু বেশিই ঘুমিয়ে ফেলেছে। বাকেরের স্ত্রী স্বামীকে ঘুম থেকে ঠেলে তুলে বলল,

: এই, শুনছ! আটা নেই, আটা লাগবে। সন্ধ্যার আগে যেন ঘরে আটা এসে পৌঁছে! নাহলে কিন্তু আজ রাতের খাবার বন্ধ।

বাকের ধড়মড় করে বিছানায় উঠে বসল। ঘড়ি দেখল। তখনই আসরের আজান পড়ল। বড্ড দেরি হয়ে গেছে। বেচারা বাকের পড়ে গেল টেনশনে।

আটা আনতে বাজারে যাবে?

নাকি আসরের জামাতে শরিক হবে?

বাজারে গেলে নিশ্চিত মসজিদে জামাত শেষ হয়ে যাবে। এদিকে আবার জঙ্গলের ধারে গোয়ালের একমাত্র গরুটা বাঁধা আছে। সেটাকেও বাড়ি আনতে যেতে হবে। হঠাৎ মনে পড়ল—আরে! ক্ষেতেও তো পানি দিতে হবে! আজকে পানি না দিলে কাল সকালে বীজ রোপণ করাই যাবে না!

সমস্যা তিনটা। বিপরীতে নামাজ। সময় অল্প। সমাধান কী? কোনটাকে প্রাধান্য দেবে বাকের?

বাকের আল্লাহর হুকুমকেই প্রাধান্য দিলো। যা হয় হোক। আগে নামাজ। পরে কাজ। বাকের মসজিদে গিয়ে জামাতে আসর আদায় করল। নামাজের পর দোয়া-দরুদেরও পাবন্দি করল। এরপর দুরুদুরু বুকে মসজিদ থেকে বের হলো।

প্রথমে গেল জমিতে। বাকেরের জমিটা বাড়ি থেকে অনেক দূরে। যেতে যেতে প্রায় সন্ধ্যা হয়ে গেল। গিয়ে যা দেখল তাতে তার অবাক হওয়ার পালা। ক্ষেতভরতি পানি! আশ্চর্য, ক্ষেতে পানি দিলো কে! পাশের ক্ষেতে কাজ করছিল নোমান শেখ। বাকের অবাক গলায় জানতে চাইল—

: ভাই নোমান, আমার ক্ষেতে পানি দিলো কে? জানো কিছু?

: আমিই দিয়েছি। তোমার ভাগ্য ভালোই বলতে হবে।

: কীরকম?

: আর বলো না। আমি সেই বিকেল থেকে আমার ক্ষেতে পানি দিচ্ছিলাম। যতই পানি দিচ্ছি, ক্ষেতে পানি জমছিলই না! ঘটনা কী? পানি আমার ক্ষেত থেকে কোথায় বেরিয়ে যাচ্ছে? অনুসন্ধান করতেই দেখলাম, ক্ষেতের আইলের একটা অংশ ভেঙে আছে। আর সেই ভাঙা অংশ দিয়ে সব পানি তোমার ক্ষেতে চলে গেছে। আর কী? ততক্ষণে যা হওয়ার হয়ে গেছে। পানি তো আর তোমার ক্ষেত থেকে ফেরত আনা যাবে না!

বাকের খুশি হলো। রবের শোকর আদায় করল। দৌড়ে গেল বনের ধারে। গরুটা বাড়ি নিয়ে যেতে। গিয়ে দেখল গরু যেখানে বাঁধা হয়েছিল সেখানে নেই। বুকটা ধক করে উঠল। গরুটা গেল কোথায়! আশেপাশে আঁতিপাঁতি করে খুঁজেও যখন গরু পাওয়া গেল না, দুরুদুরু বুকে বাড়ি ফিরে গেল বাকের। বউকে বলল,

: গরুটা কোথাও খুঁজে পেলাম না।

দুই হাতে আটা মাখানো অবস্থায় বউ বলল,

: মাথাটাথা খারাপ হয়নি তো আপনার? দেখছেন না গোয়ালঘরে জলজ্যান্ত গরু দাঁড়িয়ে আছে? ঘাস খাচ্ছে?

বাকের অবাক গলায় বলল—

: সেকী! কে আনল গরু?

: কেউ আনেনি। আজ একা একাই বাড়িতে এসেছে।

: বুঝলাম। কিন্তু তোমার হাত আটামাখা কেন? আটা পেলে কোথায়?

: আটা পেলাম কোথায় মানে! আপনিই তো আটা কিনে পাঠালেন!

: কী বলছ! আমি তো মসজিদে চলে গিয়েছিলাম। আটা তো আমি পাঠাইনি!

: তাহলে কুলি ব্যাটা আটার ব্যাগ দিয়ে গেল এমনি এমনি? তার কি খেয়েদেয়ে কাজ নেই?

স্বামী-স্ত্রী যখন কথা বলছিল, তখন পাশের বাড়ির জামাল মিয়া এসে বলল,

: একটা ভুল হয়ে গেছে, ভাই বাকের! কুলি ব্যাটাকে আমিই আটা দিয়ে পাঠিয়েছিলাম। ভুল করে আমার বাড়ির বদলে আটার ব্যাগ তোমার বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে গেছে।

বাকেরদম্পতি এ-ওর দিকে তাকাল। কী সর্বনাশ! এখন উপায়? আটা তো অলরেডি রুটি বানানোর কাজে লেগে গেছে! জামাল মিয়া বলল,

: সমস্যা নেই। যেহেতু আটা দিয়ে রুটিও তৈরি হয়ে গেছে, অতএব, বাকি আটা আমাকে আর ফেরত দেওয়ার প্রয়োজন নেই। এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের তাকদিরে ছিল। তোমাদের রিজিকের জিনিস আমি নিই কী করে? সুতরাং সব আটা তোমাদের জন্য হাদিয়া।

শোকর আদায় করল বাকের। এ সবই আল্লাহর হুকুমকে প্রাধান্য দেওয়ার বদলা।

চির হতভাগ্য

বাসায় পারিবারিক বিরাট কোনো অনুষ্ঠান চলছে। বাড়িভরতি আত্মীয়স্বজন। খালারা এসেছে। মামা-মামি, ফুফা-ফুফু। কাজিনরাও এসেছে। কাজিনদের অনেকেরই বিয়ে হয়ে গেছে। কারও কারও বাচ্চাকাচ্চা আছে। বাচ্চারা একদণ্ডও বসে থাকার পাত্র না। হইহুল্লোড়ে পুরো বাড়ি গমগম করছে। রাতে শুরু হলো কনসার্ট। শহরের নামিদামি ব্যান্ডদলকে ভাড়া করা হয়েছে। ছেলেছোকরার দল নেচে গেয়ে আনন্দ করছে।

গভীর রাত। আনন্দঘন মুহূর্তগুলো যেন শেষই হচ্ছে না। আনন্দ আর আনন্দ। এমন সময় বাড়ির পেছনের দেয়াল টপকে একদল ডাকাত ঢুকে

পড়ল। ঢুকেই মেইন সুইচ অফ করে দিলো। কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগেই শুরু করে দিলো ভাংচুর। মুহূর্তেই সবকিছু ভেঙেচুরে তছনছ করে দিলো।

এরপর শুরু করল প্রচণ্ড গোলাগুলি। গুলি করে ঝাঁজরা করে দিলো সবাইকে। নৃশংস হত্যাকাণ্ড। ছোট বড় কাউকেই রেহাই দিলো না। এরপর চলতে লাগল লুটপাট। বাড়ির ভেতরের আলমারি, সিন্দুক, শোকেস ভেঙে মূল্যবান অনেক গহনাগাটি লুটে নিলো। এতেই ক্ষান্ত হলো না। লাশগুলো একত্র করে পেট্রোল ঢেলে আগুন ধরিয়ে দিলো।

এরপর আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দিলো বাড়িটাও। কিছুই আর অবশিষ্ট রাখল না। মুহূর্তের মধ্যে সবকিছু তছনছ করে দিয়ে গেল।

ধরা যাক, কোনো কারণে বাড়ির বাইরে থাকায় একমাত্র আপনিই বেঁচে গেছেন। কেমন লাগবে আপনার? চিরনিঃস্ব আর হতভাগ্য মনে হবে না? বেঁচে থাকতে ইচ্ছা করবে আর? বেঁচে থেকেই-বা লাভ কী? ভাইবোন, মা-বাবা, আত্মীয়স্বজন, ঘর-বাড়ি সবই তো শেষ!

এর চেয়ে হতভাগ্য এবং বঞ্চিত ওই ব্যক্তিকে বলা হয়েছে, যার কাছ থেকে এক ওয়াক্ত নামাজ ছুটে গেল। সে যেন সব হারিয়ে নিঃস্ব এবং ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে গেল। যার কোনোই ক্ষতিপূরণ নেই।

একবার এক সফরে সুনামগঞ্জের 'দিরাই' যাচ্ছিলাম। সফরসঙ্গী আমরা ১১ জন। সায়েদাবাদ থেকে টিকেট কাটার পর কাউন্টারে বসা এক যাত্রী বললেন,

: আপনারা ভুল করলেন।

: কী ভুল?

: বি-বাড়িয়া রোডে যাওয়াটা ঠিক হবে না।

: কেন?

: এই পথে গভীর রাতে ডাকাতের ভয় আছে।

: তাহলে এখন উপায়?

: আপনারা এক কাজ করেন।

: কী কাজ?

: 'টিকেট ফেরত দিয়ে নেত্রকোনা রোডে চলে যান। যদিও সময় একটু বেশি লাগবে। তবে নিরাপদে পৌঁছতে পারবেন।'

এই রাতের বেলা! ১১ জন যাত্রীর টিকেট ফেরত! অনেক চেষ্টা করেও কাজ হলো না। ফেরত দেওয়া গেল না টিকেটগুলো।

সায়েদাবাদ থেকে বাস ছাড়ল রাত ১০টায়। বি-বাড়িয়া পার হতেই দেড়টার মতো বেজে গেল। সাথিরা যানবাহনে চলার আদব, ব্যক্তিগত আমল সেরে প্রায় সবাই ঘুমুচ্ছিলেন। আমার ঘুম আসছিল না। জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রইলাম। ঘুটঘুটে অন্ধকার বাইরেটা। অনেক দূরের ঘর-বাড়িগুলোর টিমটিমে আলো চোখে পড়ছিল।

... হঠাৎ বেশ শব্দ করে গাড়ি ব্রেক করল ড্রাইভার। সামনে অনেকগুলো গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। এত রাতে এখানে জ্যাম!

ব্যাপার কী?

গ্রাম্য একটা ছেলে দৌড়ে এসে গাড়িতে উঠে যা বলল, শুনে আমাদের আত্মারাম খাঁচা ছাড়তে উদ্যত! 'সামনে ডাকাতি হইতেছে। বাঁচতে চাইলে গাড়ি ঘোরাইয়া ফেলেন।'

বলেই ছেলেটা দ্রুত নেমে পড়ল। চাচা আপন জান বাঁচা। আমাদের ড্রাইভার পড়িমরি করে গাড়ি ঘুরিয়ে ফেললেন। তার দেখাদেখি অন্য গাড়িগুলোও!

একজন সাধারণ গ্রাম্য ছেলের কথায় আমাদের কত না বিশ্বাস! অথচ চির সত্যবাদী নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একবার দুবার নয়; বারবার নামাজের কথা বলেছেন। নামাজ না পড়লে জাহান্নামের জ্বলন্ত আগুনের ভয় দেখিয়েছেন। অথচ আমরা এমনই হতভাগা, আগুনের দিকেই দ্রুতবেগে ছুটে যাচ্ছি।

পাপে বোঝাই হওয়া জীবনের গাড়িটা আর কত সামনে এগিয়ে নেব? পেছনে ফেরানোর সময় কি এখনো আসেনি!

শয়তানও আমার জন্য আফসোস করবে

: একী, আপনি এটা কী করছেন!

: দেখতেই তো পাচ্ছেন, মদ খাচ্ছি।

: আপনার কি একটুও ভয় করছে না?

: ভয় করবে কেন?

: আপনি জানেন না, মদ খাওয়া হারাম?

: জানি।

: তো!

: কী করব! এখানে এত বেশি মদ পাওয়া যায়, না খেয়ে উপায় দেখছি না!

প্রিয় পাঠক, উপর্যুক্ত কথোপকথনে কিছু কি বোঝা গেল? যায়নি মনে হয়। আসুন, নিচের ঘটনাটা পড়ি।

আপনার এলাকায় একটা খুন হয়েছে। নৃশংস হত্যাকাণ্ড। ভিকটিমের শরীরের বিভিন্ন স্থানে জখমের দাগ। খুনি বড়ই নিষ্ঠুর। ভয়ংকরভাবে খুনটা করেছে। ছুরি দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে নিহতের শরীরটা চালনির মতো করে দিয়েছে।

পুরো এলাকায় খবরটা মুহূর্তে ছড়িয়ে গেছে। এলাকাজুড়ে আতঙ্ক। বাচ্চারা ভয়ে ঘর থেকে বেরোচ্ছে না। স্থানীয় পত্রিকা ছাপিয়ে জাতীয় পত্রিকায়ও এই ঘটনার বর্ণনা ফ্রন্ট পেইজে উঠে এসেছে।

সারা দেশ তোলপাড়। পুলিশের তল্লাশি চলছে। যে করেই হোক খুনিকে বের করতে হবে। কোনোভাবেই এই নৃশংস খুনির রেহাই নাই।

সাঁড়াশি অভিযানে অবশেষে ধরা পড়ল খুনি। লোকজন ভিড় করে খুনিকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে। কেউ কেউ উত্তম-মাধ্যম দিচ্ছে, কেউ কেউ প্রস্তুতি নিচ্ছে। সবার মুখে একটাই প্রশ্ন—'কেন খুন করলে লোকটাকে?'

খুনির অদ্ভুত জবাব—'আমি অপারগ ছিলাম। বাজারে এত বেশি ছুরি পাওয়া যায় যে, খুনটা না করে উপায় ছিল না।'

এবার একেবারে ওপরের ঘটনাটার সঙ্গে মেলান। বাজারে বেশি বেশি মদ পাওয়া যায় দেখে লোকটা মদ খাচ্ছে। বাজারে ছুরি পাওয়া যায় দেখে, আরেক নরাধম হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে।

এসব কি কোনো সুস্থ মানুষের জবাব হতে পারে? মোটেও না। ছুরি যে বিক্রি করে, সে কি কাউকে হত্যা করার জন্য জোর করেছে? মদবিক্রেতা কি রাস্তা থেকে ডেকে এনে জোর করে কাউকে মদ খাইয়েছে?

নিশ্চয় না! অতএব, আদালতে এসব অজুহাত কোনোভাবেই গেলানো যাবে না।

গুনাহ করার বিষয়গুলোও এমনই। কেউ কাউকে বাধ্য করে না। অন্যায়গুলো করার আগে আমাকে আপনাকেই ভেবে নিতে হবে, কী করছি। মন্দ করছি, নাকি ভালো করছি। দুনিয়ার আদালতেই যদি 'ভুংভাং' জবাব দিয়ে পাত্তা না পাওয়া যায়, ওপারে কী করে পাত্তা পাব?

গুনাহ করার পর শয়তানকে দোষারোপ করতে চায় কেউ কেউ। মনে হয় না তাতে বিশেষ সুবিধা হবে!

ধরুন, হাশরের ময়দান কায়েম হয়েছে। আপনাকে আসমানি আদালতে দাঁড় করানো হলো। আপনি দোষী। জীবনে অনেক অন্যায় অপরাধ করেছেন। কারও হক মেরেছেন। কাউকে কটুকথা বলেছেন। গিবত করেছেন। মাপে কম দিয়েছেন। মিথ্যা সাক্ষী দিয়েছেন। সুদ-ঘুষে জড়িত ছিলেন। নামাজ ছেড়েছেন। মোটকথা, প্রকাশ্যে বা গোপনে আল্লাহর নাফরমানি করেছেন।

আপনাকে প্রশ্ন করা হলো—'কেন এমন করেছেন?'

আপনি বললেন—'আমার কী দোষ? শয়তান আমাকে দিয়ে এইসব করিয়েছে!'

এখন যদি শয়তানকে হাজির করা হয়, সে স্পষ্ট গলায় বলবে—ওহে নরাধম! আমাকে কেন দোষারোপ করছ? আমি কি কখনো তোমার সামনে গিয়েছি? নাকি হাত ধরে জোর করে কোনো কিছু করিয়েছি? বরং আলেম-উলামারা তোমার কাছে গিয়ে কুরআন-হাদিসের কথা শুনিয়েছেন। দ্বীনি ভাইয়েরা তোমার দুয়ারে গিয়ে হাতজোর করে বলেছেন—প্রিয় ভাই, দ্বীনের পথে এসো। আল্লাহর হুকুম মানা, নবীজির তরিকায় চলা; দুনিয়া ও আখেরাতে কামিয়াবি।

কই, তুমি তো তাদের কথা শোনোনি! গুরুত্বই দাওনি। 'মোল্লাদের বকওয়াজ' মনে করে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়েছ। অথচ আমাকে না দেখেও বলছ, আমিই তোমাকে পাপকাজে পরিচালিত করেছি! আফসোস, তোমার আজকের অবস্থার ওপর!

ভাবনার আয়না

সকালবেলা পত্রিকা পড়ছিলেন। হঠাৎ একটা খবরের শিরোনাম দেখে চোখ আটকে গেল আপনার। অস্ট্রেলিয়ার গরু-সমাজ এখন আর কাঁচা ঘাস খেতে চাচ্ছে না। তারা চাচ্ছে রান্না করা ঘাস। দৃঢ়সিদ্ধান্ত নিয়েছে, রান্না ছাড়া ঘাস তো দূরের কথা, ঘাসের ডগাও ছুঁয়ে দেখবে না।

শুধু অস্ট্রেলীয় গরুরাই না, ভারতীয়গুলোও এমন দাবিই ব্যক্ত করেছে। ভূটানি গাইগুলোই-বা থেমে থাকবে কেন, ওরাও এই দাবির সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করেছে। শুধু তা-ই না, ধীরে ধীরে তারা এ আন্দোলনের তীব্রতা সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছে।

এখন বলুন, এই খবর কি বিশ্বাসযোগ্য?

মোটেও না।

বিশ্বাস তো করবেনই না; বরং ওই পত্রিকার বিশ্বস্ততার ব্যাপারেও সন্দিহান হয়ে যাবেন। এমন গাঁজাখুরি পত্রিকা নিজেও বয়কট করবেন, অন্যদেরও নিশ্চয় বয়কট করতে উৎসাহিত করবেন।

প্রিয় ভাই, এটা কখনোই সত্যি হতে পারে না যে, গরুরা ঘাস ছাড়া অন্যকিছু খেতে চাচ্ছে। কিংবা ছাগলগুলো কাঁচাপাতা খাবে না বলে পাকাপাকি সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কখনো শুনবেন না, বনের রাজা সিংহ মশাই মাংস ছেড়ে অন্যকিছু খেতে চাচ্ছে।

কোনো প্রাণীই খাদ্য-বদল করেনি। প্রাচীনকাল থেকে একই খাবার খেয়ে ক্ষুধা নিবারণ করে আসছে। একমাত্র মানুষই এনেছে খাদ্যে পরিবর্তন। শুধু খাদ্যেই না; সবকিছুতেই। কারণ তাদের মধ্যে উন্নতির একটা অদম্য ইচ্ছা সবসময়ই ছিল। এখনো আছে। ভবিষ্যতেও থাকবে।

তাদের দেওয়া হয়েছে চমৎকার একটা বিবেকবোধ। যা তাদেরকে পরিবর্তনশীল হতে উৎসাহ জুগিয়েছে। দিনের পর দিন, রাতের পর রাত যে জীবটি নিজেদের অগ্রগতি নিয়ে ভেবেছে, তার নাম—মানুষ। এজন্য কেয়ামতের দিন এই মানুষ নামক জীবটির হিসাব নেওয়া হবে। বিবেকের। বুদ্ধির। ভালো-মন্দের। প্রতিটি কদমের। প্রতিটি কথার। প্রতিটি মুহূর্তের। প্রতিটি শ্বাস-প্রশ্বাসের।

হিসাব নেওয়া হবে যৌবনকালের; কোন কাজে তা ব্যয় হয়েছে? হিসাব হবে সম্পদের; কীভাবে আয় করা হয়েছে, ব্যয়ই-বা কোন পথে হয়েছে? হিসাব হবে এলেমের; কার সন্তুষ্টির জন্য অর্জন করেছ এলেম? এমনকি শহিদকেও প্রশ্ন করা হবে—কার খুশির জন্য হয়েছ শহিদ?

পশু-পাখিরা ছাড় পেয়ে যাবে। এদের কোনো হিসাব-কিতাব নেই। থাকবে কী করে! তাদেরকে তো বিবেকই দেওয়া হয়নি! না দেওয়া হয়েছে বুদ্ধি, না জ্ঞানবিজ্ঞান, না সম্পদ, না বাসস্থান।

এজন্য আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু পেরেশান হয়ে বলতে থাকতেন—'হায়, আমি যদি বৃক্ষ হতাম, যা কেটে ফেলা হতো! যদি ঘাস হতাম, জীবজন্তুরা খেয়ে ফেলত! যদি হতাম মুমিনের শরীরের পশম!

একবার তিনি দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে এক পশুর উদ্দেশে বললেন, 'হে পশু, কত আরামে আছ। খাও, পান করো। গাছের ছায়ায় বিশ্রাম নাও। নিশ্চিন্ত এক জীবন তোমার। পরকালে তোমার কোনো হিসাব-কিতাবের বোঝা বহন করতে হবে না। হায়, আবু বকরও যদি তোমার মতো হতো!'

কে তিনি! নবীদের পর সবচেয়ে উত্তম ব্যক্তি। নিঃসন্দেহে যিনি জান্নাতি। তিনিই এ কথা বলছেন।

উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর অবস্থা দেখুন! তিনি বলতেন—'হায়, আমি যদি খড়কুটো হতাম!'

কখনো বলতেন—'আমার মা যদি আমাকে প্রসবই না করতেন!'

প্রিয় ভাই!

সাহাবিরা জান্নাতের সুসংবাদ পাওয়া সত্ত্বেও হাশরের দিনের হিসাব নিয়ে এমনভাবে চিন্তিত ছিলেন। এখন ভাবুন, আমার-আপনার কত বেশি চিন্তিত হওয়া প্রয়োজন!

কুরআনের আসিলায়

২০১৩ সালের কথা। ওমানে যাচ্ছি। সফরসঙ্গী হাবিব ভাই। ভদ্রলোক পুরোনো মানুষ। মালয়েশিয়া, সৌদি আরব, ওমান-সহ বেশ কয়েকটি দেশে আগে থেকেই তার যাতায়াত। আমিই কেবল নতুন। সেবারই প্রথম দেশের বাইরে যাওয়া।

রমজান মাস। বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের ফ্লাইটটি যখন ছাড়ে, রাত তখন এগারোটা।

বিমানভ্রমণের প্রথম অভিজ্ঞতা মন্দ ছিল না। বিমানবালাদের আতিথেয়তা ছিল চমৎকার! উড্ডয়নের কিছুক্ষণের মধ্যেই খাবার চলে এলো। আকাশের অত উঁচুতে বসে সাদা ভাত, মুরগির গোশত, সালাদ আর কাস্টার্ড-সংবলিত ডিনার আইটেম ছিল অসাধারণ! একটু পরপর চা-কফি, চকলেট, কোল্ডড্রিংকস ইত্যাদি তো ছিলই।

সাড়ে পাঁচ ঘণ্টার জার্নি শেষে ভোরের দিকে আমরা পৌঁছে গেলাম মাসকাটে। ইমিগ্রেশনের ডেস্কগুলোর সামনে তখন লম্বা সিরিয়াল। আমরা সিরিয়ালে দাঁড়ালাম। আমার পকেটে তখন সদ্য হাদিয়া পাওয়া মোবাইল ফোন। দেশ থেকে আসার সময় ছোটবোনের হাজব্যান্ড হাদিয়া দিয়েছে। ওটা পকেট থেকে বের করে এয়ারপোর্টের চমৎকার দৃশ্যগুলো ভিডিয়ো করতে লাগলাম। আর তখনই দেখা দিলো বিড়ম্বনা!

এয়ারপোর্টে যে ছবি তোলা বা ভিডিয়ো করা নিষেধ—জানতাম না। জোব্বা-জাব্বা পরিহিত একজন (পরে বুঝলাম, পুলিশ!) এসে বলল—

: ফোনটা দাও।

: কেন?

: দাও বলছি!

অন্যরা আমার দিকে তাকিয়ে আছে। আমি বুঝতে পারছি না, ফোন কেন নিয়ে নিলো! কী আমার অন্যায়?

টেনশনে পড়ে গেলাম। এই প্রথম বিদেশে এসেছি। ফোনটাতে প্রিয় মানুষদের সবার নাম্বার সেভ করা। প্রিয়জনদের ছেড়ে দূরপ্রবাসে চলে

এসেছি, এমনিতেই মন খারাপ! তার ওপর তাদের স্মৃতিগুলো হাতছাড়া। কষ্ট পাচ্ছিলাম খুব। কাঁদতে ইচ্ছা করছিল গলা ছেড়ে।

ইতিমধ্যে আরও দুজন পুলিশ ছুটে এলো। আমাকে বলল—

: ছবি তুলছিলে কেন? মতলব কী?

ভাষা যতটুকু জানি, সেইটুকু প্রয়োগ করে—বাকিটা হাত-পা ছুড়ে বোঝাতে চাইলাম—

: আমার কোনো বদ উদ্দেশ্য নেই। তোমাদের দেশটাকে ভালো লাগছিল, তাই ছবি তুলছিলাম। এজন্য সরি! ফোনটা ফেরত দাও প্লিজ!

কাজ হচ্ছিল না। বুঝলাম, ফেরত পাওয়ার আর কোনো সম্ভাবনা নেই। আশাহত মন নিয়ে ইমিগ্রেশনের ফরমালিটি সম্পন্ন করলাম। এদিকে সব কাজ শেষ করে আমাকে ছেড়ে হাবিব ভাই আগেই বের হয়ে গেছেন। পুরো এয়ারপোর্টে এমন কেউ নেই, যে আমার ফোনটা উদ্ধারকার্যে সহযোগিতা করবে। এক অসহায় অবস্থা।

আরেকটা বিষয় নিয়েও চিন্তিত ছিলাম। দেশে তখন শাপলা চত্বরের ঘটনাগুলো নিয়ে মাতামাতি চলছে। উলামা-তলাবাদের ওপর পুলিশি হামলার অনেক ভিডিয়ো তখন ইন্টারনেটে। সেখান থেকে বেশ কিছু ভিডিয়ো আমি নতুন এই ফোনটাতে সেভ করে রেখেছিলাম। এগুলো দেখে ওমানি পুলিশ আমাকে আবার কোনো ঝামেলায় ফেলে দেয় কি না, এই নিয়ে দুশ্চিন্তা হচ্ছিল। দুরুদুরু বুকে বাইরের গেটের দিকে এগিয়ে গেলাম।

বের হওয়ার ঠিক আগ মুহূর্তে পুলিশগুলো আমাকে রুমে ডেকে নিয়ে গেল। বুঝে গেলাম আমার আর রক্ষা নেই। জেরার মুখে পড়তে হবে। শুধু কি জেরা? কোথাকার ঘটনা কোথায় গিয়ে গড়ায়, বোঝার তো কোনো উপায় নেই! হাবিব ভাই ততক্ষণে বাইরে বেরিয়ে গেছেন। প্রচণ্ড রাগ হচ্ছিল লোকটার ওপর। আমাকে এই অবস্থায় রেখে তিনি কী করে পারলেন চলে যেতে!

আমি পুলিশদের সামনে মুখটাকে 'অপরাধী' করে দাঁড়িয়ে রইলাম। অফিসারগোছের একজন আমার উদ্দেশে বলল—

: কুরআন পড়তে জানো?

: জি, জানি।

: তেলাওয়াত করো।

গলাটা শুকিয়ে ছিল। ভেতর থেকে কিছু 'ভেজা কন্টেন্ট' ওপরে এনে গলাটাকে ভিজিয়ে তেলাওয়াত শুরু করলাম।

আমাকে অবাক করে দিয়ে অফিসারটি বললেন, 'যাও, কুরআন পড়তে পারো দেখে ছেড়ে দিলাম। কুরআন পড়নেওয়ালাদের অন্তরে কখনোই অসৎ উদ্দেশ্য থাকতে পারে না।'

দোকানের নাম জুনায়েদ জামশেদ

ওমানের ব্যস্ততম বাণিজ্যিক এলাকা 'রুয়ি'। ঘুরছিলাম এ দোকান থেকে ও দোকান। কিছু পাঞ্জাবির কাপড় কেনার জন্যই এই ঘোরাঘুরি। কিনলামও বেশ কয়েকটা।

রাত তখন প্রায় ১০টা। বাসস্ট্যান্ডের দিকে একরকম দৌড়ে এগোচ্ছি। দেরি হলে বাস সার্ভিস বন্ধ হয়ে যায়, ট্যাক্সি ছাড়া আর কোনো উপায় থাকে না। দৌড়াতে গিয়ে থমকে দাঁড়ালাম হঠাৎ। একটা নিয়নসাইন। দোতলা দালানের ওপরের তলায় সোনালি হরফে বড় বড় করে লেখা—Junaid Jamshed.

জুনায়েদ জামশেদকে চিনে না এমন লোক কমই আছে। একসময় পাকিস্তানি পপ সিঙ্গার ছিলেন। দুহাতে পয়সা কামাতেন। প্রচুর নামডাক ছিল। গান গেয়ে শ্রোতাদের মাতিয়ে তোলার জন্য বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে তাকে আমন্ত্রণ জানানো হতো।

স্টেজ শো, সিডি, ভিসিডি ইত্যাদিতে রাতারাতি তিনি সেলিব্রিটি বনে গেলেন। জনপ্রিয়তা যখন তুঙ্গে, সেই সময়ে হঠাৎ তিনি গান ছেড়ে দেওয়ার ঘোষণা দিলেন। অনেকেই অবাক হলো। ধীক্কারও জানাল কেউ কেউ। কেউ বলল, তাকে পাগলে পেয়েছে।

জুনায়েদ জামশেদ তার সিদ্ধান্তে অটল রইলেন। হারাম পথে পয়সা উপার্জন আর নয়। কী ছিল তার এই পরিবর্তনের কারণ?

একদিন ইউরোপের কোনো এক দেশে শো শেষ করে গাড়ি করে কোথাও যাচ্ছিলেন। প্রচণ্ড গরমে একদল তাবলিগওয়ালাকে গাট্টি মাথায় হাঁটতে দেখে ড্রাইভারকে বললেন, 'এরা পাগল নাকি! এই রোদে কেউ পথে পথে হাঁটে?'

হঠাৎই তার মনে হলো, কেন হাঁটে তারা? নিশ্চয় এমনি এমনি না! এভাবেই পরিবর্তন হতে লাগল তার হৃদয়। সে এক লম্বা ঘটনা। গান ছেড়ে দেওয়ায় জীবিকার পথ রুদ্ধ হয়ে গেল তার। গান নেই তো পয়সাও নেই। সংসারে অভাব দেখা দিলো। প্রচণ্ড অভাব। অসহায় এক অবস্থার মধ্যে পড়ে গেলেন জুনায়েদ। তার স্ত্রী বললেন, 'যা হয় হোক। তবুও, হারাম উপার্জন আমার চাই না। হালালের অল্পতেই আমি খুশি!'

জুনায়েদ বলেন, 'ওই সময়ে প্রাণপ্রিয় সহধর্মিণীর ওই কথা আমাকে অন্যরকম এক প্রেরণা জোগাল।'

জুনায়েদ জামশেদ হালাল উপার্জনের জন্য ছোটখাটো একটা ব্যবসা শুরু করলেন। পাঞ্জাবি তৈরির ব্যবসা। ছোট পরিসর, কিন্তু জনপ্রিয়তা পেল খুব দ্রুত। আল্লাহ সহায় হলেন। পেছনে ফিরে তাকাতে হলো না আর। সেই এক প্রতিষ্ঠান থেকে আজ পাকিস্তান-সহ সারা বিশ্বে তার ৩০০-এর বেশি প্রতিষ্ঠান। ওমানের এমনই এক প্রতিষ্ঠানের সাইনবোর্ড দেখেই আমি থমকে দাঁড়িয়েছি।

সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠে দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকলাম। বিশাল শো-রুম। চমৎকার সব ডিজাইনের পাঞ্জাবি, কুর্তা, শেরওয়ানিতে ঠাসা এর পুরোটা। কথা হলো প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজার ইশতিয়াক আহমেদের সঙ্গে। জানতে চাইলাম, 'এটা কি সেই জুনায়েদ জামশেদ, যিনি একসময়...?'

আমাকে আর পুরোটা শেষ করতে হলো না। ইশতিয়াক মৃদু হেসে বললেন, 'জি, আপনি ঠিকই ধরেছেন। এটা সেই পপ সিঙ্গারেরই প্রতিষ্ঠান। দুবাই, কুয়েত, বাহরাইন, লন্ডন, আমেরিকা-সহ অনেক দেশেই আছে এই প্রতিষ্ঠানের শাখা।'

অবাক হলাম! আল্লাহ কী না পারেন। জুনায়েদ জামশেদ এখন একটা ব্র্যান্ড হয়ে দাঁড়িয়েছেন। শুধু তার নামের ওপরেই প্রতিষ্ঠানগুলো চলছে। আর তিনি? দুনিয়াবি ঝামেলামুক্ত হয়ে দাওয়াতে তাবলিগের মেহনত নিয়ে

পৌঁছে যাচ্ছেন বিশ্বের একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে। শুধু কি তাই? মহান আল্লাহ তার কণ্ঠকেও কাজে লাগিয়ে দিয়েছেন। তার গাওয়া চমৎকার সব হামদ, নাত, নাশিদ এখন ধর্মপ্রাণ শ্রোতাদের মুখে মুখে।

বান্দা যখন আল্লাহর ভয়ে কোনো কিছুকে পরিত্যাগ করে, তিনি তখন এর চেয়ে উত্তম কিছু দান করেন।

(লেখাটা যখন লিখেছি, জুনায়েদ তখনো বেঁচে ছিলেন। এর কিছুদিন পর মর্মান্তিক এক বিমান দুর্ঘটনায় তিনি শহিদ হন। আল্লাহ তার কবরকে বেহেশতের বাগিচা বানিয়ে দিন।)

তাওয়াক্কালতু আলাল্লাহ

তাওয়াক্কুল করে চলা কি সত্যিই কষ্টের? মনে হয় না। কষ্ট থাকলেও সাময়িক। কিছুটা পরে হলেও, আল্লাহর সাহায্য আসবেই!

রবচাহি জিন্দেগি যাপন করা এক যুবকের সঙ্গে একবার পরিচয় হয়েছিল। অনেক অনুরোধের পর তিনি তার জীবনাচরণ নিয়ে কথা বলতে রাজি হয়েছিলেন। তার সংক্ষিপ্ত কথাগুলো যেমন ছিল—

জীবনের প্রতিটি মুহূর্তেই চেষ্টা করি আল্লাহকে ভয় করে চলতে। শহর আমার ভালো লাগত না। চারিদিকে ফেতনা-ফাসাদ। গুনাহের হাজারো সরঞ্জাম। ভাবলাম, গ্রামের দিকে কোথাও একটা চাকরি নেব। যা আয় হয় মোটামুটি চলে গেলেই হবে। ভাবনাটা কাজে লাগালাম। অজ পাড়াগাঁয়ের একটা বাড়িতে লজিং উঠলাম। বাড়ির বাচ্চাদের আরবি পড়ানো আর পাঞ্জেগানা কাচারিঘরে গ্রামের পুরুষদের নামাজের ইমামতি করা—এ-ই ছিল কাজ।

প্রথমদিনই মনটা খারাপ হয়ে গেল। পুরুষরা বাইরে বাইরে থাকে। কেউ ব্যবসায়ী কেউ চাকরিজীবী। ঘরে ফেরে সন্ধ্যায়। তাই, কাচারিঘরে খাবার নিয়ে আসে মেয়েরা। মেয়েদের হাত থেকে খানা আনতে যেতে ভালো লাগত না। ছেড়ে দিলাম চাকরিটা।

২.

হোমিওপ্যাথি জানা ছিল। চেম্বার দিলাম। রোগী নেই। পরিচিত একজন বলল, 'চেম্বারে বসে না থেকে বাড়ি বাড়ি নেমে পড়ুন। চিকিৎসা দেন। পরিচিতি বাড়ান। একসময় রোগীরাই চেম্বারে আসবে।'

তা-ই করলাম।

কদিন কাজ করেই বুঝতে পারলাম, আমাকে দিয়ে হবে না। মেয়েরাও চিকিৎসা নিতে আসে। এদের সঙ্গে একান্তে কথাবার্তা বলতে হয়। হাত ধরে পালস দেখতে হয়। স্টেথিসকোপ লাগিয়ে প্রেসার মাপতে হয়। ভয় হচ্ছিল। শয়তান না জানি ধোঁকায় ফেলে দেয়। ছাড়লাম ডাক্তারি।

৩.

আতর ফেরি করা শুরু করলাম। টুকটাক ভালোই বিক্রি হতো। একদিন কেউ একজন বলল—'কিছু কিছু সুগন্ধিতে অ্যালকোহল থাকে। কোনটা আসল কোনটা নকল বোঝা মুশকিল!'

আসলে, আমি সম্পূর্ণ হালাল উপায়ে, গুনাহমুক্ত কোনো কিছু করতে চেয়েছিলাম। মোবাহ বিষয়গুলোও এড়িয়ে যেতে চাইছিলাম। সন্দেহ আছে—এমন কোনো কাজই করার ইচ্ছা ছিল না। অতএব, ছাড়লাম আতরের ব্যবসাও।

৪.

আচার বানানো শিখেছিলাম অনেক আগে। এবার সেটা দিয়ে উপার্জনের চেষ্টা শুরু করলাম। সুস্বাদু আচার। যে-ই খেত খুব প্রশংসা করত। একদিন একটা ঘটনা ঘটল। কারখানায় লেবাররা কাজ করছিল। আমার বানানো আচার কিনল। খেতে খেতে বলল—'আপনি না বললেন তেঁতুলের আচার? এতে বড়ইয়ের বিঁচি এলো কীভাবে?'

শরীর কেঁপে উঠল। ইয়া আল্লাহ! আমার দ্বারা ভেজাল মিশ্রিত ব্যবসা হচ্ছে!... বাদ দিলাম ওই ব্যবসাও।

৫.

একটা কাপড়ের দোকানে চাকরি নিলাম। পরিচিত দোকানদার। ভালোই চলছিল। সম্মানের সাথেই কাজ করে যাচ্ছিলাম। রাতে দোকানেই

ঘুমাতাম। একরাতে শুয়ে শুয়ে এপাশ-ওপাশ করছিলাম। ঘুম আসছিল না। হঠাৎ মৃত্যুর কথা মনে এলো। এও ভাবনা হলো—'এত এত মালের মধ্যে থেকে যদি আমার মৃত্যু হয়, কী হাশর হবে আমার?'

... পরদিনই ছেড়ে দিলাম কাপড়ের দোকান।

৬.

আল্লাহকে খুব করে বললাম, 'হে আল্লাহ, আমার জন্য যেটা উত্তম সেটা দান করুন। ক্ষতিকর উপার্জনব্যবস্থা থেকে হেফাজত করুন!'

ডাক এলো একটা মাদরাসা থেকে। ঢাকাতেই। অনার্সের ছাত্র ছিলাম আমি। মাদরাসার জেনারেল ক্লাসগুলোর দায়িত্ব পেলাম। সম্মানজনক এই পেশায় এসে দারুণ লাগছিল। দ্বীনের খেদমতের পাশাপাশি নিজের আমল-আখলাকও ঠিক রাখতে পারছিলাম। মন বলছিল—'এটাই তোমার জন্য উত্তম উপার্জনব্যবস্থা। চালিয়ে যাও!'

সেই থেকে আজ অবধি আল্লাহ এর ওপরই আমাকে টিকিয়ে রেখেছেন।

এই ছিল আল্লাহভীরু যুবকটির সাক্ষাৎকার। তাকওয়া আর তাওয়াক্কুল কাকে বলে! সুবহানাল্লাহ। আর আমাদের অবস্থা কত করুণ! ব্যবসা একটা হলেই হলো। পয়সা উপার্জনই যেন বড় কথা। তার আবার হালাল-হারাম কী!

বাইরে শেরোয়ানি ভেতরে পেরেশানি

কখনো কখনো বাদশাহ হওয়ার চেয়ে গোলাম হতে পারা সম্মানের। দুনিয়ার বাদশাহ ছিল ফেরাউন। আল্লাহ তাকে তার নাস্তিক জনগণ-সহ ইঁদুরের মতো লোহিত সাগরে চুবিয়ে মেরেছেন।

বাদশাহ ছিল নমরুদ।

কে না জানে তার ঘটনা। মাত্র একটা লেংড়া মশা তার মাথায় ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছিল। অপদস্থের সেই ছিল শুরু। মাথায় জুতা দিয়ে পেটালেই কেবল শান্তি পেত সে। অন্যথায় মাথা ঠিক থাকত না তার। পাগলের মতো আচরণ করত। চাকররা আর কত পেটাবে? শেষমেশ বিরক্ত হয়ে জুতা মেরে মেরেই নরাধমটাকে জাহান্নামে পাঠিয়েছে।

বাদশাহ ছিল কারুন।

বড় বেইজ্জত করে মাটি তাকে নিজের ভেতর টেনে নিয়েছে। ... রাষ্ট্রপ্রধান ছিল জর্জ বুশ। আল্লাহ তাকে তার শেষ জীবনে জুতাপেটা করিয়েছে। রাষ্ট্রপ্রধান ছিল ইমানুয়েল ম্যাক্রো। লক্ষ লক্ষ লোকের সামনে সামান্য একজন নাগরিকের হাতে থাপ্পর খেতে হয়েছে। কেউ কেউ খেয়েছে পচা ডিমের ঢিল। রাজাদের পাশাপাশি মন্ত্রীবর্গরাও আছেন এই তালিকায়। দাম্ভিকতা আর ধরাকে সড়া জ্ঞান করতে গিয়ে নাস্তানাবুদ হওয়াদের সূচিপত্র মোটেও ছোট না।

অপদস্থ হয়ে দেশ ছেড়ে পালিয়ে অন্য দেশে আশ্রয় নিতে চেয়েছে কেউ কেউ। পারেনি। চরম লাঞ্ছিত হয়ে মাথা নিচু করে ফিরে আসতে হয়েছে। ইতিহাসে এমন অনেক বাদশাহ ও ক্ষমতাশালী আছে, যারা ক্ষমতায় থেকে যেমন অপমানিত হয়েছে, ক্ষমতা ছেড়েছেও চরম অপদস্থ হয়ে।

অন্যদিকে আল্লাহর মহান গোলামদের ইতিহাস লক্ষ করুন। কত ইজ্জত আর সম্মানের সঙ্গে তারা জীবনযাপন করেছেন। মৃত্যুটাও ছিল চির সম্মানের। তাদেরকে কেউ অপদস্থ করতে চাইলে উলটো নিজেরাই নাস্তানাবুদ হয়েছে।

এক এলাকার এমপি সাহেব মসজিদে নামাজ পড়তে এলেন।

ভদ্রলোক এত দ্রুত রুকু-সেজদা করছিলেন, মনে হচ্ছিল কাকের মতো ঠোকর মারছেন। দৃশ্যটা এক আতরওয়ালা যুবকের চোখে পড়ল। এমপি সাহেবের নামাজ শেষ হতেই সে এগিয়ে গিয়ে বিনয়ের সঙ্গে বলল, 'জনাব, অনুগ্রহ করে নামাজটা আবার পড়ে নিন। আপনার নামাজটা হয়নি।'

এমপি সাহেব তো রেগে টং! 'কী! আমার নামাজে ভুল ধরতে আসিস! সাহস তো কম না! এক থাপ্পড়ে দাঁত ফেলে দেবো। চিনিস আমাকে?'

যুবক বলল, 'মারুন, কাটুন যা ইচ্ছা করুন। তবুও দয়া করে নামাজটা ঠিক করে নিন।'

এমপি সাহেব মেজাজ ধরে রাখতে পারলেন না। ঠাস করে চড় বসিয়ে দিলেন যুবকের গালে। যুবক এবার নাছোড় বান্দা। সে এমপি সাহেবের পায়ে পড়ে বলল, 'জনাব, প্রয়োজনে আমাকে আরও মারুন, তবুও আপনাকে ঠিক করে নামাজ আদায় করতে হবে। জেনেশুনে আপনাকে আমি জাহান্নামে যেতে দিতে পারি না।'

মুসল্লিরা এতক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘটনাটা দেখছিল। এমপি সাহেবের এই অপকর্ম দেখে তারা আর চুপ থাকতে পারল না। ক্রোধে ফেটে পড়ে একজোট হয়ে বলল, 'সে তো মন্দ কিছু বলেনি! কেন তাকে চড় মারলেন? আল্লাহর ঘরে এসেও ক্ষমতার দাপট দেখাচ্ছেন? এক্ষুনি সঠিকভাবে নামাজ আদায় করে নিন। নতুবা আমরা আপনাকে মসজিদ থেকে বের হতে দেবো না।'

অবস্থা বেগতিক। পুরো মহল্লায় এই ঘটনা অতিদ্রুত ছড়িয়ে পড়ল। মসজিদের আশপাশ লোকে লোকারণ্য! এমপি সাহেব তোপের মুখে মহাবিপাকে পড়ে গেলেন! সঠিকভাবে নামাজ আদায় করা ছাড়া মসজিদ থেকে বেরই হতে পারলেন না।

এই ঘটনায় আতরওয়ালা যুবকের সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল। রাতারাতি জনপ্রিয় হয়ে গেলেন। ফেসবুকের 'ভাইরাল' হওয়ার মতো জনপ্রিয় না; এ জনপ্রিয়তা আল্লাহর পক্ষ থেকে। আল্লাহ অন্যান্য বান্দাদের হৃদয়ে আতরওয়ালার জন্য মহব্বত ঢেলে দিয়েছেন।

একজন ক্ষমতাশালীর অন্যায়ের প্রতিবাদ করায় যুবকের সম্মান বেড়ে গেল বহুগুণে। মহল্লার লোকজন তাকে দেখলেই তাজিমের সাথে বলত, 'আমার বাসায় একবেলা খানার দাওয়াত নিন না, অনুগ্রহ করে!'

আল্লাহ্ যখন কোনো বান্দাকে ভালোবাসেন, তখন তিনি ফেরেশতাদের মধ্যে ঘোষণা করে দেন, 'অমুক বান্দাকে আমি ভালোবাসি। অতএব, তোমরাও তাকে ভালোবাসবে।'

ফেরেশতারা সেই বান্দাকে শুধু ভালোবেসেই ক্ষান্ত হন না, পৃথিবীর মধ্যে ঘোষণা করতে থাকেন, 'এই বান্দাকে আল্লাহ্ ভালোবাসেন, আমরাও ভালোবাসি, তোমরাও তাকে ভালোবাসবে।'

প্রকৃত বাদশাহি বুঝি একেই বলে। সামান্য এক আতরবিক্রেতা। কত টাকারই-বা মালিক? ১ হাজার, ২ হাজার; বড়জোর ৫ হাজার টাকার আতরই আছে তার কাছে! কিন্তু বাদশাহর বাদশাহ, পরাক্রমশালী আল্লাহর কাছে তার দাম অনেক বেশি!

কোনো বান্দাকে আল্লাহর পছন্দ হয়ে গেলে তিনি স্বয়ং সেই বান্দার নাম ধরে ভালোবাসার কথা ঘোষণা করেন। চিন্তা করতে পারেন! আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন যদি টেলিভিশনে এসে এই ঘোষণা দেন, 'অমুক আজ থেকে আমার প্রিয় হয়ে গেছে। তাকে আমি ভালোবাসি।' কেউ কি তাকে ঘৃণা করার ধৃষ্টতা দেখাতে পারবে?

আমি বলব, অবশ্যই পারবে। জনগণের পছন্দ না হলে ঘৃণা করতেই পারে। হয়তো ক্ষমতার ভয়ে প্রকাশ করবে না, কিন্তু অন্তরে ঠিকই লোকটার প্রতি ঘৃণা পোষণ করবে। আর যদি সময়ের সাহসী সন্তান হয়, তাহলে সুযোগ পেলে মাথায় পচা ডিম মেরে কিংবা জুতা মেরে ঘৃণার বহিঃপ্রকাশ ঘটাবেই।

কিন্তু আল্লাহ্ যাকে ভালোবাসবেন, তাকে ঘৃণা করার মতো অবস্থা কারও হৃদয়েই থাকবে না। হৃদয়ের মালিক যিনি, তিনিই তো হৃদয়জুড়ে সেই বান্দার প্রতি ভালোবাসা দিয়ে ভরপুর করে দেবেন! কারও হৃদয়ে ভালোবাসা তৈরি করে দেওয়ার ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ্ তাআলারই আছে। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট কেন, বিশ্বের সব প্রেসিডেন্ট একজোট হলেও এই ক্ষমতার বিরুদ্ধাচরণ করার মুরোদ নেই।

কে আমার রব!

'বিয়ে যে করব, বউকে খাওয়াব কী?' কথাটা অনেক অবিবাহিতের মুখে শোনা গেলেও, ধারণাটা সবার মধ্যেই আছে।

চাকরি নেই। কী খাব?

ব্যবসা নেই। কীভাবে চলব?

ফসল নেই। সংসার চলবে কী দিয়ে?

সবগুলো কথার একটাই অর্থ—রিজিকের ব্যবস্থা করা আমার জিম্মায়। আমি ছাড়া কে আছে রিজিকদাতা। আমিই কর্তা। আমিই করি। আমিই চালাই। আমার ওপরেই সংসার চলে।

আসলেই কি আমি করি?

একটু বিশ্লেষণ করা যাক। আমার দাদি মারা যাওয়ার আগের কথা। সংসারের সদস্যসংখ্যা তখন ১০ জন। দাদি প্রায় সময় অসুস্থ থাকতেন। আমাদের জন্মের পর থেকে উনাকে কখনো সুস্থ দেখিনি। বছরের পুরোটা সময় একটা না একটা অসুখ লেগেই থাকত। দাদির চিকিৎসা আর ওষুধ-পথ্যে, প্রতিমাসে মোটামুটি অনেক টাকাই খরচ হতো।

দাদি মারা যাওয়ার পর সংসারে সদস্যসংখ্যা নয়জন। দাদি নেই, মানে বাড়তি সেই খরচটাও নেই। তার চিকিৎসা খরচ নেই। খানা খরচ নেই। বস্ত্র খরচ নেই। তার পেছনে পরিচারিকা খরচ নেই। স্বভাবতই সংসার খরচ বিপুল পরিমাণে বেঁচে যাওয়ার কথা। সে পরিমাণ টাকা ব্যাংকে জমা হয়ে যাওয়ার কথা।

কিন্তু কই?

বরং প্রিয় দাদি চলে যাওয়ার পর আয়ও কমে গেছে। একে তো বয়স্ক এবং শিশুরা হলো সংসারের জন্য বরকত। দ্বিতীয়ত তিনি তার জন্য নির্দিষ্ট করা রিজিক শেষ করে পরপারে পাড়ি জমিয়েছেন।

স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, রিজিক কারও জিম্মায় না, কেউ কারও রিজিকের ব্যবস্থাও করতে পারে না। এটা একমাত্র রিজিকদাতারই জিম্মায়। তিনিই

এর রক্ষণাবেক্ষণ করেন। কাকে কী পরিমাণ দিতে হবে, কে কী পরিমাণ ভোগ করে যাবে, তিনিই ঠিক করে দেন।

রিজিকের কথা উঠলেই আমার গেদু চাচা আর খায়ের চাচার কথা মনে পড়ে। একই পরিবারের দুই ভাই। 'কর্তা-ই সব করেন'—যুগ যুগ ধরে চলে আসা এমন ভুল ধারণার, এ পরিবারটি যেন এক জ্বলন্ত উদাহরণ।

গেদু চাচা আমাদের প্রতিবেশী। ঢাকায় একটা চাকরি করতেন। ছোটখাটো চাকরি। সংসারে চার মেয়ে এক ছেলে। ছেলেটা সবার ছোট। মেয়েরা বিয়ের উপযুক্ত। সংসারকে এই অবস্থায় রেখে গেদু চাচা হঠাৎ হার্টঅ্যাটাকে মারা গেলেন।

ঢাকা থেকে বাড়ি গেছেন। সন্ধ্যাবেলা। বললেন, 'বুকটা কেমন যেন করছে। এক গ্লাস পানি দাও।'

চাচিআম্মা পানি এনে দিতে দিতেই গেদু চাচার বিদায়। রিজিকে নেই। পানিটাও মুখে দিয়ে যেতে পারলেন না। গ্রামের কেউই গেদু চাচার মৃত্যুটা মেনে নিতে পারছিল না। সোমত্ত মেয়েদেরকে নিয়ে সবার মধ্যেই কানাঘুষা চলছিল। 'কী হবে মেয়েদের?'

'ছেলেটাও ছোট। কে নেবে দায়িত্ব।'

'সংসারটা বুঝি ধ্বংসই হয়ে গেল।'

আমাদের সব ভাবনা সঠিক নয়। রিজিক পিতার চাকরির ওপর নির্ভর করে না। ছেলের ব্যবসার ওপরও নির্ভর করে না। নির্ভর করে রিজিকদাতার মর্জির ওপর।

চোখের সামনেই দেখলাম। মেয়েদের ভালো বিয়ে হয়ে গেল। ছেলেটাও ব্যবসার ভালো লাইন পেয়ে গেল। ছোট্ট একটা চাকরি ছিল গেদু চাচার। খরচ চালাতে হিমশিম খেতে হতো। কিন্তু মৃত্যুর পর সংসার চলতে লাগল রাজার হালে!

অন্যদিকে ঠিক বিপরীত ঘটনা গেদু চাচার ছোটভাই খায়ের চাচার ক্ষেত্রে। পুরো নাম—আবুল খায়ের। নামের অর্থের মতোই হতে পারত খায়ের চাচার জীবন। কিন্তু না, আসমান থেকে সে ফায়সালা হয়নি।

চাচার চার ছেলে। সবাই বড় হয়েছে। বাবা আর ছেলেরা মিলে এতদিনে বাড়ি-গাড়ি করে ফেলার কথা।

কই, তা তো হয়নি।

এই এতদিনেও সংসারটা দাঁড়াতেই পারেনি। বড়টার অপারেশন তো মেঝোটার হাঁপানি। সেজোটাও কিছু করতে পারছে না। বেকার ঘুরছে। 'বড়রাই কিছু করে না, আমি আর করবটা কী'—ছোটটা এখনো এই ধারণা নিয়েই বড় হচ্ছে।

সংসারের কর্তা—খায়ের চাচার নিজের জীবনটাও ছন্নছাড়ার মতো। চেষ্টা করেছেন। কিন্তু জীবনে কিছুই করতে পারেননি। অভাব-অনটন লেগেই আছে। সংসারে হাজারটা টানাটানি।

এই অবস্থা কেন?

কারণ, জীবনের কর্তৃত্ব 'কর্তা'র হাতে না। কর্তারা তো নিজেই অন্যের ওপর নির্ভরশীল।

বহু কর্তা আছে খায়ের চাচার মতো। রাত-দিন পরিশ্রম করেও ভাগ্য বদলাতে পারেননি। আবার, গেদু চাচাদের অবস্থা দেখুন। কর্তা নেই। কিন্তু সংসার চলছে দিব্যি আরামে।

কর্তার কাজ হচ্ছে অনেকটা ডেলিভারিম্যানের মতো। ধরুন, আপনি অনলাইনে পণ্যের অর্ডার করলেন। চাল, ডাল, লবণ, চিনি। সবগুলো ৫ কেজি করে। ডেলিভারিম্যান পণ্যগুলো আপনার কাছে নিয়ে এলো। এখন আপনি তাকে ধমকে উঠে বললেন—'৫ কেজি করে দিচ্ছ কেন? ১০ কেজি করে দাও।'

আপনিই বলুন, ধমকে কি কাজ হবে? সে কি এক কেজিও বেশি দিতে পারবে?

আরেকদিন দেখলেন, একই লোক অন্যদের পণ্য ডেলিভারি করতে এসেছে। আপনি খুশিমনে দৌড়ে গিয়ে উচ্ছ্বসিত গলায় বললেন, 'কীহে! সেদিন তো অনেক কিছু দিয়ে গেলে। আজকেও দাও! তুমি কত ভালো! প্লিজ কিছু দিয়ে যাও।'

আপনার এ অনুরোধে কি কাজ হবে? বরং সে আপনাকে বদ্ধ উন্মাদ ভাববে। বলবে, 'আপনি কি পাগল হয়েছেন? সেদিন আপনাকে পণ্য পৌঁছানোর অর্ডার ছিল, এজন্য দিয়ে গেছি। তাই বলে আজকেও দিয়ে যাব, এ কথা ভাবলেন কী করে?'

রিজিকের বিষয়টাও এমনই। আসমান থেকে যতটুকু অর্ডার আসে, ততটুকুই আপনার-আমার কাছে ডেলিভারি হয়। এর বেশি এক বিন্দুও দেওয়ার ক্ষমতা নেই কারও।

ব্যবসা, চাকরি, ক্ষেত-খামার হলো 'মাধ্যম' বা ডেলিভারিম্যান। কোটি কোটি প্রাপকের কাছে পৌঁছাচ্ছে। প্রেরক একজনই। দায়িত্ব তাঁরই হাতে।

আমরা যেন তাঁকে ছেড়ে মাধ্যমকে 'রব' না বানাই।

পুলিশের টাকায় গোশত-পরোটা

ঘটনাটা ছোটবেলার। আব্বার সঙ্গে ঢাকার গুলিস্তানে এসেছি। এসে হারিয়ে গেছি। একসঙ্গেই ছিলাম। ভীড়ের ভেতর থেকে কখন হারিয়ে গেছি বুঝতেও পারিনি। দিশেহারা হয়ে গেলাম। কী করব, কোথায় যাব কিছুই জানি না।

তখনকার গুলিস্তান মানেই ভয়ানক স্থান!

প্রচণ্ড ভিড়!

মানুষে-গাড়িতে গ্যাঁজাগ্যাঁজি। হইচই, চেঁচামেচি। কেউ হারিয়ে গেলে খুঁজে পাওয়ার জো নেই। আমি কাঁদছি। কেঁদেই চলছি। কেউ আমার দিকে ফিরেও তাকাচ্ছে না। সময় কোথায়? সবারই ব্যস্ততা। কাঁদতে কাঁদতে, হাঁটতে হাঁটতে এক মসজিদের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। ব্যস্ততম মসজিদ। মুসল্লিরা আসছে যাচ্ছে।

অনেকক্ষণ হয়ে গেছে। ভয় ভয় লাগছে। বিকেল হয়ে গেল। একটু পরই সন্ধ্যা নামবে। রাত হয়ে গেলে আমি যাব কোথায়? খাব কী? সন্ধ্যাতেই পেটে প্রচণ্ড ক্ষুধা। অসহায় চোখে চারিদিকে তাকাচ্ছি আর কেঁদেই যাচ্ছি।

মসজিদের আশেপাশে নানান ধরনের খাবারের দোকান। কলা-রুটি, চিংড়ি ভাজা, চটপটি, হালিম। একপাশে দেখলাম পাকা পাকা পেপে কেটে থরে থরে সাজিয়ে রেখে বিক্রি করছে। প্রচণ্ড ক্ষুধা থাকলেও খেতে পারছি না। কারণ, আমার কাছে কোনো টাকা-পয়সা নেই।

আসরের আজান হলো। স্রোতের মতো মুসল্লিরা আসছে। কারও হাতেই সময় নেই আমাকে প্রশ্ন করার—'কেন কান্না করছ বাবু!'

হঠাৎ দেখি, মসজিদে নামাজ পড়তে এসেছেন এক পুলিশ-মুসল্লি। আশায় বুক বাঁধলাম। কিছু একটা ব্যবস্থা হবেই। নামাজ শেষ হলে নিশ্চয় তিনি আমার দিকে চোখ তুলে তাকাবেন। আমার ক্ষুধা আর অসহায়ত্ব ঘুচানোর চেষ্টা করবেন।

নামাজ শেষ হলো। মুসল্লিরা একসঙ্গে বের হয়ে আসছেন। আমি দূর থেকে পুলিশ ভাইটির দিকে তাকিয়ে আছি। তিনি কোন গেট দিয়ে বের হন, লক্ষ রাখছি। এত মুসল্লি কখন তিনি আমার চোখের আড়াল হয়ে গেলেন, বুঝতেই পারলাম না।

বেশ কিছুক্ষণ পর মাদরাসার এক ছাত্রভাই আমাকে দেখে এগিয়ে এলেন। তিনিও নামাজ পড়তেই এসেছিলেন। আমাকে কাঁদতে দেখে বললেন, 'কী হয়েছে? কাঁদছ কেন?'

ঘটনা খুলে বললাম। তিনি জানতে চাইলেন—বাসে উঠিয়ে দিলে বাড়িতে যেতে পারব কিনা। আমি সম্মতি জানালাম। তখন কুমিল্লার বাসগুলো গুলিস্তান থেকেই ছাড়ে। আবছা আবছা মনে ছিল, আমাকে নামতে হবে মাঝপথে একটা জায়গায়। দুইটা বড় ব্রিজ পার হয়ে তৃতীয় ব্রিজের গোড়ায়। সেখান থেকে ট্রলারে করে আমাদের গ্রাম।

ছাত্র ভাইটি আমাকে বাসস্ট্যান্ডের দিকে নিয়ে যাচ্ছেন। আমি ক্ষুধায় কাতর। লজ্জায় বলতে পারছি না ক্ষুধার কথা। তিনি দয়া করে বাড়ি পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করছেন, এই-ই তো ঢের! খাবারের কথা বলি কী করে?

বাসে উঠলাম। তিনি বাসের ড্রাইভারকে বুঝিয়ে বললেন, কোথায় আমাকে নামাতে হবে। বাস ছাড়ল। কিছুদূর এসে জ্যামে পড়তেই হুড়োহুড়ি করে বাসে একদল হকার উঠল। তাদের হাতে নানান ধরনের

খাদ্যসামগ্রী। কারও হাতে খিরাই-শসা, কেউ বিক্রি করছে মুড়ি-মুড়কি, বাতাসা। সেসব দেখছি আর কষ্ট পাচ্ছি। টাকা নেই। খাব কী করে!

সন্ধ্যা পেরিয়ে রাত হয়েছে। বাস চলছে। কিছুই খাওয়া হয়নি। ঝিম মেরে পড়ে আছি। ক্লান্তিতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছি মনে নেই। লম্বা ঘুম। ঘুম ভাঙল হেল্পারের ডাকে—'ওই পিচ্চি, নামো না ক্যান?'

চোখ খুলে ভড়কে গেলাম। বাস থেমে আছে। কোনো যাত্রী নেই। পুরো বাস খালি। চোখ কচলে বাইরের দোকানগুলোর সাইনবোর্ডের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারলাম, আমি আমার গন্তব্য ফেলে এসেছি। ক্লান্তির ঘুম ছিল। এক ঘুমে চলে এসেছি কুমিল্লায়। আরেক অসহায় অবস্থা।

কুমিল্লা শহরের কিছুই আমি চিনি না। ভুলটা হেল্পারের। সে আমাকে আমার গন্তব্যে নামিয়ে দেয়নি। হয়তো ভুলে গেছে! অথবা অবহেলা করেছে। কিন্তু এই রাতবিরেতে আমি এখন যাব কোথায়? একদিকে গভীর রাত। অন্যদিকে ক্ষুধা। আমি অসহায় চোখে কাঁদতে লাগলাম।

পাশেই ছিল রেস্টুরেন্ট। রেস্টুরেন্টের সামনে পুলিশের গাড়ি। আমার কান্নাকাটি দেখে লোকজন জড়ো হলো। আমাকে নিয়ে গেল পুলিশের কাছে। 'পুলিশ আঙ্কেল' তখন রাতের খাবার খাচ্ছিলেন। আমাকে তার টেবিলের সামনে বসানো হলো। শুরু হলো জিজ্ঞাসাবাদ। কোথা থেকে এসেছি, কেন এসেছি, কোথায় যাব? আমি সবকিছু খুলে বললাম। হোটেলের স্টাফরা আমাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে। পুলিশ অফিসারটি তাদেরকে আদেশ দিলেন—'ছেলেটার জন্য খানা নিয়ে এসো।'

পুলিশের আদেশ মুহূর্তেই খাবার চলে এলো। গোশত আর পরোটা। পেটপুরে খেলাম। এরপরের ঘটনা আরও লম্বা। সেদিকে আর যাচ্ছি না।

তখন আমি নিতান্তই ছোট। ওইটুকুন বয়সে রিজিক নিয়ে এতটা ভাবিনি। বইটি লিখতে গিয়ে সেদিনের সেই ঘটনাটা আজ মনে পড়ে গেল।

রিজিক। কী অবাক জিনিস! ঢাকা টু কুমিল্লা। মাঝপথে আমার নেমে যাওয়ার কথা। আমি হারিয়ে গিয়েছি ঢাকায়। হারানোর পর থেকেই ক্ষুধায় কাতর। যতই কাতর হই, ওখানে আমার রিজিক লেখা নেই। কে ভেবেছিল, আমার রিজিক কুমিল্লায় পড়ে আছে!

জীবনে ও-ই প্রথম কুমিল্লায় যাওয়া। যেতে হয়েছে রিজিকের টানেই। কার রিজিক কোথায় রয়েছে কেউ জানে না। যেখানে রয়েছে, আপনাকে সেখানে যেতেই হবে। ইচ্ছায় হোক কিংবা অনিচ্ছায়। এজন্যই বলা হয়—রিজিকের চেয়ে; রাজ্জাকের সন্ধানেই বেশি বেশি সময় ব্যয় করা উচিত!

তখন কি তাকদিরের ভরসায় বসে থাকবেন?

দেশে সুবিধা হচ্ছে না। বিদেশ যাওয়ার জন্য দীর্ঘদিন ধরেই চেষ্টা করছেন। ভিসা পাচ্ছেন না। দালাল ধরেছেন। কাজ হয়নি। হঠাৎ একদিন খবর পেলেন, ভিসা এসেছে। ভালো বেতন। ডিউটি অল্প। ওভারটাইম আছে। বেতনের বাইরেও বাড়তি ইনকামের সুযোগ আছে। মালিক ভালো। বিদেশি মালিক হলেও মানবতা আছে।

এসিরুমে থাকা। থাকা-খাওয়া ফ্রি। রান্নাবান্না কিছুই নিজের করতে হয় না। রান্নার লোক আছে। ছুটিতে দেশে এলে বিমান খরচ ফ্রি। চিকিৎসা সেবা ফ্রি। এর চেয়ে বড় সুবিধা হলো, এক বছরের মাথায় সিটিজেনশিপ পাওয়ার সুবর্ণ সুযোগ আছে!

কিন্তু একটা ঝামেলা হয়েছে। দুইদিনের মধ্যে কাগজপত্র রেডি করে ফেলতে হবে। দুইদিন পরই ফ্লাইট। সময় কম। এই ফ্লাইট মিস হলে বিদেশ যাওয়ার স্বপ্ন, স্বপ্নই রয়ে যাবে। সময় তো দুইদিন মাত্র! এখন, কী করবেন আপনি?

দুইদিনের মধ্যে রেডি হওয়ার জন্য উঠে পড়ে লাগবেন?

বিদেশ যাওয়ার আশা বাদ দেবেন?

নাকি 'তাকদিরে যা আছে তাই হবে'—বলে দৌড়ঝাঁপ বাদ দিয়ে অপেক্ষা করবেন?

প্রিয় ভাই, এই প্রশ্নের উত্তর সবারই জানা। আপনিও জানেন। যত কঠিনই হোক, প্রথম কাজটিই আপনি করবেন। দুইদিন না, একদিন সময় পেলেও আপনি সময়টা কাজে লাগাবেন। কারণ, আপনি জানেন, একটা

মুহূর্ত সময় নষ্ট করা মানে, এত চমৎকার সুযোগ-সুবিধাসম্পন্ন চাকরি থেকে বঞ্চিত হওয়া।

খবরটা শোনার পর থেকে আপনার খাওয়া বাদ। ঘুম বাদ। গোসল বাদ। টিভিতে প্রিয় টিমের খেলা দেখা বাদ। ইউটিউবে, ফেসবুকে, মেসেঞ্জারে সময় দেওয়া বাদ—আপনাকে আর বলে দিতে হবে না কী কী বাদ দিতে হবে। সব বাদ দিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চলবেন। রেসের ঘোড়ার চেয়েও স্পিডে চলবে আপনার প্রতিটি পদক্ষেপ।

আখেরাতের প্রস্তুতির জন্যও প্রতিটি মুহূর্তকে ঠিক এভাবে মূল্যায়ন করা চাই।

ব্যক্তিস্বাধীনতা : এক ভয়ানক শব্দসন্ত্রাস

শব্দও কি সন্ত্রাসী হতে পারে? ধারালো অস্ত্রের ন্যায় শব্দও কি ঘটাতে পারে সন্ত্রাস? হ্যাঁ, পারে বৈকি। এমনকি কোনো কোনো শব্দ বা বাক্য হতে পারে অস্ত্রের চেয়েও মারাত্মক! অস্ত্রসন্ত্রাস যদি হরণ করে প্রাণ, শব্দসন্ত্রাস কখনো হরণ করে দ্বীন ও ঈমান। হাল জমানার তেমনই এক ভয়ানক শব্দসন্ত্রাসের নাম—'ব্যক্তিস্বাধীনতা'।

ধরুন, বাসে একজন উচ্চৈঃস্বরে গান শুনছে। কিংবা হেডফোন লাগিয়েঃ নীরবেই। গান শুনছে আর তালে তালে মাথা দোলাচ্ছে। পেছনের সিট থেকে একজন মাওলানা সাহেব বারবার তার কাঁধে হাত রাখছেন। কী যেন বলতে চান তিনি।

একবার, দুবার, তিনবার।

গানশ্রোতা এবার বিরক্ত হয়ে চেঁচিয়ে বলল, 'সমস্যা কী? এমন করছেন কেন? দেখছেন না গান শুনছি?'

'দেখেছি ভাই। এজন্যই একটা কথা বলতে চাচ্ছিলাম।'

'কী কথা?'

'দেখুন প্রিয় ভাই! গান শোনা ভালো কাজ না। এটা একটা গুনাহের কাজ। গাড়িতে বসে আছি। আমাদের সবারই উচিত আল্লাহর নাম নিতে নিতে ভ্রমণ করা।'

শ্রোতা এবার আরও বেশি খেপে গেল। চেঁচিয়ে বলল, 'আমি কি আপনার চেয়ে কম বুঝি? আমাকে অত উপদেশ দিতে হবে না। নিজের চরকায় তেল দেন!'

তার চেঁচানো দেখে পাশের যাত্রীটিও খেপে গেল। অন্যপাশের যাত্রীটিও। সামনের, পেছনের, ডানের, বামের... একে একে প্রায় সব যাত্রীই মাওলানা সাহেবের বিরুদ্ধে সরব প্রতিবাদ করে উঠল 'ঠিকই তো। সে গান শুনছে, তাতে আপনার সমস্যা কী? আপনি তার ব্যক্তিস্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করছেন কেন? এটা তো ঠিক না!'

কিছু দূর যাওয়ার পর যুবকটি জানালা দিয়ে একটা হাত বের করে দিলো। মনোযোগ দিয়ে গান শুনছিল তো! কখন যে বাইরে হাত দিয়েছে নিজেই জানে না। এখন যদি পেছন থেকে মাওলানা সাহেব দেখেও না দেখার ভান করেন, আর এতে সেই যুবকের হাতটি অ্যাকসিডেন্ট হয়, তখন সবাই কী বলবে? বলবে না—'কী হে মাওলানা সাহেব, আপনার চোখের সামনে সে জানালার বাইরে হাত রাখল, একটিবারও কি বাধা দিতে পারতেন না! তাহলেই তো আর লোকটার এত বড় ক্ষতিটা হতো না!'

অথচ সবাই-ই কিন্তু কিছুক্ষণ আগে মাওলানা সাহেবকে বলেছিল, কারও ব্যক্তিস্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা যাবে না।

অদ্ভুত না!

গান শুনতে বাধা দিলে যদি ব্যক্তিস্বাধীনতা খর্ব হয়; বাসের জানালার বাইরে হাত রাখাটাও তো প্রতিটি যাত্রীর ব্যক্তিস্বাধীনতা! তবু কেন সে ক্ষেত্রে বাধা না দেওয়াটা দোষের হবে? কেন এ 'ডাবলস্ট্যান্ডার্ড' নীতি?

যে বোনটি পর্দার কথা বললে ব্যক্তিস্বাধীনতায় আঘাত পান, তিনি কি করোনার ভয়ে টপ টু বটম 'প্যাকড' হয়ে রাস্তায় বের হচ্ছেন না?

বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠান, দিবস উদ্‌যাপন ইত্যাদি উপলক্ষ্যে নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশায় বাধ সাধলে যারা ব্যক্তিস্বাধীনতার অস্ত্র উঁচিয়ে

ধরেন, তারাই কীভাবে দীর্ঘ প্রায় দুবছর যাবৎ 'ঘরে থাকুন সুস্থ থাকুন' নীতি অনায়াসে মেনে চলছেন?

ভাবতে অবাক লাগে!

ইসলামে মদপান নিষিদ্ধ বললে যারা ব্যক্তিস্বাধীনতার অস্ত্র নিয়ে তেড়ে আসেন, পেট্রোলপাম্পে 'ধূমপান নিষিদ্ধ' আইন মেনে চলাকে তারাই কিন্তু সচেতনতা আখ্যা দেন!

নিকৃষ্ট এই দ্বিমুখী নীতির শত শত উদাহরণ হয়তো দেওয়া যাবে। প্রশ্ন হলো, কেন এই দ্বিমুখীতা? 'ব্যক্তিস্বাধীনতা' শব্দের কেন এ সন্ত্রাসী ব্যবহার, যা শুধু স্রষ্টার বিধানকেই হামলা করে!

গান হারাম, মদ-বেপর্দা হারাম এ জাতীয় উচ্চারণের প্রতি বিতৃষ্ণা, অথচ 'চলন্ত গাড়িতে হাত ভেতরে রাখুন', 'ঘরে থাকুন ভালো থাকুন', 'মাস্ক পরুন সুস্থ থাকুন'—এগুলো শুনতে যেন ভালোই লাগে।

এই দ্বিমুখী চরিত্রের মূল রহস্যটা আসলে কোথায়? সেই রহস্য লুকিয়ে আছে একটিমাত্র শব্দে, তা হলো—'বিশ্বাস'। হ্যাঁ, এ সবকিছুই বিশ্বাসের কারিশমা।

বাসের বাইরে হাত রাখলে বিপদ, করোনায় আছে মৃত্যুঝুঁকি—ইত্যাদিতে বিশ্বাস আছে বলেই চরম মুক্তমনা ভাইটিও এখানে পরম অনুগত।

অথচ স্রষ্টার বিধান অমান্য করে আমি, আপনি, আমরা সবাই যে ঝাঁপ দিচ্ছি নিশ্চিত আগুনে—বস্তুবাদের চতুর অভিযানে সে বিশ্বাস আজ দুর্বল বলেই এখানে দাঁড় করাই ব্যক্তিস্বাধীনতার ঢাল। কিন্তু স্যার জি! শব্দসন্ত্রাসের শিকার হয়ে অত্যাসন্ন বিপদকে ভুলে থাকা আর কত দিন? দিন শেষে তো যেতে হবেই 'ওপারে'।

মনের পর্দাই বড় পর্দা

বাড়ির পাশে একটা সিডির দোকান ভাড়া হচ্ছে। আমার এক আত্মীয় দোকানটা নিতে আগ্রহ প্রকাশ করলেন। আমার আব্বা তাকে অনুরোধের স্বরে বললেন, 'এই দোকানটা নিয়ো না!'

'কেন?'

'দেখছই তো, এটা একটা সিডির দোকান। একজন মুসলমান কখনো নাটক-সিনেমার ব্যবসা করতে পারে না।'

আত্মীয় বিষয়টা অন্যভাবে নিলেন। ভুল বুঝলেন আসলে। তার ধারণা, 'আঙ্কেল আমাদের ভালো চান না। তার কাছাকাছি থাকি এটাও চান না। নতুবা, ব্যবসা তো ব্যবসাই। সব ব্যবসাই হালাল। আমাদের নবীজি কি ব্যবসা-বাণিজ্য করেননি!'

এই একটা ভুলের মধ্যে আছে এক শ্রেণির মানুষ। তাদের ধারণা, 'নবীজি যেহেতু ব্যবসা করেছেন, সব ব্যবসাই হালাল। সুদ-ঘুষ তো খাচ্ছি না? বিজনেসই তো করছি! তাহলে সমস্যা কোথায়?'

আমাদের গ্রামের এক কাকাও এরকম ভাবতেন। তিনি ঢাকার কোনো এক অন্ধ গলিতে চোলাই মদের ব্যবসা করতেন। তারও ধারণা ছিল, ব্যবসা তো ব্যবসাই, নবীর সুন্নত। এর আবার হালাল-হারাম কীসের!

কাকা সেই ব্যবসার টাকায় আবার তার একমাত্র ছেলেকে মাদরাসায়ও পড়াতেন। ছেলেকে হাফেজ বানাতে চেয়েছিলেন। অনেক চেষ্টা করেছেন। ছেলের পেছনে বহু টাকা ঢেলেছেন।

দামি জামা,

দামি জুতা,

দামি ঘড়ি,

দামি খানা,

কাজ হয়নি। আয়-উপার্জন 'রবচাহি' হলে তবেই তো।

এরকম অদ্ভুত চিন্তাভাবনা অনেকের ভেতরেই আছে। সিনেমাওয়ালারা, বুড়ো বয়সে যাদের এক পা কবরে চলে গেছে, তারাও পত্রপত্রিকায় সাক্ষাৎকার দেন, 'সিনেমা হচ্ছে (যত অশ্লীলই হোক) এক মহান পেশা! এটা একটা শিল্প। আহা আমি যদি আমার মদের মতন একটা সিনেমা করে মরতে পারতাম!'

পাকিস্তানের 'ন' আদ্যাক্ষরের এক পর্নস্টারের মন্তব্য তো আরও জঘন্য—'আমি একজন বিশ্বাসী মুসলিম। আমি জানি, জেনা (পতিতাবৃত্তি) করা মহাপাপ। তবে আমি যেটা করছি সেটা আমার পেশা। আর, পেশা তো পেশাই! এতে কোনো পাপ নেই।'

এ ধরনের চিন্তাভাবনার মানুষগুলো প্রকৃত অর্থেই অসুস্থ। ভালো-মন্দের বাছবিচার যার মধ্যে নেই, সে আবার সুস্থ মানুষ হয় কী করে! তাও আবার মুসলিম মানুষ! হাদিসে ব্যবসা করার কথা বলা হয়েছে, কিন্তু হালাল-হারামের মাথা খাওয়ার কথা বলা হয়নি। মুসলমানদের তো আল্লাহকে ভয় করা উচিত! উপার্জন করা উচিত হালাল পদ্ধতিতে।

ধরুন, গরু খাওয়া হালাল। এখন কেউ যদি গুলি করে গরু মেরে খায়, হালাল হবে? আবার কুকুর খাওয়া হারাম। কেউ করল কী, 'বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার' বলে সম্পূর্ণ হালাল পদ্ধতিতে জবাই করে, ভালোভাবে ধুয়ে, মশলাপাতি মাখিয়ে খুব মজা করে রান্না করল, এখন নিশ্চয় হালাল হয়ে যাবে না!

অর্থাৎ হালাল-হারাম উভয় বিষয়ই লক্ষ রাখতে হবে। ব্যবসা করা সুন্নত, তাই বলে তো হারাম পণ্যের ব্যবসাকেও 'সুন্নত' বলে চালিয়ে দেওয়া যাবে না।

হারাম কাজ করে, অথবা হারামকে সাপোর্ট করতে গিয়ে যারা বলেন, 'দিল ঠিক তো দুনিয়া ঠিক', অথবা 'মনের পর্দাই বড় পর্দা'—তাদের অবস্থা যেন পরের গল্পের লোকটির মতোই। গল্পটিতে তথাকথিত মুক্তমনাদের 'দৃষ্টিভঙ্গি'র অসহায়ত্ব ফুটে উঠেছে—

: দেখেছেন, কী এক লজ্জাজনক কাণ্ড করেছে?

: কী করেছে?

: একটা ছেলে একটা মেয়ের হাত ধরে পালিয়ে গেছে!

: কী যা তা বলছেন! মেয়েটা ভালোবেসে ছেলেটার সাথে চলে গেছে, এতে দোষের কী দেখলেন?

: পালিয়ে একটা হোটেলে উঠেছে!

: উঠতেই পারে! রাস্তায় পড়ে থাকবে নাকি ওরা?

: একই ছাদের নিচে রাত কাটিয়েছে!

: কাটাবেই তো। ভালোবেসেই তো ঘর ছেড়েছে, নাকি?

: বিয়ে ছাড়া দুজন ছেলেমেয়ে হোটেলে রাত কাটাচ্ছে, এটা তো ধর্মীয় এবং সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে হারাম!

: আপনাদের নিয়ে আর পারি না। ধর্মের এই জাঁতাকলে পিষ্ট হয়েই তো ছেলেমেয়েগুলো আধুনিক হতে পারছে না। হাজার বছর ধরে পিছিয়ে আছে। ধর্মের শৃঙ্খল থেকে এজন্যই বেরিয়ে আসা দরকার।

: পুরোটা তো শুনলেন না মশাই! ছেলেটা হোটেলে দুই রাত মেয়েটার সঙ্গে ফুর্তি করে ধোঁকা দিয়ে অবশেষে পালিয়ে গেছে!

: পালাবেই তো। এতে দোষের কী আছে? সারা জীবন একই ছাদের নিচে বসবাস করবে নাকি? আপনাদের জন্য, হ্যাঁ, এই আপনাদের বাড়াবাড়ির জন্যই দেশটা ওয়েস্টার্নদের মতো উন্নতি করতে পারছে না। এসব বাড়াবাড়ি ছাড়ুন। দৃষ্টিভঙ্গি বদলান মিয়া!

: ঘটনার শেষটা তো শুনবেন! খবর-টবর তো দেখি রাখেনই না কিছু। ধোঁকা খাওয়া মেয়েটা আর কেউ না; হোস্টেলে থেকে পড়াশোনা করা আপনারই মেয়ে রিতু। এই দেখুন, পত্রিকায় ছবি-সহ নিউজ এসেছে।

এইবার মুক্তমনা ভদ্রলোকের মাথা ঘুরে গেল। চমকে উঠে ছুটতে ছুটতে বললেন—

: দেশটার যে কী হলো। দৃষ্টিভঙ্গি ঠিক রাখাই মুশকিল হয়ে দাঁড়িয়েছে!

মোটকথা, 'দিল ঠিক তো দুনিয়া ঠিক' অথবা 'মনের পর্দাই বড় পর্দা'। শব্দগুলো তারা নিজের সুবিধার জন্যই ব্যবহার করেন। সুবিধার বিপরীত হলে দৃষ্টিভঙ্গি আর ঠিক রাখতে পারেন না।

মানুষ ঠিক করার মেশিন

মসজিদ থেকে বের হয়েছি। এক ভদ্রলোক আজব এক মেশিন বিক্রি করছিলেন। ছোট্ট হ্যান্ডমেশিন। মেশিনের ভেতর থেকে দুটো ক্যাবল দুইদিকে বের হয়ে আছে। ক্যাবলের মাথায় কাগজের ছোট্ট প্যাড। প্যাডের মধ্যে আঠাজাতীয় কিছু একটা লাগানো। আজব এই মেশিন দেখতে লোকজন ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে।

মেশিন বিক্রেতা আঠালো প্যাডটা সেই লোকগুলোর হাতে, ঘাড়ে, পিঠে লাগিয়ে মেশিনটা চালু করতেই লাফিয়ে উঠছে একেকজন। চমকে উঠছে কেউ কেউ। 'একী! শরীরটা ঝিমঝিম করছে কেন?'

'করবে না! এইটা আমার এক আজব মেশিন। মানুষ ঠিক করার মেশিন!'

'মানে?'

'মানুষের শরীরের কলকব্জা সবসময় একরকম থাকে না। বয়স হইছে। সেই ছোটকাল থেকে ইউজ করতেছেন শরীরের যন্ত্রপাতিগুলা। আর কত ঠিক থাকবে? ব্যবহার করতে করতে নড়বড়ে হইছে, খিল ধরে গেছে, ব্যথা ওঠে, বেদনা করে, চিন চিন করে, শিন শিন করে... নানান ঝামেলা। এসব সমস্যার একটাই সমাধান, আমার এই আজব মেশিন!...'

ক্যানভাসার একের পর এক গুণাগুণ বর্ণনা করে যাচ্ছে। লোকজন মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে শুনছে। এত গুণ যেই মেশিনটার, দামও নিশ্চয় বেশি হবে! ক্যানভাসার বলল, 'ভয় লাগতেছে? ভাবছেন অনেক দামি জিনিস? ভয় পাবেন না ভাইয়েরা! আমার এই আজব মেশিনের দাম মাত্র ১ হাজার টাকা! ১ হাজার, ১ হাজার, ১ হাজার! আছেন কোনো ভাই?... এইদিকে কোন ভাই আওয়াজ দিলেন যেন!'

মেশিনটার গুণকীর্তন আর দাম শুনে সবাই কৌতূহলি হলো। হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে লাগল।

আমিও দেখলাম।

দামটা কমই মনে হচ্ছে।

অনেকেই পকেট হাতড়াতে লাগল। কেউ কেউ মানিব্যাগ বের করছে। কেউ আবার ১০ টাকা, ২০ টাকা ১০০ টাকার নোটগুলো গুনে দেখছে, টোটাল কত টাকা আছে। কিনতে চাচ্ছে অনেকেই। হঠাৎ একজন বলে উঠল, 'ওই মিয়া! এত দাম চাচ্ছেন কেন? ফুটপাতের জিনিস। এত দাম নাকি! ৫০০ হলে দিতে পারেন।'

শ্রোতারা ছিল মন্ত্রমুগ্ধ।

জাদুর কাঠির 'ঝিমঝিমে' ছোঁয়া পেয়ে এতক্ষণ ১ হাজার টাকায় কিনে নিতে প্রস্তুত থাকলেও এইমাত্র যেন সংবিৎ ফিরে পেল! সমস্বরে বলে উঠল, 'ঠিকই তো! ফুটপাতের জিনিস! দামটা বেশিই হয়ে যায়!'

এখন কেউ বলছে ৩০০, কেউ ৪০০, কেউ বলছে 'লাস্ট ৫০০ হলে নিতে পারি।'

ক্যানভাসার ৫০০-তে রাজি হয়ে গেল। আমি অবাক! এত উপকারী জিনিস এত কম দামে দিয়ে দিচ্ছে! লোকজন এতক্ষণ আগ্রহ প্রকাশ করলেও এখন সন্দেহে পড়ে গেছে। ফিসফাস করে বলছে, 'কোনো ঘাপলা নেই তো!' দেখলাম, অনেকেই এখন গড়িমসি করছে। একজন বলল, 'অন্য কালার নেই?'

অন্যজন বলল, 'মডেল কি একটাই? অন্য মডেলের নেই?'

কত সহজেই-না মানুষের মন-মগজকে ডাইভার্ট করা যায়! এতক্ষণ যে মেশিনটি ১ হাজার টাকায় কিনে ফেলতেও প্রস্তুত, সেই জিনিসটি এখন ৫০০-তেও কিনতে নারাজ। প্রথমে ক্যানভাসারের কথাতে মনের অবস্থা একরকম ছিল। এখন অন্যজনের কথায় আগের অবস্থা পরিবর্তন হয়ে গেল।

বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে আমরা প্রতিদিন কত গল্পগুজব করি। একটু চেষ্টা করলে কিন্তু তাদের মনের গতিপথটাকে পরিবর্তন করতে পারি। যে বন্ধুটি দ্বীনের দিকে ঝুঁকতে চাচ্ছে না, তাকে উদ্দেশ্য করে এই সিদ্ধান্ত নিতে পারি যে, ধীরে ধীরে তার জীবনের গতিপথটাকে বদলে দেবো। আসমানি রঙে রাঙিয়ে দেবো তার হৃদয়টাকে।

এক-দুই ঘণ্টা কিংবা এক-দুইদিনেই হয়তো সম্ভব হবে না। সময় লাগবে। প্রথমে একটি-দুটি দ্বীনের কথা বলি—আল্লাহ আমাদের কেন পাঠিয়েছেন, তিনি আমাদের কী কী নেয়ামত দিয়ে রেখেছেন, আমাদের কী

করা উচিত। ধৈর্য ধরে চেষ্টা করলে কি একজন মানুষের হৃদয়ের রূপ-রং পরিবর্তন করা অসম্ভব কিছু? বান্দার কাজ হলো চেষ্টা করা।

স্ত্রীর সঙ্গে অভিমান করে এক হিন্দু ভদ্রলোক নিজের গায়ে আগুন দিলেন। বাঁচতে চান না তিনি। এ অভিশপ্ত জীবন আর রাখতে চান না তিনি।

কী লাভ বেঁচে থেকে?

তার চেয়ে আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যাই ধুঁকে ধুঁকে।

বাড়ির পাশেই বাজার। ভদ্রলোক গায়ে আগুন নিয়ে বাজারের ভেতর দিয়ে দৌড়াচ্ছিলেন আর চেঁচাচ্ছিলেন।

লোকজন হইহই করে উঠল। বাজারভরতি লোকদের মধ্যে হুড়োহুড়ি পড়ে গেল।

: আরে আরে, একী কাণ্ড! লোকটা তো মরে যাবে! আগুন নেভাও! বাঁচাও তাকে!

ভদ্রলোককে আটকানো হলো। হোক সে বিধর্মী। মানুষ তো! তাকে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাতে—

কেউ পানি।

কেউ বালি।

কেউ কম্বল নিয়ে এগিয়ে এলো।

গায়ে কম্বল পেঁচিয়ে ধরল। বালি ঢেলে দিলো মাথায়। শরীরে ঢেলে দিলো পানি। অবশেষে সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় লোকটাকে আত্মাহুতি থেকে বাঁচানো গেল।

ভদ্রলোকের মতো অনেকেই আজ দৌড়াচ্ছে। আগুনের দিকে। এ আগুন দুনিয়ার নয়। জাহান্নামের। বেশি তেজস্বী। বহুগুণ দাহ্য ক্ষমতাসম্পন্ন। বড় যন্ত্রণাদায়ক।

হিন্দু-খ্রিষ্টান তো আছেই, মুসলমানরাও দৌড়াচ্ছে। দৌড়াচ্ছে প্রতিযোগিতার সঙ্গে। অথচ কী অদ্ভুত বিষয়! তাদের বাঁচাতে কেউ এগিয়ে আসছে না। যে যার মতো আছে। নির্বিকার।

জ্বলছে জ্বলুক না।

পুড়ছে পুড়ুক না।

আমার কী আসে যায় তাতে?

বরং তাকে আরও এগিয়ে দিচ্ছি আগুনের প্রজ্বলিত শিখার দিকে। তার সামনে তুলে ধরছি নিত্যনতুন পাপের সরঞ্জাম। যা তাকে বিরত রাখছে রবের প্রতি কৃতজ্ঞতা আদায় থেকে।

অ্যানালগ আছে? ছাড়ো। ডিজিটাল ধরো। টিভি ছাড়ো। ভিসিআর ছাড়ো। কেন পড়ে আছ মান্ধাতা আমলে? এখন তো ইউটিউবের যুগ। ইন্টারনেটের যুগ। পকেটেই পাচ্ছ সব।

হাতের মুঠোয়।

একজন অমুসলমানকে আত্মাহুতি থেকে বাঁচাতে সবাই সচেষ্ট। জেগে উঠছে মানবতাবোধ। এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু হায়! মুসলিম ভাইয়ের প্রতি কারও কোনো দরদ নেই। মমতা নেই। কীভাবে তাকে নরকের কঠিন আগুন থেকে বাঁচানো যাবে, এ নিয়ে কারও মধ্যে মানবতাবোধ নেই।

ধরুন একটা কুকুর আপনাকে প্রতিদিন জ্বালাতন করত। আপনার খাবারে মুখ দিত, আপনাকে কামড়ে দিতে চাইত; মোটকথা আপনাকে চরম বিরক্ত করত। একদিন কুকুরটি কোনো কঠিন বিপদে পড়ল। আপনি তখন কী করবেন? আপনাকে বিরক্ত করার অপরাধে তাকে বিপদের মুখে রেখে পাশ কেটে চলে যাবেন? না কি তাকে বিপদ থেকে বাঁচানোর চেষ্টা করবেন?

নিশ্চয় বাঁচাতেই চাইবেন!

একটি কুকুরকে অথবা একজন বিধর্মীকে যদি বিপদের হাত থেকে বাঁচাতে পারি, তবে কেন পারি না একজন মুসলিম ভাইকে জাহান্নাম থেকে বাঁচানোর চেষ্টা করতে?

দুনিয়াবি বিপদে তো একজন আরেকজনের জন্য এগিয়ে আসছি, কিন্তু কবর ও হাশরে যে কঠিন বিপদ অপেক্ষা করছে, এর থেকে বাঁচানোর জন্য কতজনই-বা অগ্রসর হচ্ছি। অন্যকে সাহায্য করব কী, নিজেই নিজেকে বাঁচানোর কোনোরূপ চেষ্টা করছি না। চেষ্টাটা করা উচিত। বরং জোরেশোরেই চেষ্টা করা উচিত। আমার আমল কবুল হয়েছে কি না, এটা বোঝা কঠিন। কিন্তু আমার চেষ্টার কারণে যদি কেউ নেক আমল করে, এতে আমি লাভবান হয়ে যাব। সে যে আমলটি করবে এর সাওয়াব আমিও

পেয়ে যাব। আমার চেষ্টার ফলে যতদিন সে নেক আমল করতে থাকবে, ততদিন আমি সাওয়াব পেতে থাকব। অথচ এতে স্বয়ং আমলকারীর সাওয়াব বিন্দুমাত্র হ্রাস পাবে না। তাই আসুন নিজেও জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচি, অন্যকেও বাঁচানোর আপ্রাণ চেষ্টা করি।

যদি এইটুকুও না পারি, জনৈক শায়খের নিচের এই কথাগুলো তো অন্তত মেনে চলতে পারি!

: শায়খ, আমি প্রতিদিন কিছু না কিছু ভালো কাজ করতে চাই!

: এটা তো সহজ, প্রতিদিন অন্তত ২৫ বার মানুষকে আল্লাহর দিকে ডাকবে।

: কিন্তু শায়খ, আমার একটা সমস্যা আছে।

: কী সমস্যা?

: আমার জড়তা আছে। কী কথা দিয়ে ডাকব, কীভাবে ডাকব বুঝতে পারি না।

: এ আর কঠিন কী! আল্লাহর বড়ত্বের কথা, কুদরতের কথা, আল্লাহর কাছে একদিন আমাদের ফিরে যেতে হবে—এই কথা বলবে...

: এতেও সমস্যা হয়, শায়খ!

: কেন?

: আমার আত্মসম্মানবোধ প্রবল! লোকদের সামনে নিজেকে ছোট করতে ইচ্ছা করে না। লোকেরা যদি আমার কথা কানে না নেয়!

: তাহলে এক কাজ করতে পারো।

: কী কাজ, শায়খ!

: তুমি চুপ থেকেও দাওয়াতের কাজ চালিয়ে যেতে পারো; চরিত্রের মাধুর্যতা দিয়ে। তুমি হয়তো মুখে কোনো দাওয়াত দিলে না! কিন্তু তোমার সচ্চরিত্র দেখে অন্যরা এই দাওয়াত পাবে যে, একজন মুসলিমের কীভাবে চলা উচিত!

একটু ভাবলেই বুঝতে পারব

এশা পড়তে মসজিদে গিয়েছি। তাকবিরে উলা পাইনি। ইমাম সাহেব কেরাত শুরু করে দিয়েছেন। মুসল্লিরা মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে সেই কেরাত শুনছেন। হঠাৎ কাতারের একেবারে বামপাশের যুবক মুসল্লিটির দিকে চোখ গেল।

দেখেই চমকে গেলাম।

এ তো মুসল্লি না! মুসল্লির বেশে জুতা চোর! সাংঘাতিক ঘটনা!

কাতারে হাত বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে, অথচ এদিক-সেদিক তাকাচ্ছে আর উশখুশ করছে। মনে হয় ইমাম সাহেবের রুকুতে যাওয়ার অপেক্ষায় আছে। রুকুতে গেলেই সে নামাজ ছেড়ে দিয়ে দামি দামি জুতা নিয়ে 'পগারপার' হবে।

কী করব বুঝতে পারছিলাম না। জামাতে শরিক হব, নাকি চোরটাকে হাতেনাতে ধরব! একদিকে চোখের সামনে জলজ্যান্ত চোর, অন্যদিকে রাকাত ছুটে যাওয়ার আশঙ্কা! কী করি! এক শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থার মধ্যে পড়ে গেলাম।

অবশেষে আগে চোরটার দফারফা করার সিদ্ধান্তটাই নিলাম। নামাজরত মুসল্লিদের জুতা নিয়ে পালাবে, তা তো হতে দেওয়া যায় না! এগিয়ে গিয়ে চোর ব্যাটার পাশে দাঁড়িয়ে ইশারায় বললাম, 'মতলবটা কী? নামাজ ছেড়ে বেরিয়ে এসো। আজ তোমার খবর আছে!'

চোরের চেহারার দিকে ভালো করে তাকাতেই আমার ভুল ভেঙে গেল। কেঁপে উঠল অন্তর। চোর ভেবে যাকে উত্তম-মাধ্যম দেওয়ার কথা ভাবছিলাম, সে আসলে সুস্থ মানুষ না। মানসিক রোগী। এ্যাবনরমাল। আরও ক্লিয়ার করে বললে—আধপাগল।

অথচ কী সুন্দর চেহারা! সুঠাম দেহ। ব্যাকব্রাশ করা ঘনকালো চুল। সব ঠিক আছে। দেহে, সৌন্দর্যে, স্বাস্থ্যে কোনোদিকেই কমতি নেই! শুধু 'হেডকোয়ার্টারে' একটু সমস্যা। এই হাসছে তো এই কাঁদছে। আর

বিড়বিড় করে কী যেন বলছে। তার আচরণ দেখে যে-কেউ তাকে জুতাচোর বলেই মনে করবে।

২.

পিজি হাসপাতালের মনোরোগ বিভাগের সামনে দিয়ে হেঁটে যাচ্ছি। এক লোক চেম্বারের দরজায় দাঁড়িয়ে বলছে, 'ক্লিনার কোথায়? আজকে ঝাড়ু দেয়নি? এ্যাই শাহানা! তুমি এখানে কেন? তোমার তো অন্য ফ্লোরে ডিউটি! যাও ওখানে!'

প্রথমে এড়িয়েই গিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম হাসপাতালেরই কেউ। বড় কোনো কর্মকর্তা হবেন। সবাই ঠিকঠাক কাজ করছে কিনা, তদারকি করছে। কাজে ভুলভাল পেলেই চাকরিচ্যুত করবে।

আমার ভুল ভাঙল নিমিষেই। আসলে সে কোনো কর্মকর্তাও না, ডাক্তারও না। না কেউ তার কথায় পাত্তা দিচ্ছে, না এখানে শাহানা নামে কেউ আছে।

আসলে সে একজন মানসিক রোগী। দেখতে ভদ্র। কোর্ট-প্যান্ট পরে দাঁড়িয়ে আছে। বয়স খুবই কম। তারুণ্যও পার হয়নি। ভেতরে ডাক্তাররা রোগী দেখছেন। তাকে বলা হয়েছে বাইরে সিরিয়ালে দাঁড়িয়ে থাকতে। সে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এসব লেকচার দিয়ে যাচ্ছে। এই হাসছে তো এই কাঁদছে।

কখনো কি ভেবে দেখেছি কী নিয়ে আমি বাহাদুরি করি?

শক্তির বড়াই।

সৌন্দর্যের বড়াই।

ক্ষমতার পাওয়ার। সব বিলীন হয়ে যাবে। শুধু একটা হুকুমে। ওপর থেকে যদি একটা আদেশ জারি করা হয় সব ক্ষমতা নিঃশেষ হয়ে যাবে। যারা আমাকে দেখে হুজুর হুজুর করত, রাস্তায় বের হলে তারাই আমাকে নিয়ে হাসিঠাট্টা করবে। বাচ্চারা ঢিল ছুড়ে মারবে। 'পাগল' বলে খোঁচাখুঁচি করতে থাকবে।

আপনি-আমি কত ভালো আছি! কত সুস্থই না আছি। এই 'ভালো'টা আপনাকে-আমাকে কে রেখেছেন? ...নিজেকে নিয়ে অহংকারের কিছু নেই।

সামান্য একটা স্ক্রুর ওপর সবকিছু নির্ভর করছে। এ যেন এক স্ক্রুনির্ভর জীবন!

'স্ক্রু-ড্রাইভার' আল্লাহর হাতে। একটু ঢিলা করে দিলেই দাঁড়িয়ে যেতে হতে পারে ট্রাফিক সিগন্যালে। দৌড়াতে হতে পারে পাগলের মতো এদিক-ওদিক। গায়ে জামা-কাপড় আছে কি নেই সেই খেয়ালও থাকবে না তখন। গোসল নেই, খাওয়া নেই। ঘরে জায়গা নেই। বাইরে শান্তি নেই—বড় জঘন্য জীবন অতিবাহিত করতে হতে পারে!

এমনও দেখেছি, অনেক বড় নেতা ছিল। ভালো বক্তৃতা দিতে পারত। রাজনীতির মঞ্চে তার বিশেষ কদর ছিল। সমীহ করত সবাই। ক্ষমতার শেষ ছিল না। থানা-পুলিশকে আঙুলের ইশারায় উঠবস করাতে চাইত। টাকার লোভে নিরীহ মানুষকে জেলে পুরত তো, অপরাধীকে করে দিত বেকসুর খালাস!

কত নিরীহ পিতাকে যে সন্তানদের কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে জেলে পুরেছে! কত স্ত্রীকে করেছে স্বামীর স্নেহ-ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত!

অথচ এখন?

একটা বদ্ধ ঘরে শেকল দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছে। বাঁধন খুলে দিলেই সমস্যা। ছুটে গিয়ে লোকজনকে কামড়ে দেয়। কখনো কখনো নিজের শরীরকে নিজেই কামড়াতে থাকে। দুনিয়ায় থাকতেই এক নরকযন্ত্রণা ভোগ করে যাচ্ছে। ওপারে তো আছেই আসল বোঝাপড়া!

প্রিয় ভাই, এর সবই আমাদের জন্য শিক্ষা! চোখের সামনে এমন ঘটনা অহরহ ঘটছে। আল্লাহ ঘটাচ্ছেন। আমরা যেন এ থেকে শিক্ষা নিই।

মিস্টার পারফেকশনিস্ট

পাঁচ তলায় এক ভাড়াটিয়া উঠেছে। সদ্যই বিয়ে করেছে। অল্পবয়সী 'কাপল'। মানানসই জুটি। ছেলেটা যেমন সুন্দর, মেয়েটিও। ছেলে ভালো একটা চাকরি করে। মেয়েটাও শিক্ষিত এবং বংশীয়।

বাসায় আমরা বলাবলি করতাম, 'এমন চমৎকার জুটি আর হয় না। একসঙ্গে যখন হেঁটে যায়, দেখলেই ভালো লাগে। একেবারে মেড ফর ইচ আদার।'

হঠাৎ জানা গেল ছেলেটা মাদ্রাজে যাচ্ছে।

কেন?

কেন আবার! নিশ্চয় ট্যুর-ফুরে যাচ্ছে। সুখী দম্পতি। টাকা-পয়সাও আছে। প্রেম-প্রীতি-ভালোবাসা কোনো কিছুরই কমতি নেই। ঘুরে তো বেড়াবেই!

কিন্তু, না। জানা গেল এক হৃদয়বিদারক ঘটনা। সুন্দর, সুশ্রী, সুঠাম দেহের এই ছেলেটির বাইরেটা যা বলে, ভেতরটা তা না। ভেতরে এক সমুদ্র বেদনা বয়ে বেড়াচ্ছে, যা আমাদের চোখে পড়েনি।

আমরা কারও বাইরেটা দেখে যেমনটা ভাবি—'আহা কী সুখী মানুষ! কোনো দুঃখ নেই। সুখে হাবুডুবু খেতেই বুঝি দুনিয়াতে এসেছে।' সবক্ষেত্রে এমনটা হয় না আসলে। আসলে আল্লাহ জানেন অন্যকিছু, যা আমরা জানি না। আমাদের খেয়ালেও আসে না। কল্পনাও করতে পারি না।

জানতে পারলাম, বিয়ের পরপরই ছেলেটার কঠিন এক 'অসুখ' ধরা পড়ে। মাথার ভেতর বড় ধরনের জটিলতা আছে। এরই মধ্যে দুই দুটা অপারেশন করা হয়েছে। জটিলতা কমেনি; বরং বেড়েছে।

ডাক্তার বলে দিয়েছে, 'আরও একটা অপারেশন লাগবে। যদিও বাঁচার আশা একেবারেই ক্ষীণ। তবুও। চেষ্টা তো করতে হবে! ভাগ্যবানরাই কেবল ফিরে আসতে পারে। আল্লাহ চাইলে আপনিও ফিরে আসবেন।'

অল্প কদিনেই এই দম্পতির সঙ্গে আমাদের পরিবারের একটা সম্প্রীতি গড়ে উঠেছিল। আম্মা বলতেন, 'এমন হাসিখুশি আর নিরহংকারী মেয়ে আমি জীবনেও দেখিনি'

আব্বার মুখে শুনতাম ছেলেটার গুণের হাজারটা বন্দনা। 'কী নম্র ব্যবহার! কী চমৎকার আচার-আচরণ! এমন ছেলে আজকাল লাখেও একটা পাওয়া যায় না।'

বিদায় নেওয়ার আগের দিন। মসজিদ থেকে বের হওয়ার সময় ছেলেটা আব্বাকে বলছিল, 'আঙ্কেল, দোয়া করবেন। কালই ফ্লাইট। যাচ্ছি দুজনই। কিন্তু মন বলছে, একসঙ্গে দুজনার আর ফিরে আসা হবে না।'

ছেলেটার চাঁদমুখে মুচকি হাসির রেখা, অথচ হৃদয়জুড়ে হতাশার কালো মেঘ।

এই তো জীবন। সুখ যেখানে প্রকাশ্য, অসুখটা খোলসে বন্দি। কারও হৃদয়ের খবর কেউ জানে না। জানেন শুধু আল্লাহ। আমরা সামান্য একটু পেরেশানি এলেই হা-পিত্যেশ করি। হতাশ হয়ে যাই। আফসোস করতে থাকি, কেন এমনটা হলো? কেন অমনটা হলো না?

কেন আমাকে লম্বা করে বানানো হলো না?

কেন আরও ফর্সা হলাম না?

কেন করা হলো খাটো-বেটে?

কী ক্ষতি হতো আল্লাহ যদি আমাকে হান্ড্রেড পার্সেন্ট পারফেক্ট করে বানাতেন!

প্রিয় ভাই, এ আফসোস মন থেকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করুন। আপনার যা আছে, তা অনেককেই দেওয়া হয়নি। আপনি লম্বা হতে না পেরে আফসোস করছেন, পাশের ঘরেই হয়তো কেউ বোঁচা নাক নিয়ে মাথাকুটে মরছে!

আপনার গায়ের রং বিদঘুটে কালো, আপনার কাছেরই কেউ হয়তো ফর্সা চেহারা নিয়ে বিড়ম্বনায় আছে! আপনার কাছে প্রচুর টাকা-পয়সা নেই বলে আফসোস করছেন, অথচ এমন অনেক লোক আছে, কোটি টাকার বিনিময়ে হলেও 'শান্তি' কিনতে চেয়ে ব্যর্থ হচ্ছে, একটু সুস্থতার জন্য হন্যে হয়ে বিশ্বের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত ছুটে মরছে।

আসলে পৃথিবীতে 'মিস্টার পারফেকশনিস্ট' বলতে কেউ নেই। হয়তো কারও কারও বাইরেটা দেখে আমরা একটা উপাধি দিয়ে দিই, কিন্তু ভেতরের খবর একমাত্র আল্লাহ জানেন।

ভেতরে হাজারটা অশান্তি নিয়ে দিনের পর দিন হলিউড কিংবা বলিউড তারকাদের চেয়েও তুখোড় অভিনয় করে যাচ্ছে—এমন লোকের সংখ্যা অসংখ্য! এর নাম পারফেক্ট থাকা না। মেকি এই পৃথিবীতে সে-ই সবচেয়ে বেশি সুখী, যার আছে অল্পেতুষ্ট থাকার ক্ষমতা। যিনি বলতে পারেন—আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ আমাকে ভালো রেখেছেন।

দোয়েল পাখির জীবন

ঢাকার দোয়েল চত্বরে গিয়েছিলেন কখনো? সম্ভব হলে ঘুরে আসবেন। চৌরাস্তার মাঝখানে বিরাট দুটি দোয়েল পাখি ডানা ছড়িয়ে বসে আছে। রাত-দিন ২৪ ঘন্টা চারপাশ দিয়ে যানবাহন আর মানুষজনের ছোটাছুটি চলছে। ব্যস্ত পথ, ব্যস্ত মানুষ। কারোরই দাঁড়িয়ে থেকে একটা বিষয় ভাবার সময় নেই।

বিষয়টা কী?

দেখবেন অজস্র পাখির মলমূত্রে ভাস্কর্যটির ডানা এবং মাথা সয়লাব হয়ে আছে। মলত্যাগ করা পাখিদের মধ্যে নিশ্চয় দোয়েল পাখিও আছে! দোয়েল নিজেও বুঝতে পারছে না, বাংলাদেশের জাতীয় পাখি হিসাবে তাকে সম্মানিত করা হয়েছে।

বিশেষ মর্যাদার কারণেই ঢাকা শহরের গুরুত্বপূর্ণ একটা জায়গায় তার ভাস্কর্য তৈরি করা হয়েছে। নিজের মূল্য বুঝতে পারছে না বলেই সে নিজের ভাস্কর্যের ওপর মলত্যাগ করতে দ্বিধা করছে না।

আমাদের মুসলমানদের অবস্থাও হয়েছে দোয়েল পাখির মতোই। নিজেদের দাম বুঝি না। তাই তো নিজ ধর্মের চেয়ে অন্য ধর্মকে 'উৎকৃষ্ট' মনে করি। অন্য ধর্মের লোকদের সঙ্গে আত্মীয়তা করি। এতে একটুও

বিচলিত হই না যে, কী করছি। কেউ কেউ অবশ্য আত্মীয়তা করে না, কিন্তু এই কাজকে মোটেও দূষণীয় মনে করে না। ভাবে, এ আর এমন কী?

আল্লাহ আমাদের বানিয়েছেন মানুষ থেকে, অথচ ডারউইনের 'বানর মতবাদ'-এ বিশ্বাস করে নিজেদের মর্যাদা নিজেরাই হারানোর চেষ্টা করি।

আল্লাহ আমাদের মর্যাদা রেখেছেন, কুরআন-হাদিস মেনে চলার মধ্যে। এবং দ্বীনি শিক্ষা অর্জন, মসজিদ-মাদরাসা, দাড়ি-টুপি, পর্দা ইত্যাদির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করার মধ্যে। অথচ মুসলমান হয়ে এগুলোকে নিয়ে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করি।

মুসলিম হয়ে অর্থকে ইবাদতের চেয়ে বড় মনে করি। অর্থাৎ টাকা-পয়সার পেছনে ছুটে চলাকে জীবনের একমাত্র লক্ষ্য মনে করি। সুদ-ঘুষ নামক 'উপরি ইনকাম'কে 'হালাল' মনে করি।

পরিচিত এক হিন্দু ভদ্রলোক একসময় অনেক টাকার মালিক ছিলেন। কয়েকটা ফ্যাক্টরি এবং দোকান ছিল। অনেকদিন পর তার সঙ্গে দেখা হতেই চমকে গেলাম। একেবারে শুকিয়ে গেছেন। দেখেই মনে হলো দুশ্চিন্তায় হাবুডুবু খাচ্ছেন। জানতে পারলাম, তার আগের সেই রমরমা অবস্থা এখন আর নেই। প্রায় নিঃস্ব হয়ে গেছেন। 'তো, কী করেন এখন?'

'একটা কারখানায় ম্যানেজার হিসাবে কাজ করি।'

'বেতন কেমন?'

'খুবই অল্প। সংসার চলে না। কিছু উপরি আয় আছে অবশ্য। বোঝেনই তো, সব তো আর বসকে জানিয়ে করা যায় না। ক্যাশের ভাউচারে কিছুটা এদিক-ওদিক করে চালিয়ে নিতে হয় আরকি। অত অনেস্ট হয়ে এই যুগে আর চলা যায় না, ভাই।'

ভদ্রলোক এমনভাবে বলছিলেন, যেন চুরি-চামারি করে আয় করা মোটেও অন্যায় কিছু না। তার কথা হচ্ছে, 'আজকাল উলটাপালটা ইনকামের একটা পথ রাখতেই হয়। কী আর করা। পয়সা না থাকলে সমাজে মাথা উঁচু করে বাঁচা যায় না।'

তিনি অমুসলিম। তার কথা বাদ। কিন্তু একজন মুসলিমকে তো অবশ্যই বিশ্বস্ত হওয়া চাই। অন্তরে আল্লাহর ভয় রাখা, হারাম থেকে দূরে থাকা, হালাল উপায়ে জীবিকা নির্বাহ করা—এগুলো তো তার একান্ত

কর্তব্য। অবস্থা এমন হয়েছে যে, একজন অমুসলিম আর মুসলিমের মধ্যে কোনো পার্থক্য খুঁজে পাওয়া যায় না। সেও মনে করে, 'পয়সা নেই তো তোমার মূল্য নেই। সমাজে মাথা উঁচু করতে চাও তো পয়সা কামাও!'

এটা সত্যি যে, জীবন ধারণের জন্য পয়সা উপার্জন জরুরি। কিন্তু তাই বলে দ্বীন-ঈমান বিকিয়ে?

দোয়েল পাখি তো পাখিমাত্র। বিবেকবুদ্ধি নেই। আমরা তো বিবেকবুদ্ধিসম্পন্ন। আমাদের আকল আছে, মর্যাদাবোধ আছে। আমরা যেন দোয়েল পাখির মতো না হই। আল্লাহ্ আমাদেরকে 'জাতীয় মানুষ' হিসাবে যে মর্যাদা দিয়েছেন, তার যেন যথাযথ মূল্যায়ন করি।

কী অবাক পৃথিবী

গত কয়েক দিন যাবৎ একটা প্রবলেমের ভেতর দিয়ে যাচ্ছিলাম। আমার কম্পিউটার থেকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা সফটওয়্যার ডিলিট হয়ে গেছে। কাজ করতে পারছিলাম না। এই সফটওয়্যার আমাদের কোম্পানির নিজস্ব। অতএব, ইন্টারনেট থেকে ডাউনলোড করে কাজ চালানোর উপায় নেই।

আমি আমাদের সফটওয়্যার বিশেষজ্ঞের সঙ্গে যোগাযোগ করলাম। সে থাকে দুবাইতে। তার নাম মি. জোজি। ইন্ডিয়ান ভদ্রলোক। জোজি বলল, 'ভাবনার কিছু নেই। টিম ভিউয়ারের মাধ্যমে সমাধান করা সম্ভব।'

'টিম ভিউয়ার' সফটওয়্যার একটা আজব জিনিস! যা দিয়ে আপনি চাইলে বিশ্বের যে-কেউ আপনার কম্পিউটার সারিয়ে দিতে পারবে। জোজি আমার টিম ভিউয়ার আইডি-পাসওয়ার্ড নিলো। আমি তো থ হয়ে হাত পা গুটিয়ে বসে আছি! দেখলাম মাউসের পয়েন্টার নড়ছে। ফোল্ডার ওপেন হচ্ছে। ফাইল কপি হচ্ছে। আমাকে কিন্তু কিছুই করতে হচ্ছে না। হাত পা গুটানো আমার। দুবাই বসে আমার কম্পিউটার চালাচ্ছে মি. জোজি। এক ঘণ্টার চেষ্টায় সে আমার সমস্যাগুলোর সমাধান করে ফেলল।

কী বিস্ময়! কী বিস্ময়!

এর চেয়েও বিস্ময়কর হলো, সুনিপুণভাবে আমাকে একজন চালাচ্ছেন। আমি যখন ঘুমিয়ে যাই, পৃথিবীটা স্থবির হয়ে যায় আমার। শক্তি, ক্ষমতা, ইচ্ছা সবকিছু প্যারালাইজড হয়ে পড়ে। মাছি তাড়ানোর ক্ষমতাও থাকে না তখন। একজন তখনো আমার দেহ-কম্পিউটারটাকে ঠিকঠাক চালাতে থাকেন। মাউস, কিবোর্ড তারই আয়ত্তে থাকে। যখন জেগে থাকি, তখনো। আমার চলা, বলা, দেখা—সবই তাঁর নিয়ন্ত্রণে চলতে থাকে।

কখনো কি বিস্মিত হয়েছি তাঁর কর্মকাণ্ডে? মুখফুটে বা মনে মনে হলেও কখনো কি বলেছি—'কী বিপুল সৃষ্টি তোমার, হে রব! দেখে নয়ন মুগ্ধ হলো!'

হৃদয়ে লেগেছে রং

পাড়ার উর্বশী মেয়েটির দিকে চোখ পড়েছে এক যুবকের। মেয়েটি দেখতে অপূর্ব! প্রতিদিন সেজেগুজে কলেজে যায়। দেখলেই মনে এক অজানা খুশি দোলা দিতে থাকে। বুকটা কেমন যেন করে, বড় ফাঁকা ফাঁকা লাগে। কোনো কাজেই মন বসে না। বড্ড অস্থির হয়ে থাকে মন। অশান্ত হৃদয় একনজর না দেখা পর্যন্ত শান্তই হয় না!

এই পথেই কলেজে যায় সে। উচাটন মন নিয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষার পর অপেক্ষা। ঘণ্টার পর ঘণ্টা।

কখন আসবে?

নাকি আসবেই না। নাকি অন্য কোনো পথ দিয়ে চলে যাবে!

অসুস্থ নাতো আজকে? যদি না আসে! অপেক্ষার যেন শেষ নেই।

বন্ধুরা খেপায়—'কীরে! হৃদয়ে রং লাগছে মনে হয়? আমাগো কিন্তু ট্রিট দিতে হবে দোস্ত, নাইলে খবর আছে!'

বড় ভাইয়ের সাবধান বাণী—'ভুলেও যেন ওই পথে না দেখি!'

বাবার চোখ রাঙানি—'এসব কী শুনছি! পড়াশোনা বাদ দিয়ে নাকি রাস্তায় ফ্যা-ফ্যা করে ঘুরে বেরাস! ঠ্যাং ভেঙে দেবো একদম!'

বন্ধুদের খেপানো। বড় ভাইদের চোখ রাঙানো। বাবা-মায়ের শাসানো ইত্যাদি উপেক্ষা করেও সেই মেয়েকে সে ভালোবেসে ফেলল। দীর্ঘ অপেক্ষার পর মনের কথাটা প্রকাশ করবে বলে যখন প্রস্তুতি নিলো, তখন জানতে পারল এক নৃশংস ঘটনা!

মেয়েটা দেখতেই যত সুন্দরী, কিন্তু চরিত্রের ঠিক নেই। দামি দামি কসমেটিক্স আর জামা-জুতার বন্দোবস্তের ধান্দায় বহু ছেলের সঙ্গে সে সম্পর্ক রাখে। তাদেরই কারও না কারও সঙ্গে হররোজ সে বেড শেয়ারের মতো জঘন্য কাজটিও করে।

মানুষের ওপরটা দেখে ভেতরটা আপনি কীভাবে বুঝবেন? বোঝার কোনো উপায় নেই। চরিত্রটাই আসল। চরিত্র ভালো তো সব ভালো। দেখতে অসুন্দর, এমন মানুষও চরিত্রগুণে সবার কাছে সমাদৃত হন। চরিত্রের সৌন্দর্যের চেয়ে বড় আর কিছু নেই।

এজন্য আমরা যখন আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চেহারা দেখি, তখন চরিত্রের জন্যও কিছু ভাবা দরকার।

আমাদের রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আয়নার সামনে যখন দাঁড়াতেন, এই দোয়া করতেন—'আল্লাহুম্মা হাসসানতা খালকি ফাহাসসিন খুলুকি।' হে আল্লাহ, আমার চেহারা যেমন সুন্দর করেছ, চরিত্রটাকেও তেমনই সুন্দর করে দাও!

প্রেমে পড়েছেন কখনো?

পড়েননি হয়তো। কেউ কেউ পড়েও থাকবেন। না পড়ে থাকলেও প্রেমেপড়া মানুষগুলোকে কাছ থেকে নিশ্চয় অবজার্ভ করে থাকবেন।

পাশের বাড়ির আবেগি যুবক। একজনের রূপ দেখে প্রেমে মজে গেছে। মেয়েটি দেখতে সুন্দর, তার হাঁটাচলা সুন্দর, হাসি সুন্দর।

মাত্রই তো তিনটা গুণ; চেহারা, হাসি, হাঁটা। এই তিন গুণ দেখেই যুবক পুরোপুরি ফিদা। যুবকের ঘুম উড়ে গেছে। নাওয়াখাওয়া বন্ধ। বন্ধুদের

আড্ডায় আগ্রহ নেই। ক্লাসে মন নেই। ঘরে কিংবা বাইরে, কোথাও শান্তি নেই। এ এক বেচাইন অবস্থা।

এখন তার এই 'বেচাইনি' দেখে কেউ একজন বলল, 'তোমার এ অবস্থা কেন? চাও কী তুমি? এমন করুণ অবস্থা তো আমার সহ্য হচ্ছে না। টাকা-পয়সা লাগবে? নাকি ভালো কোনো চাকরি চাও? সুন্দরী কোনো মেয়ে দেখে বিয়ে করিয়ে দিই? নাকি সেন্টমার্টিন কিংবা কক্সবাজার ঘুরে আসতে চাও!... বলো, কী চাও তুমি?'

যুবক দুইদিকে মাথা নাড়িয়ে জবাব দিচ্ছে, 'যাও তো মিয়া! সময় নষ্ট করো না। টাকা-পয়সা, গাড়ি-বাড়ি কিচ্ছু চাই না। আমি যা চাই তা তুমি দিতে পারবা না। আমাকে আমার মতো থাকতে দাও। যাও। যাও।'

দুনিয়ার সবকিছু তার কাছে বিস্বাদ লাগছে। প্রিয় বন্ধু, প্রিয় বাবা-মা, ভাইবোন—কাউকেই এখন আর ভালো লাগছে না। কারও কথাই মনে ধরছে না। সব কথা, সব সুর যেন বেসুরো লাগছে।

শুধু সেই বন্ধুটিকেই তার কাছে ভালো লাগবে, যে বলবে—'এইটা কোনো ব্যাপার দোস্ত? আমিই পারব তোর মনের মানুষটির সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করতে। টেনশন নিস না তো!'

বন্ধুর শুধু এই একটু সান্ত্বনাতেই যুবকটি দেহে প্রাণ ফিরে পাবে। পৃথিবীর সব মানুষের চেয়ে এই বন্ধুটিকেই কেবল তার কাছে আপন মনে হবে। কাছের মনে হবে। আর সব পর। সব দূরের। সবাইকে শুধু স্বার্থপরই মনে হবে। এখন, বন্ধু যদি বলে, আগুনে ঝাঁপ দাও। যুবক তাই দিতে প্রস্তুত। বন্ধু যদি বলে, পানিতে লাফিয়ে পড়ো। যুবক তাতেও সম্মত। একটাই চাওয়া—'তার সঙ্গে মিলিয়ে দাও!'

মাত্রই তো তিনটি গুণ। চেহারা, হাসি, হাঁটাচলা। তিন গুণ দেখেই একটা মানুষের জন্য যদি এত পাগল হওয়া যায়, যাঁর গুণে পৃথিবী আলোকিত, সেই প্রিয় নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য কতটা পাগল হওয়া চাই! কতটা বেচাইন হওয়া চাই!

দু-চারটা গুণ দেখে যার প্রেমে পাগল হই, সে তো আমার প্রেমে পাগল নাও হতে পারে। যাকে ভেবে ভেবে রাত-দিন একাকার করে ফেলি, সে

তো আমার কথা না-ও ভাবতে পারে। তার মনে যে অন্য কারোর স্থান নেই, সেই গ্যারান্টিই-বা কে দিতে পারে!

অথচ প্রিয় নবীজি সারাটা জীবন আমাদের কথাই ভেবেছেন। পৃথিবী ছেড়ে যাওয়ার সময় ভেবেছেন। কবরেও ভাবছেন। হাশরেও ভাববেন। ভাববেন কঠিন দিনে কাউসারের পেয়ালা হাতে।

এমন মানুষটির প্রেমে না পড়ে কার প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছি!

ইন এ রিলেশনশিপ

মুহিন প্রেমে পড়েছে। মেয়েটির নাম রোদেলা। ফেসবুকেই পরিচয়। মুহিন থাকে ঢাকায়। রোদেলা যশোরে।

পরিচয়টা কিছু ছবিকে কেন্দ্র করে। রোদেলা নন্দন পার্কে তোলা কিছু ছবি পোস্ট করেছিল। মুহিন তা দেখে 'ক্রাশ' খেল। এরপর থেকে রোদেলার ইনবক্সে সুন্দর সুন্দর মেসেজ দিত। রোদেলাকে প্রশংসায় ভাসিয়ে দিত।

প্রশংসা শুনতে কার না ভালো লাগে!

রোদেলারও লাগল।

তবে রোদেলা মেসেজগুলোর কোনো জবাব দিত না। এড়িয়ে যেত।

হঠাৎ একদিন মুহিন নীরব হয়ে গেল। একেবারে লা-পাত্তা। মেসেজ পাঠানো বন্ধ করে দিলো। রোদেলা মেসেজ পেতে পেতে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল। প্রতিদিন নিয়ম করে সকাল-বিকাল মুহিনের প্রশংসাসূচক মেসেজগুলো পেয়ে ফুলে ফেঁপে উঠত। হঠাৎ মেসেজ আসা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় রোদেলার অস্থিরতা বেড়ে গেল।

এক সপ্তাহ। দুই সপ্তাহ। তিন সপ্তাহ।

রোদেলা আর পাত্তা না দিয়ে পারল না। লিখেই ফেলল—'এটা ঠিক না। কাউকে মেসেজ পড়া থেকে বঞ্চিত করা অন্যায়।'

সেই থেকে শুরু। মুহিন অভিজ্ঞ খেলোয়ার। রোদেলাকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করতেই এমনটা করেছিল। আবার শুরু হলো মেসেজিং। এবার আর মুহিন একলা না; রোদেলাও।

রোদেলা আনন্দিত। এতদিনে একজন 'মনের মানুষ' পাওয়া গেল। দুজনই তাদের ফেসবুকের রিলেশনশিপ ঘরে লিখল—In a Relationship. অর্থাৎ আমরা (প্রেম নামক একটা—নোংরা, অনৈতিক এবং ইসলামে নিষিদ্ধ) সম্পর্কে জড়িয়েছি।

কল্পনা করি, এরা দুজন 'শেষ বিচারের' ময়দানে দাঁড়াল। আল্লাহ তাদের সামনে আমলনামা উত্থাপন করলেন। তারা এই অনৈতিক সম্পর্কের কথা অস্বীকার করল। বলল, 'না! এ কক্ষনোই হতে পারে না। আমরা এমন কোনো সম্পর্কে জড়াতেই পারি না! এ অন্য কারও আমলনামা।'

তখন তাদের বিপক্ষে সাক্ষীর কি কোনো অভাব হবে? হওয়ার তো কথা না! কারণ, লাখো-কোটি ফেসবুকার যে তাদের 'ইন এ রিলেশনশিপ'-এর সাক্ষী ছিল!

সুতরাং গুনাহ করা ও গুনাহের কথা ফেসবুকে রটিয়ে বেড়ানোর আগে বুঝে নিন, কী করবেন।

আল্লাহর ফায়সালাই উত্তম ফায়সালা

লেখালেখির প্রথমদিকের কথা। প্রথম বইটি বেরিয়েছেমাত্র। একদিন এক পাঠক আমাকে মেসেজে জানাল, 'আমি কি একটা বিষয়ে আপনার সঙ্গে কথা বলতে পারি?'

'জি, বলুন!'

'আমার এক বন্ধু অত্যন্ত ধর্মভীরু। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ে। জিকির-আজকার করে। কিন্তু একটা কারণে আল্লাহর ওপর তার অভিমান আছে।'

'কী সেই কারণ?'

'সে একটা মেয়েকে ভালোবাসত। মনেপ্রাণে মেয়েটিকে পেতে চেয়েছিল। আল্লাহর কাছে অনেক দোয়াও করেছে। কাজ হয়নি। মেয়েটিকে

সে পায়নি। ... এত দোয়া করার পরও আল্লাহ্ কেন তার দোয়া কবুল করল না? কেন মেয়েটিকে তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিলো?'

ভাইটিকে বললাম, প্রিয় ভাই, লেখার শেষে আপনি 'কেন ছিনিয়ে নিলো' বলে যে অভিযোগ করেছেন, এটা ঠিক হয়নি। আল্লাহর বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ করা যায় না। কাউকে ভালো লাগলে তাকে না পেলে আল্লাহকে এই বলে দোষারোপ করা ঠিক না যে, 'আল্লাহ্ কেন দিলো না?' এই অভিযোগ একেবারেই বাচ্চাসুলভ।

বাচ্চারা ছুরি-কাঁচি দিয়ে খেলা করতে চায়। বড়রা জানে এতে তার ক্ষতি হতে পারে। বড় কোনো অ্যাকসিডেন্ট হয়ে যেতে পারে। বাচ্চার কাছ থেকে জোর করে ছিনিয়ে নেয় ধারালো সেই অস্ত্রটি। বাচ্চা মনে করে, বাবা আমার ভালো চায় না। আমি আনন্দিত হই এটা তারা চায় না। কাঁদতে থাকে। আর দিতে থাকে নানান অভিযোগ।

আল্লাহও আমাদের ভালো চান। তাই তিনি অমঙ্গলজনক জিনিস আমার কাছ থেকে সরিয়ে নেন। কারণ আমরা যেটা মঙ্গল মনে করি, সেটাতে মঙ্গল নাও থাকতে পারে। ফেসবুকের পরিচয়ে প্রেম ভালোবাসা বা বিয়ের আগে যেকোনো ধরনের সম্পর্কই নিষিদ্ধ এবং গর্হিত কাজ। সুতরাং ছেলেটি এরকম একটি সম্পর্কে জড়িয়ে ভালো কাজ করেনি।

আপনি বলেছেন, 'ছেলেটি নামাজি। জিকিরকারী।' তাহলে তো ভালোই হলো। দ্বীনের বুঝ কিছুটা হলেও আছে। এখন তার জন্য উত্তম হবে মেয়েটির জন্য আফসোস না করে তওবা করে এ পথ থেকে ফিরে আসা। আফসোস করে স্বাস্থ্য নষ্ট করার চেয়ে আল্লাহর ফায়সালার ওপর সন্তুষ্ট থাকাই সবার জন্য মঙ্গলজনক। কারণ, আল্লাহর ফায়সালাই উত্তম ফায়সালা।

আমার এক আত্মীয়া খুবই পরহেজগার ছিলেন। আজানের সঙ্গে সঙ্গে নামাজে দাঁড়িয়ে যেতেন। কখনো নামাজে গাফলতি করতেন না। নিয়মিত অজিফা পাঠ করা ছিল তার বিশেষ গুণ। তো, আমার এই আত্মীয়ার সবকিছু ঠিক থাকলেও এক জায়গায় একটু ভুল ছিল। তিনি নামাজ শেষে দোয়া করতেন—'আল্লাহ, আমার ভাগ্যে যেন দাড়িওয়ালা জামাই না আসে!'

তিনি হয়তো ভেবেছিলেন দাড়ি ছাড়া ছেলেরা দেখতে স্মার্ট এবং সুন্দর মনের অধিকারী হয়। এদের সঙ্গে দাম্পত্যজীবন সুখের হবে। কিন্তু না। তা হয়নি। তার দোয়া কবুল হয়েছে সত্যি! চাহিদামাফিক স্মার্ট, সুন্দর, শ্মশ্রুমণ্ডিত হাজব্যান্ড তিনি পেয়েছেন, কিন্তু সুখী হতে পারেননি।

অমুক ছেলেকে কিংবা অমুক মেয়েকে পেলে আমি সুখী হব, নয়তো আমার জীবনটাই বিফল হবে—এমনটা বিচার করার ক্ষমতা কারোরই নেই।

এই ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর হাতে। তিনিই ভালো জানেন, কে আমার জন্য পারফেক্ট। কে আমার জন্য সুখকর। কে পারবে আমার জীবনকে পুষ্পোদ্যান বানিয়ে দিতে। কার কারণে জীবন কাটবে নরকযন্ত্রণায়।

এমনও দেখেছি, প্রেমের বিয়ে ছিল না, পারিবারিক পছন্দের বিয়ে। ছেলেটির কিংবা মেয়েটির অন্য কাউকে পছন্দ ছিল। অনিচ্ছায় বিয়ের পিঁড়িতে বসতে হয়েছে। বিয়ের পর প্রথম প্রথম কেউ কারও মুখই দেখতে চাননি। সাপে-নেউলে সম্পর্ক। মনে হয়েছিল এ বিয়ে দুইদিনও টিকবে না, ভেঙেচুরে তছনছ হয়ে যাবে। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই এই অচলাবস্থা কেটে গেছে। দিব্যি কপোত-কপোতির মতো চিরসুখে দাম্পত্যজীবন কাটাচ্ছেন। প্রথমে কেউ কারও মুখদর্শন করতে চাইতেন না, অথচ এখন একজন আরেকজনের জন্য জীবন বিলিয়ে দিতেও প্রস্তুত!

মনের খবর বুঝতে পারেন একজনই

আমার এক কাজিন একটা ছেলেকে পছন্দ করত। ছেলেটা বেশ চতুর। চেহারায় একটা মুখোশ পরা ছিল। ভদ্রতার মুখোশ। অদ্ভুত ছেলে। প্রথমে মেয়েদেরকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করত। মুখে থাকত মন ভোলানো কথাবার্তা। কিন্তু অন্তরে থাকত ভিন্নতা।

এভাবে কিছুদিন যেত।

যখন মেয়েটার মনে গজিয়ে উঠত প্রীতির ডালপালা, ব্যস, ছেলেটার কাজ শেষ। হঠাৎ করে যেত উধাও হয়ে। কোনো পাত্তা থাকত না। এদিকে মেয়েটা পুড়ে পুড়ে অস্থির। ঘুম হারাম।

রাতের পর রাত।

দিনের পর দিন।

চোখে গড়িয়ে পড়ত আগুনপোড়া জল।

কাজিনের ক্ষেত্রেও এমনটা হলো। নিজের দিকে আকৃষ্ট করে হাওয়া হয়ে গেল ছেলেটা। কাজিন বুঝতে পারেনি এমনটা হবে। বিশ্বাস করেছিল। ভেবেছিল, কোথাও হারিয়ে যাবে না। পাশে থাকবে সুখেদুঃখে।

কোথায় আর পাশে থাকা?

শুরু হলো দুঃখের দিন। যাতনার রাত। এত কাঁদল, এত কাঁদল। তবুও কাউকে বুঝতে দিলো না। ছেলেটাকেও না।

মনের খবর কেউ জানল না। না মা, না বোন, না ভাইয়া। একবুক কষ্ট আর যাতনা নিয়ে দিনযাপন করে গেল।

আমাদের মনে এমন অনেক কথা আছে, কাউকে বলতে পারি না। না বললে কেউ বোঝেও না। বুঝবে কীভাবে? সে ক্ষমতা কি কারও আছে?

মনের খবর বুঝতে পারেন এমন একজনই আছেন। তিনি আল্লাহ। মানুষের মনের সব কথা তিনি বুঝতে পারেন। দেখতেও পারেন। শুধু মানুষেরই না, পৃথিবীর সব প্রাণীর কথাই তিনি বোঝেন।

ছোট্ট পিঁপড়ার পায়ের শব্দও তিনি শুনতে পান। সমুদ্রের বিশাল তিমি, ভয়ংকর হাঙর কিংবা ছোট্ট একটা চিংড়ি। কেউ তাঁর দৃষ্টির আড়ালে নয়। সবাই যদি তাঁর কাছে একসঙ্গে চাওয়া শুরু করে, তিনি থমকে যান না। বলেন না, 'চুপ করো! একজন একজন করে বলো। সবাই বললে আমি শুনব কী করে!'

তিনি বলেন, চাইতে থাকো।

যত ইচ্ছা চাও।

আরও চাও। আমার কাছেই চাও।

বলতে হলেও বলো আমার কাছেই। তোমার কষ্টের কথা। ব্যথা বেদনার কথা। না পাওয়ার যাতনা। সব আমাকে বলো। গভীর রাত। সবাই ঘুমে বিভোর। পুরো শহর নিশ্চুপ। আধমরা ঘুমে ছেয়ে থাকে নগরীর প্রতিটি গৃহ। আমার ঘুম নেই। ক্লান্তি নেই। কোনো অলসতা নেই। ও আমার প্রিয় বান্দা, তোমার সব কথা শোনার জন্য আমি সদা জাগ্রত। চাইতে থাকো।

তবে এমন কিছু চাওয়া যাবে না, যেটা হারাম। যেটা নিষিদ্ধ করেছি আমি।

হালাল রিজিক। হালাল সম্পর্কের উন্নতি। বারাকাহ। নেককার স্ত্রী। পুণ্যবান স্বামী। দুনিয়া ও আখেরাতে কামিয়াবি।... এসব চাও! বলো আমাকে! কী হয়ে গেল তোমার? যে তোমার সব কথা শোনার জন্য প্রস্তুত, সব ব্যথা ভোলানোর জন্য ক্ষমতাবান। তাঁর থেকে মুখ ফিরিয়ে বসে আছ?

অন্ধ ভালোবাসা

আমি একটা ছেলেকে পাগলের মতো ভালোবাসি। তাকে পাওয়ার জন্য নিয়মিত নামাজ পড়ি। নামাজের পর মোনাজাতে ওর মুখটাই শুধু ভাসে। এমন কোনো মোনাজাত নেই যে, আমি ওকে পেতে দোয়া করি না।

আমার বাবা-মা ছেলেটাকে কিছুতেই মেনে নিচ্ছে না। তারা তাদের নিজেদের জেদটাকেই বড় করে দেখে। আমি মরে গেলেও তারা সইতে পারবে। কিন্তু অবাধ্য হলে নাকি তারা মরেই যাবে।

বাবা-মা কেন যে বোঝে না! তারা তো আর সারা জীবন বেঁচে থাকবে না। আমাকে ফেলে মরে যাবে। আমার স্বামীই তো সারা জীবন আমার সঙ্গী হয়ে থাকবে! তো, যাকে আমি স্বামী হিসাবে মনেপ্রাণে মেনে নিয়েছি, তাকে ছাড়া কীভাবে জীবন কাটাব?

প্রতিটা দিন আমি ওর জন্য কাঁদি। প্রতিমুহূর্তে মরণযন্ত্রণা হয় আমার। কষ্ট পাই। এ কষ্টের কথা কাউকেই বলতে পারি না।

সুইসাইড তো চাইলেই করতে পারতাম। যদি তাকে হারিয়ে ফেলি! পরকালেও যেন তাকে পাই এজন্যই সুইসাইড করি না।

... ওপরের লেখাটা এক পাগল প্রেমিকার। প্রেমিককে না পেয়ে এরকম আবোল-তাবোল আর আবেগি লেখা লিখেছে। কী এক ভুল ধারণার সঙ্গে বসবাস করছে আমাদের শিক্ষিত প্রজন্ম!

চাহিদাটা দেখুন!

আল্লাহর কাছে কী চাইতে হবে সেটাই এখনো শিখিনি। নামাজ পড়ছি। অথচ উদ্দেশ্য রাখছি একটা হারাম সম্পর্ককে কাছে পাওয়ার।

'পরকালে যেন তাকে পাই এজন্যই সুইসাইড করি না'—এটা আরেকটা ভুল চাওয়া। পরকালে কে কাকে পাবে কেউ বলতে পারে না। সুইসাইড করিনি বলেই যে আমি বেহেশতে যাব, এর গ্যারান্টি কে দিতে পারে? দোজখে যাওয়ার মতো আমার কি অন্য কোনো গুনাহ থাকতে পারে না?

আমি না হয় বেহেশতিই হলাম, সে তো বেহেশতি না-ও হতে পারে। পরকালের ব্যাপারগুলো আমরা আমাদের মতো করে ভাবতে শুরু করেছি। বলা হয়ে থাকে, ভালোবাসা নাকি অন্ধ। আসলেই অন্ধ। তথাকথিত প্রেম-ভালোবাসা আমাদের এমনই অন্ধ করে দেয় যে, কাউকে ভালোবেসে না পেলে পরকালে পাওয়ার আশা নিয়ে বসে থাকি।

অদ্ভুত!

আরে ভাই, আগে তো নিজের পরকাল নিয়ে সচেতন হোন! তারপরই না অন্যকে পাওয়ার কথা ভাববেন।

আমাদের উচিত, শুরু থেকেই প্রেম-ভালোবাসা নামক শয়তানের ফাঁদটি থেকে ১০০ হাত দূরে থাকা। তারপরও যদি এমন হয়েই যায় যে, কাউকে পছন্দ হলো, এবং তাকে বিয়েও করতে চাই, তখন আমাদের উচিত, সেই মানুষটির ব্যাপারে আল্লাহর কাছে সাহায্য চাওয়া। কিন্তু চাওয়ার ক্ষেত্রে আবার এতটা বেপরোয়া হওয়া যাবে না যে, নিজের ইচ্ছাটাকেই প্রাধান্য দিলাম। এভাবে বললাম—'আমি শুধু তাকেই চাই, আর কাউকে চাই না।' এটা ঠিক না।

বরং বলা উচিত এভাবে—'আল্লাহ, আমি অমুককে নিজের জন্য কামনা করছি। যদি সে আমার জন্য এবং আমার দ্বীনের জন্য মঙ্গলজনক হয়, তাহলে আমাকে দান করুন। আর যদি ক্ষতিকর হয়, তার কথা আমার মন থেকে ভুলিয়ে দিন।'

তা না করে হা-হুতাশ করা, দিনের পর দিন না খেয়ে থাকা, মা-বাবার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করা অথবা পছন্দের মানুষটিকে মনে মনে স্বামী বা স্ত্রী হিসেবে মেনে নিয়ে গুনাহে লিপ্ত হওয়া—এগুলো নিজের দ্বীন ও দুনিয়া নষ্ট করা ছাড়া আর কোনো কল্যাণ বয়ে আনতে পারে না।

নাফরমানি ছেড়ে দিলেই তো হয়!

প্রতিবেশী দুই মহিলার মধ্যে ভালোই সখ্য। অবসর পেলেই একে অন্যের বাসায় ছুটে যান। সুখ-দুঃখের গালগপ্পো করেন। একে অন্যের সুবিধা-অসুবিধায় এগিয়ে আসেন।

দুই মহিলার একজনের বাসায় হঠাৎ করে মেহমান এলো। চাল-ডাল ছাড়া ঘরে সেদিন তেমন কিছুই ছিল না। তিনি গেলেন পাশের বাসায়—

: আপা, বাসায় হঠাৎ মেহমান এসেছে। ঘরে শুধু চাল-ডাল আছে। আপনার কাছে কি ডিম আছে? দুটা ডিম হলে...!

: কী যে বলেন আপা, ডিমই তো চেয়েছেন নাকি? অন্যকিছু তো আর না? দাঁড়ান, এক্ষুনি নিয়ে আসছি।

কদিন পর আবার মেহমান এলো। আজও ঘরের একই অবস্থা। প্রতিবেশীর দরজায় আবারও নক করতে হলো—

: আর বলেন না আপা, হঠাৎ করে আজও মেহমান। আপনার ভাইও বাসায় নেই। কী যে করি!

: বুঝেছি আপা। দুটা ডিম লাগবে, এই তো? দিচ্ছি এখনই।

বিপত্তি ঘটল সেদিন, যেদিন তৃতীয়বারের মতো মেহমান এলো এবং সেদিনও 'ঘরে তেমন কিছুই নেই' বলে প্রতিবেশীর ঘরে ধরনা দিতে হলো—

: আপা, দুটা ডিম কি দেওয়া যাবে? আগেরগুলো-সহ সব একসঙ্গে ফেরত দিয়ে দেবো, প্রমিজ!

আজ আর প্রতিবেশিনী ক্ষীপ্ত না হয়ে পারলেন না—

: আপনার হলোটা কী বলুন তো! আমি কি ডিমের গোডাউন নিয়ে বসেছি? এতই যখন ডিমের প্রয়োজন, বাড়িতে মুরগির খামার দিতে পারেন না?

ওয়াজের মজলিসে এক আলেম ঘটনাটা বলছিলেন। এরপর তিনি বললেন,

: নিজে জীবনভর রবের নাফরমানি করে বেড়াবে, অথচ কোনো সমস্যায় পড়লেই ছুটে যাবে হুজুরের কাছে।

হুজুর, পানি পড়া দিন।

হুজুর, দোয়া করুন।

হুজুর, মিলাদ পড়ে দিন।

কেন ভাই, যিনি দোয়া কবুল করবেন তার নাফরমানি ছেড়ে তাকে রাজি করিয়ে নিলেই তো আর অন্যের কাছে ধরনা দিতে হয় না!

কোনো এক শহরের মানুষেরা খুব পেরেশানিতে ছিল। তাদের বিপদাপদ বালা-মুসিবত দূর হচ্ছে না। বাড়ছেই। দোয়া করলে দোয়াও কবুল হচ্ছে না। কেউ সুস্থতার জন্য দোয়া করছে। কেউ ব্যবসায় বরকতের জন্য দোয়া করছে। কেউ বিপদমুক্তির জন্য... কেউ দোয়া করছে দাম্পত্যজীবনে মহব্বত বাড়ার জন্য। কারও কারও একমাত্র চাওয়া, জালিমের অত্যাচার থেকে মুক্তি।... কাজ হচ্ছে না।

হঠাৎ একদিন জানা গেল, শহরে এক বুজুর্গ আসছেন। তিনি একজন 'মুস্তাযাবুদ্দাআওয়াহ'। যা দোয়া করেন সবই কবুল হয়ে যায়।

বিশাল সমাবেশে তাকে স্বাগত জানানো হলো। সবাই যে যার আর্জি পেশ করল। প্রত্যেকের হৃদয়জুড়ে নানান অভিযোগ আর হাহাকার! সব শুনে তিনি বললেন, 'আমি আজ দোয়া করতে আসিনি।'

'তাহলে?'

'এসেছি এমন এক পদ্ধতি শিক্ষা দিতে, যাতে দোয়া করার জন্য বাইরে থেকে বুজুর্গ দাওয়াত দিয়ে আনতে না হয়। নিজেরাই নিজেদের দোয়া কবুল করিয়ে নিতে পারে।'

লোকদের মধ্যে তোলপাড় সৃষ্টি হলো। 'বলেন কী শায়খ! তাহলে তো ভালোই হয়। অনুগ্রহ করে বলুন, কী সেই পদ্ধতি?'

'হালাল খাওয়া। গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা। দোয়া কবুলের ব্যাপারে দৃঢ়বিশ্বাস নিয়ে দোয়া করা।

চাইতে হবে চাওয়ার মতো

‘নাহ, আল্লাহ আমার দিকে দেখলেনই না!’ কখনো কখনো আমরা এভাবেই হতাশা প্রকাশ করি। নিরাশার কালো মেঘ এসে ভর করে হৃদয়জুড়ে। জীবনটা হয়ে পড়ে বিষাদময়। আল্লাহর কাছে কোনো কিছু চাইতে গিয়ে হতাশ হওয়া যাবে না।

আশরাফ আলি থানভি রহ.-এর বাড়ি থেকে রেলস্টেশন অনেক দূরে ছিল। কোথাও সফরে যেতে হলে দীর্ঘ পথ পায়ে হেঁটে তারপর স্টেশনে যেতে হতো।

তিনি দোয়া করা শুরু করলেন। চাইতে থাকলেন আল্লাহর কাছে। ‘আল্লাহ, এখানে একটা স্টেশনের ব্যবস্থা করে দাও। যেন এই এলাকার লোকজনের যাতায়াতে সুবিধা হয়।’

এক দিন দুই দিন না, দীর্ঘদিন!

দোয়া করতেই থাকলেন। হতাশ হলেন না। হবেনই-বা কেন? আর কোনো দরজা তো নেই! আর কোনো দাতাও নেই। ব্যবস্থাপক তো একজনই।

চাইতে চাইতে বহুদিন গত হলো। একদিন ঠিকই দোয়া কবুল হলো। তৈরি হলো রেলস্টেশন। কিন্তু তার জীবদ্দশায় না। মৃত্যুর পর। তিনি দেখে যেতে পারেননি। তাই বলে কি হতাশ হয়েছেন? হননি। দোয়া করে গেছেন দিনের পর দিন।

তিনি হয়তো উপকৃত হতে পারেননি। কিন্তু তার দোয়ার বরকতে শত শত মানুষের যাতায়াতব্যবস্থা সহজ হয়ে গেছে!

চাইতে হলেও বুঝে শুনে চাওয়া উচিত।

আল্লাহওয়ালাদের চাওয়াটাও হেকমতপূর্ণ ছিল! যেন উদ্দিষ্ট জিনিস পেতে গিয়ে অন্যদের কষ্ট না হয়।

রমজান মাসে মৃত্যু হোক, এই চাওয়া কে না চায়! জাস্টিস তাকি উসমানি হাফিজাহুল্লাহুর বাবা মুফতি শফি রহ. ভাবতেন ভিন্ন ভাবনা। 'রমজান মাসে মৃত্যু হলে, লোকেরা রোজা রেখে আমাকে দাফন করতে গিয়ে কষ্ট করবে, এটা কেমন করে হয়!'

তাই, রমজান মাসে মৃত্যু হোক—এই দোয়া মনে এলেও তিনি করতেন না। একরামের নিয়তে, অন্যের কষ্ট হয়ে ভেবে ছেড়ে দিতেন।

দেখুন, চাওয়াটা কত উন্নত পর্যায়ের ছিল! আমরা চাই; আল্লাহ, বেশি বেশি টাকা-পয়সা দাও! বেতন বাড়িয়ে দাও! খানা দাও! বাড়ি দাও! গাড়ি দাও! ... শুধু আমাকেই দাও!

আমি যদি অন্যদের জন্য চাই, ফেরেশতারা আমার জন্য চাইবে।

আশা রাখতে হয়ে। সেইসঙ্গে ভরসাও। কারণ, চাওয়া পূর্ণ করার ক্ষমতা একমাত্র তাঁরই হাতে। তিনি না দিলে পাওয়ার আর কোনো পন্থা নেই। আজ না হয় পেলাম না। একদিন ঠিকই পাব। হয়তো এখানে, নয়তো ওখানে।

এখানে যতই পাই, নিঃশেষ হয়ে যাবে। ধরে রাখতে পারব না। মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে একদিন ঠিকই হাতছাড়া হয়ে যাবে। চাওয়াগুলো যদি জমা থাকে আল্লাহর কাছে, ওপারে গিয়ে পুরোপুরি পাব। একটুও কমবে না। হাতছাড়াও হবে না। কারণ ওপারের পর আর কোনো 'পার' নেই।

গা ঘেঁষে দাঁড়াবেন না

টেম্পুতে দুই পাশে ছয়জন করে ১২ জন যাত্রী বসেছে। সামনের এক স্টেশনে একজন নেমে গেল। সেই স্টেশন থেকে গাড়িতে উঠল অনিন্দ্য সুন্দরী এক মেয়ে। খালি সিটটাতে বসল।

সিটটা একেবারে দরজার পাশে। মেয়েটা উঠে বসতেই সব যাত্রী একযোগে মেয়েটার দিকে হ্যাংলা চোখে তাকিয়ে রইল। সুন্দরী মেয়েটার ঠিক মুখোমুখি বসা এক যুবক। মেয়েটার গায়ে মাখা পারফিউমের ঘ্রাণ এসে তার নাকে লাগছে। ঘ্রাণের তীব্রতা এত বেশি যে, ছেলেটা ঘ্রাণের উৎসের দিকে না তাকিয়ে পারলই না। একবারই। তাকিয়েই চোখটা নামিয়ে নিলো।

এত সুন্দরী মেয়ে। এত সুন্দরী! চোখ নামিয়ে নিলেও যুবকের আর একটিবার মেয়েটির দিকে তাকাতে ইচ্ছা করছিল। যাত্রীদের মধ্যে বুড়ো বয়সীরাও আছে। বুড়োরাও মেয়েটির দিকে না তাকিয়ে থাকতে পারছে না। একবার না; বারবার তাকাচ্ছে।

যুবকটিও চাইলেই তাকাতে পারত। মুখোমুখিই বসে ছিল মেয়েটা। তাকাতে তেমন বেগ পেতে হতো না। কোনো বাধাও ছিল না। তবুও অনেক কষ্টে মনের অদম্য ইচ্ছাটাকে দমন করল। তার মনে তখন যে জিনিসটা কাজ করছিল সেটার নাম—তাকওয়া। আল্লাহর ভয়।

যুবক ভাবল, কী হবে তাকিয়ে? কোনো লাভ তো নেই! চোখদুটি শীতল হবে হয়তো। মনে এক দারুণ প্রশান্তি অনুভূত হবে, এ-ই তো। এর বেশি কিছু তো না। বিপরীতে, এই পাপের কারণে ইবাদতে মন বসবে না। মেয়েটার চেহারাটা চোখে ভাসবে। বুকটা হুহু করবে। সবচেয়ে বড় কথা, পাপী এই চোখগুলো জাহান্নামের আগুনের ইন্ধন হবে।

ছেলেটা অবশেষে সফল হলো। স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। আধঘণ্টার পুরো পথ মেয়েটার দিকে না তাকিয়ে থাকতে পেরে মনে মনে বলল—আলহামদুলিল্লাহ।

তারুণ্যের আইডল

আমাদের এক প্রতিবেশী ফাইজুর ভাই। যুবক ছেলে। অল্প বয়স। বিদেশে ছিলেন। অল্প বয়সেই রাতারাতি কাড়িকাড়ি টাকার মালিক হয়ে গেলেন! দুই দুইটা পাঁচতলা বাড়ি এবং ব্যাংকভরতি নগদ টাকা ছাড়াও ছিল গাড়ির বিশাল শো-রুম। এলাকার লোকজন তাকে তারুণ্যের আইডল বলে জানত।

আমরা যেমনটা ভাবি। সম্পদ আর নামধামকেই মনে করি সফলতার মাপকাঠি। ফাইজুর ভাইকেও আমরা ভাবতাম সফল ব্যক্তি। এলাকায় এই বয়সে তার মতো পয়সাওয়ালা আর কেউ নেই।

অনেকেই লোকটার প্রতি ঈর্ষান্বিত ছিল। ভাবত, আহ, কী সুখী জীবনযাপন! কোনো টেনশন নেই। দিব্যি দুইহাতে পয়সা কামিয়ে যাচ্ছে। আমারও যদি এমন হতো! আমিও যদি তার মতো দু-চারটা বাড়ির মালিক হতে পারতাম!

'তারুণ্যের আইডল' ফাইজুর ভাই সেদিন দুনিয়া ছেড়ে চলে গেলেন। হঠাৎই। অ্যাকসিডেন্ট করেছিলেন। জীবনের সব উপার্জন দিয়ে বাঁচতে চেয়েছিলেন। পারেননি। পারেও না কেউ।

ইউরোপের ব্যস্ততম রাস্তায় টাকা ওড়াচ্ছিল এক যুবক! ব্যাগভরতি টাকা। চিৎকার করে কী যেন বলছে আর টাকাগুলো দুহাতে উড়িয়ে দিচ্ছে।

জানা গেল এক করুণ কাহিনি। ভদ্রলোকের প্রিয় বন্ধু মারা গেছে। মরণব্যাধি ছিল। বিরাট পয়সাওয়ালা বন্ধু। বন্ধুর তো ছিলই। নিজেরও ছিল অনেক! সবকিছুর বিনিময়ে হলেও বাঁচাতে চেষ্টা করেছে। ব্যর্থ হয়েছে। সম্পদের বিশালতা বন্ধুকে বাঁচাতে পারেনি। তাই সে তুচ্ছ সম্পদ এভাবে বাতাসে উড়িয়ে দিচ্ছে।

চিৎকার করে সে হয়তো এটাই বলছিল, 'চাই না এ সম্পদ, যা আমার বন্ধুর জীবনে কোনো কাজে লাগেনি। চাই না এ অর্থ, যা আমার প্রিয় বন্ধুর জীবনকে অর্থবহ করেনি।'

প্রিয় ভাই!

সফলতা টাকার মধ্যে না। না এটা দামি বাড়ি, গাড়ি আর মহামূল্যবান মোটরবাইকের মধ্যে। সম্পদই সকল সুখের মূল না। অর্থই টেনশনমুক্তির চাবিকাঠি না! কে সফল কে ব্যর্থ, পাঁচতলা বাড়ি কিংবা রোলস রয়েস গাড়ি—সেটা নির্ণয়ের মানদণ্ড না!

সফলতার মানদণ্ড ঈমান আর আমলের ওপর নির্ভরশীল।

আমাদেরই আরেক প্রতিবেশী হয়তো ঈমানের এ মানদণ্ডটা পরিমাপ করতে পেরেছিলেন। যুগে যুগে মহামনীষীরা তো আছেনই, আমাদের চারপাশের জীবন থেকেও আছে শিক্ষার অনেক উপকরণ।

প্রতিবেশী তোফায়েল ভাই। তরুণ বয়সে ডিশের ব্যবসা করতেন। তাবলিগে গিয়ে বুঝলেন, এসব ব্যবসা তার জন্য না। অন্যের পাপের বোঝা নিজের কাঁধে নিয়ে বেড়ানোর কোনো মানে হয় না।

'নাটক-সিনেমা আর নাচ-গানের অশ্লীলতায় মজে থাকবে অন্যরা। সুন্দরী, লাস্যময়ী নায়িকাদের নগ্ন-সৌন্দর্য দেখে দেখে মজা নেবে অন্যজন। আর তার পাপের বোঝা বইতে হবে আমাকে!'

'দরকার নেই।'

লাভজনক সে হারাম ব্যবসা তিনি ছেড়ে দিয়েছিলেন। ব্যবসা শুরু করেছিলেন আরশের মালিকের সঙ্গে। যা তার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিল। তাকে সফল এবং বুদ্ধিমান ব্যবসায়ীতে পরিণত করেছিল।

মাত্র ৩২/৩৩ বছরের এ ভাইটিকে মসজিদে দেখতাম প্রথম কাতারে। নিয়মিত তালিমে বসতেন। দ্বীনি সাথি-ভাইদের মেহমানদারি করতেন। তার আরও গুণ ছিল। দান-খয়রাত করতেন খুব। বুঝে গিয়েছিলেন, ওপারের ব্যাংকে জমা করার সময় হয়েছে। যেতে হতে পারে যেকোনো সময়। কাঙালের মতো চলে যাওয়ার কোনো মানে হয় নাকি! কিছু তো জমা হোক।

তোফায়েল ভাই চলে গেছেন অল্প বয়সেই। আল্লাহ তাকে নিয়ে গেছেন। বড় ঈর্ষণীয় মৃত্যু! মসজিদে আসর পড়লেন। এরপর বসে বসে অনেকক্ষণ পর্যন্ত কুরআন তেলাওয়াত করলেন। মাগরিবের সময় হয়ে আসছিল। কাছেই বাসা। চাইলে বাসায় চলে যেতে পারতেন। কিংবা বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দিয়ে সময় নষ্ট করতে পারতেন। করেননি। মসজিদে

চুপচাপ বসে বসে কী যেন ভাবছিলেন। কেউ জানত না তার সময় ফুরিয়ে আসছে। হয়তো তিনিই বুঝতে পেরেছিলেন।

...মাগরিবের পর মাইকে উচ্চারিত হলো সেই বিশেষ ঘোষণাটি—'...তোফায়েল ইন্তেকাল করেছে।'

বড় দারুণ ব্যবসা তিনি করে গিয়েছিলেন আল্লাহর সঙ্গে। আল্লাহ তাকে-সহ আমাদের সবাইকে ডেকে বলছেন, 'হে ঈমানদারগণ, আমি কি তোমাদেরকে এক লাভজনক ব্যবসার কথা বলে দেবো? যা তোমাদেরকে বিরাট আজাব থেকে বাঁচিয়ে দেবে!'

আমরা হয়তো গাফলতি করছি! শুনেও শুনছি না সে সম্বোধন। তোফায়েল ভাই রবের সে সম্বোধনে সাড়া দিয়েছিলেন। এই ব্যবসায় ইনভেস্ট করার উপকারিতা বুঝতে পেরেছিলেন। অনুভব করেছিলেন, এতে লাভই লাভ।

চার পয়সারও লস নেই।

এখানে ডাকাতি হওয়ার ভয় নেই।

চুরি-ছিনতাই বা অ্যাকাউন্টের পাসওয়ার্ড হ্যাক হওয়ার কোনো আশঙ্কা নেই।

আল্লাহ নিশ্চয় তোফায়েল ভাইয়ের 'ইনভেস্টমেন্ট' কবুল করেছেন। তাকে তার 'মুনাফা' বুঝিয়ে দেওয়ার জন্যই নিজের কাছে ডেকে নিয়েছেন। যেমন করে ডেকে নিয়েছিলেন এ পথে বিনিয়োগকারী অন্যান্য প্রিয় বান্দাদেরকে।

এরাই প্রকৃত অর্থে তারুণ্যের আইডল। আজ মুসলিম তরুণরা আইডল মানে বিধর্মী খেলোয়াড়দেরকে। মূর্তিপূজারি অথবা ধর্মবিদ্বেষী কোনো অভিনেতাকে। খ্রিষ্টান লেখককে। কিংবা নাস্তিক কোনো বিপ্লবী নেতাকে। এসব মুসলিম তরুণ জানে না, উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাহসিকতার ইতিহাস। জানে না উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর দানশীলতার কথা। জানতে চায় না—বেলাল, আম্মার ইবনে ইয়াসার অথবা খাব্বাব রাদিয়াল্লাহু আনহুমদের ত্যাগের কথা।

তারা জানে, কার বোলিংয়ের নৈপুণ্যতায় বাংলাদেশ টেস্ট ক্রিকেটের মর্যাদা পেল। জানে না, কাদের ত্যাগের বিনিময়ে তার মুসলিম হিসাবে পরিচিতি এলো।

মুসলিম তরুণরা জানে, বিশ্বে ধনীদের তালিকায় কোন কোন তরুণ জায়গা করে নিয়েছে। কোন কোন ইউটিউবার তরুণ বয়সেই মিলিওনিয়ার বনে বসে আছে।

জানে না, কোন কোন সাহাবি-তাবেয়ি দ্বীনের জন্য তরুণ বয়সেই প্রাসাদ ছেড়ে রাস্তায় নেমে এসেছে।

প্রিয় তরুণ, আসুন, সেই জান্নাতি তরুণদের অনুসরণ করার চেষ্টা করি!

সফলতার গল্প

ওয়াইফাইের সংযোগ দিতে বাড়ির পাশের 'সংযোগকেন্দ্র' থেকে লোক এসেছে। কথায় কথায় জানতে চাইলাম—

: আপনাদের এখন কতজন গ্রাহক?

ছেলেটার মুখে রাজ্যজয়ের হাসি। গর্বভরা কণ্ঠে বলল—

: অনেক!

: কতজন?

: প্রায় ১ হাজার হবে!

: আয় হয় কেমন?

: ভালোই। প্রতিমাসে একেকজন থেকে কম করে হলেও ৫০০ করে নিচ্ছি। মাসে ৩ লাখ টাকার ওপরে আয় হচ্ছে। অবশ্য, খরচপাতিও আছে! বাসার ছোট্ট একটা ঘর থেকে শুরু করেছিলাম। এখন সেটা বিশাল একটা অফিস আকারে দাঁড়িয়ে গেছে।

: বাহ, ভালোই।

: এই অবস্থানটা এমনি এমনি তৈরি হয়নি। এর পেছনে বিশাল পরিশ্রমের গল্প আছে ভাই!

ছেলেটা নিপুণ হাতে কাজ করে যাচ্ছে। কথা বলতে তার অসুবিধা হচ্ছে না। আমি সেই গল্পটা শোনার জন্য আগ্রহী হলাম। ছেলেটা বলতে লাগল।

: এই পর্যন্ত আসতে অনেক কষ্ট করতে হয়েছে। লম্বা মই নিয়ে রাতের পর রাত দৌড়াতে হয়েছে। কত রাত বৃষ্টিতে ভিজেছি! না খেয়ে থেকেছি। তার, সকেট, সুইচ, রাউটার ইত্যাদি যন্ত্রপাতি কিনতে গিয়ে অনেক টাকা ইনভেস্ট করতে হয়েছে। ...প্রথম প্রথম শুধুই ইনভেস্ট। কোনো উপার্জন আসেনি। জায়গা জমিও বিক্রি করতে হয়েছে। আর এখন? নতুন নতুন লাইন দিচ্ছি আর বসে বসে ইনকাম করছি!

লোকটার কাছে তাদের সফলতার গল্পগুলো শুনছিলাম। সফলতার পেছনের ঘটনাগুলো আসলে এমনই। ব্যবসা জমাতে হলে একটা সময় সবাইকেই কষ্ট করতে হয়। গ্রাহকদের হাতে পায়ে ধরতে হয়। দোকানে দোকানে গিয়ে পণ্যের গুণাগুণ তুলে ধরতে হয়। কখনো কখনো গলাধাক্কাও খেতে হয়।

আল্লাহর দিকে মানুষকে আহ্বান করার কাজটা এর চেয়েও কঠিন! কেউ কেউ সাড়া দেয়, কেউ আবার সটকে পড়ে। 'মুসলমানদের কাছে কীসের দাওয়াত মিয়া? বিধর্মীদের কাছে যাও'—বলে কেউ কেউ তো গলাধাক্কাও দেয়!

যারা এসব সহ্য করে দাওয়াতের কাজ চালিয়ে যেতে পেরেছে, তারা আজ সফল। তাদের কথায় যত মানুষ দ্বীনের পথে চলছে, সবার উপার্জিত সাওয়াবের অংশ সেই 'দাঈ' পাচ্ছেন। কবরে শুয়ে আছে? কোনো টেনশন নেই! সাওয়াব ঠিকই পৌঁছে যাচ্ছে! সুবহানাল্লাহ!

মসজিদের কান্না

মসজিদকে কখনো কাঁদতে শুনেছেন? শোনেননি হয়তো। বরং শিরোনাম পড়ে কেউ কেউ অবাক হয়েছেন। মসজিদ কাঁদে! কীভাবে? এমনটা হয় নাকি!

হয়। অবশ্যই হয়।

বয়সের ভারে ন্যুজ, একাকিত্ব ভর করা কোনো বৃদ্ধকে দেখলে বুঝবেন। কাঁদছে। প্রকাশ্যে না হোক, নীরবে। কেন কাঁদে? কারণ, তার সঙ্গীরা ধীরে ধীরে দূরে সরে গেছে। নতুন কেউ এগিয়ে আসেনি। তাকে সময় দেওয়ার মতো কোনো বন্ধু নেই।

ছেলে হয়তো দামি ঘড়ি এনে দিচ্ছে। মেয়ে এনে দিলো দামি চশমা। ঈদ এলে নাতি-নাতকুররা গিফট করছে দামি দামি জায়নামাজ, আতর-খুশবু আর মাড়-কড়কড়ে দামি পাঞ্জাবি। কিন্তু বৃদ্ধকে দেওয়ার মতো যেটা কারও কাছে নেই; সেটা হলো একান্ত কিছু মুহূর্ত। কথা শোনার মতো নিভৃতে কিছুটা সময়।

মসজিদের কান্নাটা এমনই। নীরবে, নিভৃতে।

কেন কাঁদে মসজিদ?

ফেসবুকে সেদিন দেখি, একজন ছবি-সহ পোস্ট করেছে—'এটা আমাদের মহল্লার মসজিদের ভেতরের দৃশ্য। আপনাদেরটা দেখি!'

কমেন্টসে শত শত মসজিদের ভেতরের দৃশ্য ভেসে উঠল। চমৎকার সব মসজিদ! নিজেদের মসজিদের অসাধারণ সৌন্দর্য প্রকাশ করতে পেরে একেকজন গর্বিত। একেকটা মসজিদের ভেতরের অবস্থা ঈর্ষনীয়! মেহরাবগুলো বিপুল কারুকার্যখচিত। মিম্বারগুলো আরও বেশি আকর্ষণীয়। যেন একেকটা রাজসিংহাসন!

ফ্লোর ও দেয়ালে মহামূল্যবান টাইলস। সৌন্দর্য ঠিকরে বের হচ্ছে। ফ্লোরগুলো আয়নার মতো ঝকঝক করছে। নিচে তাকালে নিজ চেহারা দেখা যাচ্ছে।

এটা হোক, ক্ষতি নেই।

বসবাসের দালানকোঠাগুলোই যেখানে রাজপ্রাসাদের মতো বানানো হচ্ছে, আল্লাহর ঘরগুলো আরও সুন্দর হতে আপত্তি থাকবে কেন। কিন্তু এতেই কি দায় শোধ হয়ে যায়?

না।

পাল্লা দিয়ে, মসজিদ সুন্দর করা গর্বের বিষয়ও না।

দামি টাইলস লাগালাম। পাথর বসালাম। মোজাইক করলাম। দামি ফ্যান, দামি ঝাড়বাতি আর কোটি টাকায় অজুখানা করে দিলেই মসজিদের প্রতি দায় শোধ হয়ে যায় না।

একবার আমরা সফরে বেরিয়েছি। ৪০ দিনের সফর। যেখানে গিয়েছি, সেখানে 'পয়সাওয়ালা' একেকটা মহল্লা! এলাকার অনেকেই লন্ডন-আমেরিকার বাসিন্দা। কাড়িকাড়ি টাকা কামাচ্ছেন। বাড়িঘরগুলো আলিশান!

মসজিদগুলোও দেখার মতো।

এত সুন্দর একেকটা মসজিদ!

সামনে বিশাল বিশাল বাগান। বিরাট মিনার মাথার ওপর উঁকি দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ঝকঝকে তকতকে অজুখানা।

আমাদের আনন্দ লাগার কথা। লাগল না। আনন্দ লাগবে কী করে? মুসল্লি নেই। অজুখানার ড্রেনগুলো শুকিয়ে কাঠ হয়ে আছে। ট্যাংকি ভরা পানি। এক ফোঁটাও খরচ হয় না। কে খরচ করবে? কেউ তো এইমুখো হয়ই না!

কথা বলে জেনেছি, অধিকাংশ মসজিদই হয়েছে টাকার জোরে কিংবা ঝগড়া করে। অথবা, 'তোরই শুধু টাকা আছে? আমার নাই? তোর মসজিদে নামাজ না পড়লে কী হবে রে!'—এই কথার ওপর ভিত্তি করে।

এরকমটা সব জেলাতেই আছে। কম বা বেশি। মুসল্লি নেই। অনেক মসজিদে ইমাম সাহেবও নেই। থাকলেও নামাজে আসেন না। ব্যক্তিগত কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকেন। বেতন কম। অন্য পেশায় যুক্ত না হয়ে উপায় থাকে না। মোতাওয়াল্লি সাহেবও ভাবেন—মুসল্লিবিহীন মসজিদ। বেতন দিয়ে ইমাম রাখব কোন দুঃখে!

ইমামই নেই, মুয়াজ্জিন রাখার তো প্রশ্নই নেই! সত্তরোর্ধ কোনো বৃদ্ধ মুসল্লি এসে তালা খুলছে। আজান দিয়ে সে একা একাই নামাজ পড়ে বের হয়ে যাচ্ছে। না আছে ইমাম, না আছে মুসল্লি।

এসব মসজিদ নিয়মিতই কাঁদে। একাকিত্বই তার কান্নার কারণ। মসজিদের এ কান্না শোনা যায় না। অনুভব করা যায়। মুসল্লি যদি না বাড়ে, মসজিদগুলো বিরান হতে থাকবে। বিরান, মুসল্লিশূন্য মসজিদ কেয়ামতের দিন কেঁদে কেঁদে আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ জানাবে—আমার কাছে কেউ আসেনি।

মসজিদে মুসল্লি বাড়ানোর মূল উপায় হলো—দাওয়াত। প্রতিদিন কিছু না কিছু সময় দাওয়াতের কাজ করা চাই! নিজেও নামাজের প্রতি যত্নবান থাকব, অন্যকেও দাওয়াত দেবো। ইনশাআল্লাহ।

হেরে যাচ্ছি আমি, জিতে যাচ্ছে শয়তান

আমার পরিচিত এক ভদ্রলোক প্রচণ্ড টিভিপাগল ছিলেন। সারাক্ষণ টিভির সামনে বসে থাকতেন। নাটক, সিনেমা, খবর, কোনো কিছুই তার দৃষ্টি থেকে বাদ যেতে পারত না।

ভয়ংকর ব্যাপার হলো, ভদ্রলোক টেলিভিশন দেখতে দেখতেই দুনিয়া থেকে বিদায় নিলেন। একবার ভাবুন, সিনেমা দেখতে দেখতে মৃত্যু! নিশ্চয় উত্তম মৃত্যু নয়!

আমাদের গ্রামের এক বৃদ্ধা মহিলা। ষাটের বেশি বয়সী। লাঠিতে ভর দিয়ে হাঁটতেন। তার মৃত্যুটাও এমনভাবেই হয়েছিল। রাতের বেলা। নিজেদের ঘরে টিভি নেই। পাশের বাসায় গেলেন। টিভিতে তখন জনপ্রিয় কোনো এক টিভিসিরিয়াল চলছিল। উত্তেজনাকর একটা মুহূর্তে মহিলার স্ট্রোক হলো। ঘরে নিতে নিতে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই মৃত্যু।

এই দুটো মৃত্যুকে কি আমরা কেউ 'ঈমান নসিব হওয়া মৃত্যু' বলব? মনে হয় না। ঘটনাদুটি আমি শুনেছি অনেক পরে। শুনেই আমার কলজে কেঁপে উঠেছিল। অজান্তেই 'ইশ' শব্দটা মুখ থেকে বেরিয়ে এসেছিল।

জানি, এখন যারা এই লেখাটি পড়ছেন, তারাও মনে মনে বলছেন, 'ইশ! কত জঘন্যতম মরণ। এই দুজনের কপালটাই খারাপ ছিল। নইলে কি সিনেমা আর সিরিয়াল দেখতে দেখতে মরে?'

শুধু এই দুজনই না। এমন অনেকেরই পাপের এঁদোমাটিতে ডুবে থাকতে থাকতে বিদায় নিতে হয়েছে। তওবা নসিব হয়নি। ক্ষমা চাওয়ার সুযোগ হয়নি। তাদের মৃত্যু দেখে জীবিতরা অনেকেই নিশ্চয় আফসোস করেছে! নাকসিটকে বলেছে, 'জঘন্য। নিশ্চিত জাহান্নামি'।

কিন্তু এই ঘটনাগুলো জানার পর কেউ কি টিভি দেখা ছেড়ে দিয়েছে? স্মার্টফোনের মেমোরি থেকে সিনেমাগুলো ডিলিট করে দিয়েছে? কিংবা ইউটিউবে ন্যুড-নর্তকির উদ্দাম নৃত্যের তালে বুঁদ হয়ে থাকা থেকে কি বিরত হয়েছে? কেউ কেউ হয়েছে হয়তো। কিন্তু অধিকাংশই আগের অবস্থায় রয়ে গেছে। কোনো পরিবর্তন আসেনি।

হাইওয়ে দিয়ে প্রচণ্ড স্পিডে একটা মাইক্রোবাস ছুটে চলছে। পিকনিকের গাড়ি। ভেতরে কয়েকজন যুবক-যুবতি হইহুল্লোড় করছে। গান বাজছে, নাচ চলছে।

অথবা উত্তাল সাগরে প্রমোদতরী নিয়ে বের হয়েছে উচ্ছৃঙ্খল ছেলেছোকড়ার দল। উন্মত্ত হয়ে নেচে গেয়ে আনন্দ করছে। জগতের কোনো কিছুর প্রতি তোয়াক্কা নেই।

আমরা তখন মনে মনে বলি, 'এই লোকগুলোর কি মরার ভয় নাই! যে কোনো সময় অ্যাকসিডেন্ট হতে পারে। এত রিস্কি জার্নি করছে, তবুও আল্লাহকে ভয় করছে না। এই মুহূর্তে মরে গেলে কী উপায় হবে, কোনো হুঁশ আছে?'

অথচ আমার জীবনটাও রিস্কের ওপরই আছে। ঘরে শুয়ে শুয়ে মোবাইলে নাচগান দেখছি, আমিও মরে যেতে পারি। কত আজেবাজে কাজে অযথা সময় নষ্ট করছি, ওই মুহূর্তে আমারও বিদায় ঘণ্টা বেজে যেতে পারে। পরনিন্দা, গিবত, শেকায়েতে লিপ্ত আছি, তখনই আজরাইল আলাইহিস সালাম এসে যেতে পারেন।

গাড়িতে কিংবা বাড়িতে পাপে ডুবে থাকা অবস্থায় যে আমিও চলে যেতে পারি—এই ভাবনাটা মাথায়ই নেই। শয়তান এই ভাবনা থেকে ভুলিয়ে রেখেছে। হেরে যাচ্ছি আমি, জিতে যাচ্ছে শয়তান!

সিসি ক্যামেরা

ঈদের সিজন। আপনার দোকানে প্রচুর বেচাকেনা। চার-পাঁচজন কর্মচারী রাত-দিন খেটেও কাস্টমার সামলাতে হিমশিম খাচ্ছে! এত বেচাকেনা যে, খাবার খেতেও সময় পাচ্ছেন না। আপনিও না, কর্মচারীরাও না।

ঈদ যতই ঘনিয়ে আসছে, চাপ যেন ততই বাড়ছে। রোজার আগে ব্যাংকে জমানো সব টাকায় নতুন করে মাল উঠিয়েছেন। বেচাকেনার চাপ বাড়তে থাকায় মহাজনদের কাছ থেকে কয়েক লাখ টাকার মাল বাকিতেও আনতে হয়েছে।

এই মুহূর্তে বাকি আনতে টেনশন নাই। যত মালামালই হোক, মহাজনরা নিশ্চিন্তে আপনাকে বাকি দিচ্ছে। কারণ, তারা জানে, এই টাকা আপনি ১৫ দিন বেচাকেনা করেই পরিশোধ করতে পারবেন। আপনাকে একটুও বেগ পেতে হবে না।

মাল আনছেন। বিক্রি করছেন।

ক্যাশভরতি টাকা আসছে। সেই টাকায় আবার মাল। আবার বিক্রি। আবার টাকা। আবার মাল... আনন্দে আপনার চোখদুটো চিকচিক করছে!

চিকচিকে চোখে দোকানের যেদিকেই তাকান, শো-কেস, র‍্যাক, ডিসপ্লেগুলো মালামালে ভরপুর। খুশিতে আটখানা হবেন, নাকি দশখানা হবেন ভাবতে ভাবতেই ঘটে গেল অচিন্তনীয় দুর্ঘটনাটা।

চাঁদ রাতের এক সপ্তাহ আগে। সারা দিন বিপুল বেচাকেনা শেষ করে বুকভরা আনন্দ আর প্রশান্তি নিয়ে বাসায় গেলেন। মনে বিরাট আশা। 'আরও তো এক সপ্তাহ আছে! সারা মাস যা হয়েছে, এই এক সপ্তাহে এর ১০ গুণ বেশি বেচাকেনা হবে। আমাকে আর ঠেকায় কে!'

বাসায় গিয়ে, ফ্রেশ হয়ে, খেয়েদেয়ে বিছানায় গেলেন। ঘুমিয়েও পড়লেন দ্রুতই। ভোররাতে কেউ একজন ফোন করে জানাল সেই দুঃসংবাদটা—'দোকানে ডাকাতি হয়েছে!'

আপনি চমকে উঠে বললেন, 'কী বলছেন? ডাকাতি হয়েছে মানে? কার দোকানে?'

'আপনার দোকানে। ডাকাতরা দোকানের সব মালামাল লুট করে নিয়ে গেছে।'

কীসের ঘুম কীসের কী? আপনার মাথা ঘুরে গেল। ছুটে গেলেন দোকানে। ঘাবড়ে গেলেন। ঘটনা সত্যি। দোকানের তালাগুলো ভাঙা। ভেতরের র‍্যাক আর শোকেস ছাড়া আর কিছু অবশিষ্ট নেই। সবকিছু নিয়ে গেছে।

কারা করল কাজটা?

কর্মচারীদেরই কেউ?

নাকি বাইরে থেকে আসা লুটেরাদল?

ছুটে গেলেন মনিটরের সামনে। সিসি ক্যামেরার ভিডিয়ো ফুটেজই প্রমাণ দেবে কে অপরাধী!

ভিডিয়ো ফুটেজ দেখে আপনার মাথা ঘুরে গেল। মনিটরে আপনি এমন একজনকে দেখতে পেলেন, যাকে কখনোই এই কাজে আশা করেননি। আপনার দোকানের সবচেয়ে বিশ্বস্ত কর্মচারী! যাকে আপন ভেবে বিশ্বাসের আসনে বসিয়েছিলেন, সে যে এমনভাবে আপনার বিশ্বাসকে ধুলোয় মিশিয়ে দেবে, কল্পনাও করতে পারেননি।

কষ্টে আপনার বুক ফেটে গেল। ছোট থেকে তাকে আপনি আপন ভাইয়ের মতো বড় করেছেন। নিজে না খেয়ে তাকে খাইয়েছেন। সব রকমের সুযোগ-সুবিধা দিয়ে এসেছেন সবসময়। ছুটি চাইলে ছুটি, টাকা চাইলে টাকা। চিকিৎসা ব্যয়, সংসার খরচ, নিত্যনতুন জামা-কাপড়—কী দেননি!

মনিব আর কর্মচারীর ব্যবধান বুঝতে দেননি কখনো। সেই ছেলে কিনা এভাবে আপনাকে ধোঁকা দিলো!

চারিদিকে লোক লাগালেন। যেকোনো মূল্যে তাকে ধরে আনতে হবে। পুলিশে খবর দিতে চাইলেন না, পুলিশ যদি ছেড়ে দেয়! আপনার এতটাই জেদ চেপেছে, কুলাঙ্গারটাকে নিজ হাতে শাস্তি দেবেন বলে সিদ্ধান্ত নিলেন।

লুণ্ঠিত মালামাল ফেরত পান না পান, আফসোস নেই। আগে তো নিমকহারামটা ধরা পড়ুক! ওর একদিন কী আপনার একদিন।

২৪ ঘণ্টার মধ্যে ধরা পড়ে গেল সে। বেঁধে ফেললেন গোডাউনে। হাত-পা না-ভাঙা পর্যন্ত শান্তি নেই আপনার। লুটপাট করেছে, আপনার মতো রহমদিল মনিবের বিশ্বাসের অমর্যাদা করেছে, শাস্তি সে অবশ্যই পাবে। দিলেনও কঠিন থেকে কঠিনতর শাস্তি। ইচ্ছামতো পেটালেন।

কর্মচারীকে পেটালেই হবে না মশাই, আসুন এবার নিজেকে নিয়েও একটু ভাবি! আমি-আপনিও কিন্তু একজন মনিবের গোলাম! প্রতিদিন কত অন্যায় করে চলেছি। অবলীলায় অমান্য করছি কতশত আদেশ! যে পথে চলতে নিষেধ করেছেন আমাদের রব, বড় আনন্দ নিয়ে সে পথেই যেন বেশি চলছি!

আপনার আমার চেয়ে হাজারগুণ বেশি দয়ালু আল্লাহ ক্ষমার পর ক্ষমা করেই যাচ্ছেন। এত নাফরমানির পরেও বঞ্চিত করেননি এক ফোঁটা পানি থেকে। না খাইয়ে রাখেননি একবেলাও। সুস্থ রাখছেন। কাজ করার শক্তি দিচ্ছেন। চলা, বলা, ধরা, দেখার সক্ষমতা দিচ্ছেন।

আমাদের দুই কাঁধেও দুটা সিসি ক্যামেরা বসানো আছে। আমাদের চলা, বলা, দেখা, শোনা সবকিছু তাৎক্ষণিক সেখানে রেকর্ড হয়ে যাচ্ছে। এই দুই ক্যামেরার পরিচালক—মহান আল্লাহ সব দেখছেন। সৎ অসৎ বোঝার ক্ষমতা তিনি আমাদের দিয়েছেন, কী করছি না করছি সবই তিনি দেখতে পাচ্ছেন।

'অসৎ কিছু করেও পার পেয়ে যাচ্ছি' ভেবে আনন্দিত হওয়ার কোনো কারণ নেই। জীবন ঘুড়ির নাটাই তো তাঁরই হাতে। ঢিল দেওয়া সুতোয় হঠাৎ হেঁচকা টান পড়ার আগেই ভেবে নিন কোন পথে উড়বেন!

ধরা খাওয়ার আগে

কাকডাকা ভোর। যাত্রাবাড়ী মাছের আড়ত। মাছে-মানুষে গিজগিজ করছে। দূরদূরান্ত থেকে এসেছে ব্যবসায়ীরা। পাইকারি মাছ কিনে নিজ এলাকায় গিয়ে খুচরা দামে বিক্রি করবে। আড়তদাররা প্রচণ্ড ব্যস্ত। হাঁকডাকে সরগরম মাছের বাজার। পুরো শহরে এই সময় নিস্তব্ধতা বিরাজ করলেও এখানটার অবস্থা ভিন্ন। এখানকার ভোরগুলো যেন মধ্যদুপুর!

দূরের গ্রাম থেকে মাছ কিনতে এসেছে এক ক্ষুদে ব্যবসায়ী। কোমরে টাকার ব্যাগ। মাছ দেখছে। এই গদি থেকে ওই গদি ঘুরছে। মাছের দাম আজকে অনেক বেশি। দামের জন্য কাছেই যাওয়া যাচ্ছে না। বেচারার মন খারাপ। এত দাম দিয়ে মাছ কিনতে হলে, বিক্রি করবে কত? কাস্টমাররা তো দামই বলতে চাইবে না। কাঁচা জিনিস বিক্রি করার অনেক ঝামেলা। একটু পচে গেলেই মূল্য থাকে না। লস হয়।

লোকটা মাছ দেখছিল আর একটু পরপর কোমরে বাঁধা টাকার ঝুলিটার দিকে বিশেষ নজর রাখছিল। যেন চুরি না হয়ে যেতে পারে। মাছ দেখতে দেখতে যেই না অন্যমনস্ক হয়ে গেল, হঠাৎ চারিদিকে হইচই শুনতে পেল, 'ধর...ধর...।'

লোকটা হকচকিয়ে গিয়ে কোমরে হাত দিতেই দেখল ঝুলিটা নেই! ছিনতাইকারী ছোঁ মেরে নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে। আর তাকেই সবাই চিৎকার করে 'ধর ধর' বলে ধাওয়া করেছে। মাছওয়ালাও দৌড় শুরু করল। যে-ই জানতে চাচ্ছিল, 'কী হয়েছে?' লোকটা বলছিল, 'ছিনতাইকারী আমার টাকার ব্যাগ নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে!'

পাশেই ঢাকা-চিটাগাং হাইওয়ে। বাস চলছে। ছিনতাইকারী দেরি করেনি। পাবলিকের ধাওয়া খেয়ে দৌড়ে গিয়ে দ্রুতগামি একটা বাসে উঠে পড়েছে। এখন আর তাকে পায় কে!

ধরুন, দুর্ঘটনাক্রমে আপনার হাতেও একই ধরনের একটা ব্যাগ। পরনেও একই রঙের জামা। আপনিও বাস ধরার জন্য দৌড়াচ্ছিলেন। ভাগ্য খারাপ। লোকজন আপনাকেই ছিনতাইকারী মনে করে ধরে ফেলল। ধরেই

আর দেরি করল না। পাবলিকের উত্তম মাধ্যম বলে কথা। আপনার কোনো প্রতিবাদই তারা কানে নিলো না। মুহূর্তেই আপনাকে কঠিন মার লাগাল। প্রকৃত চোর বেঁচে গেল অথচ চুরির দায়ে মার খেলেন আপনি। কেমন লাগবে আপনার? নিশ্চয় অপমানিত বোধ হবে! পরিচিত কেউ দেখে ফেললে তো কথাই নেই। ইজ্জতের বারোটা বেজে যাবে।

প্রিয় ভাই, হাশরের ময়দানেও এভাবেই আমাকে-আপনাকে 'ধর ধর' বলে ধাওয়া করবে। আজকে হয়তো ভুল বিচারে মার খেলেন, কিন্তু সেদিন সেখানে ভুল বিচার বলে কিছুই থাকবে না। স্ত্রী বলবে, 'ধর ধর!'

'কেন, কী করেছে?'

'সে আমার স্বামী। আমাকে ভরণপোষণ দিয়েছে ঠিকই, কিন্তু কোনোদিন আমাকে দ্বীনের পথে চলার জন্য তাগিদ দেয়নি। তরকারিতে লবণ বেশি হলে কিংবা সময়মতো তার প্রয়োজনে হাজির হতে না পারলে মারধর করেছে। কটুকথা শুনিয়েছে। কখনো কখনো বাপের বাড়িও ভাগিয়ে দিয়েছে। কিন্তু নামাজ ত্যাগ করার জন্য কিংবা পর্দা না করার জন্য কোনোদিন আমাকে তিরস্কার করেনি!

ছেলে বলবে, 'ধর ধর!'

'কে ইনি? কী করেছে?'

'ইনি আমার বাবা। পড়াশোনায় গাফলতি করার কারণে বহুবার মেরেছে। পরীক্ষায় রেজাল্ট খারাপ করেছি বলে বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছে। রাত করে বাড়ি ফিরলে খাবার বন্ধ করে রেখেছে। কিন্তু কোনোদিন বলেনি, 'আজকে নামাজ পড়নি, সুতরাং তোমার খাওয়া-দাওয়া বন্ধ। আজকে তেলাওয়াত করনি, নাশতা বন্ধ। দ্বীন মানতে গাফলতি করেছ, বাড়ি ঢোকা বন্ধ।'

বন্ধু বলবে, 'ধর ধর!'

'কী হয় আপনার?'

'প্রিয় বন্ধু। সে শুধু নিজেই চলেছে দ্বীনের পথে। আমাকে কখনো দাওয়াত দেয়নি। একসঙ্গে চলেছি। কখনো সেন্টমার্টিনে, কখনো কক্সবাজারে, কখনো সাজেকভ্যালি—কত জায়গায় ঘুরেছি! একসঙ্গে কত আড্ডা দিয়েছি! কিন্তু আজান হলে সে ঠিকই মসজিদে চলে যেত, আমাকে

কখনো যেতে বলেনি। সে কুরআন শিখেছে, আমাকে শিখতে উৎসাহ দেয়নি।

আটকে দেওয়া হবে রাষ্ট্রপ্রধানকেও। 'ধর ধর!'

'কেন? সে তো তোমাদের রাষ্ট্রপ্রধান ছিল। সে আবার কী দোষ করল?'

'কী করেনি সে? ক্ষমতার বলে আমাদের হক মেরে খেয়েছে। গরিবদের সম্পদ লুটে নিয়েছে। উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ভোট নিয়েছে, কিন্তু কাজের কাজ কিছুই করেনি। নিজের পকেট ভারী করেছে, কিন্তু জনগণ না খেয়ে মরলেও সেই দিকে ভ্রুক্ষেপ করেনি।'

কর্মচারী আটকে দেবে মালিককে। 'আমার কাছ থেকে কাজ আদায় করেছে পুরোপুরি। বেতনও দিয়েছে ঠিকমতোই। কিন্তু আল্লাহর হুকুমের দিকে আহ্বান করেনি। কত ইবাদত ছুটে গেছে দিনের পর দিন, কখনো ভ্রুক্ষেপই করেনি। কাজে অলসতা করলে গালমন্দ করেছে, কিন্তু ইবাদতে অলসতা করায় কোনোদিন চোখটাও রাঙায়নি। সে তো আমার মালিক ছিল। আমি ছিলাম গোলামের মতো। সে যদি দ্বীনের পথে চলতে নির্দেশ দিত, নিশ্চয় তার কথা মেনে চলতাম। কিন্তু না। করেনি নির্দেশ।'

প্রিয় ভাই, প্রত্যেক কর্তাব্যক্তিই তার অধীনদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে। মালিক তার কর্মচারীদের ব্যাপারে, স্বামী তার স্ত্রীর ব্যাপারে, বাবা তার সন্তানদের ব্যাপারে, রাষ্ট্রপতি তার প্রজাদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে।

এরপরও কি অধীনদের ব্যাপারে আমরা উদাসীন থাকব?

বেঁচে গেলেই ভুলে যাই

মরতে মরতে বেঁচে যাওয়া লোকদের দেখেছেন কখনো? দেখেছেন নিশ্চয়। আমি দেখেছি। আমার বাড়ির পাশেই এক ভদ্রলোকের তিনতলা বাড়ি। এলাকার মান্যগণ্য মানুষ। রাজনীতিবিদ। প্রতিবারই নিজের দলের হয়ে নির্বাচনে অংশ নেন। কোনো না কোনো কারণে জেতা হয় না। হেরে যান।

ভদ্রলোকের হঠাৎ হার্টঅ্যাটাক হলো। সুস্থ মানুষ। বিকেলেও পার্টি অফিসে মিটিং করেছেন। রাতেই হাসপাতালে।

পাঁচ দিন শেষে আইসিইউ থেকে ফেরত দিয়ে ডাক্তাররা বললেন, 'শেষ চেষ্টা হিসাবে দেশের বাইরে কোথাও চিকিৎসা করিয়ে দেখতে পারেন।'

মাদ্রাজে নিয়ে যাওয়া হলো। চিকিৎসা চলাকালীনই আবার অ্যাটাক। আমাদের মহল্লার মসজিদে তার জন্য দোয়া চাওয়া হলো। ইমাম সাহেব বললেন, 'সাহেব সবার কাছে দোয়া চেয়েছেন। অবস্থা খুবই খারাপ। সবাই দোয়া করবেন।'

এক সপ্তাহ পরের ঘটনা। আমি ভদ্রলোককে মসজিদে দেখে অবাক হলাম। মাত্র এক সপ্তাহের ব্যবধান। মুমূর্ষু রোগী। অ্যাটাকওয়ালা। আইসিইউ ফেরত। বিদেশ পর্যন্ত যেতে হওয়া রোগী। একেবারে সুস্থ! বরং আগের চেয়েও সুঠাম-সাবলীল!

এটা কে করেন?

কোনো ডাক্তার?

কবিরাজ?

ফার্মাসিস্ট?

অ্যালো-হোমিও-ইউনানি?

না। কেউ না। মরতে মরতে বেঁচে যাওয়া রোগীদের ফিরিয়ে আনার শক্তি কেবল একজনেরই। আমরা নিঃসংকোচে, শ্রদ্ধাভরে উচ্চকিত কণ্ঠে বলতে পারি—তিনি আল্লাহ!

এবার, ফিরে আসা রোগীদের দেখুন! খুব কম রোগীই ফিরে এসে আল্লাহকে মনে রেখেছেন। তার করুণা এবং দয়াকে শ্রদ্ধা দেখিয়েছেন। এমনও আছে, সুস্থ হওয়ার পর আল্লাহর নাফরমানি আগের চেয়েও চরম গতিতে বাড়িয়ে দিয়েছেন।

পরের ঘটনাটা দেখুন।

আমাদের গ্রামের পাশে, নদীর পাড়ের বাজারে একসময় আমাদের দোকান ছিল। সবাই এক নামে 'হুজুরের দোকান' বলে চিনত। আমার আব্বা মূলত হুজুর না। জেনারেল শিক্ষিত মানুষ। দ্বীনের পথের কল্যাণে তার চেহারা-সুরত, পোশাক-আশাকে পরিবর্তন এসে গিয়েছিল।

আমাদের সেই দোকানে জামা-কাপড় থেকে নিয়ে ঘড়ি, কসমেটিক্স ইত্যাদি প্রায় সব জিনিসই পাওয়া যেত। অনেকটা বর্তমান সময়ের সুপার শপের মতো।

ফারুক নামে এক ঘড়িমেকার প্রায়ই বিকেলবেলা আমাদের দোকানের পাশে ছোট্ট টেবিলটায় বসত। অনেকেই ঘড়ি ঠিক করাতে আসত এই সময়। ফারুক মেকার ছিল বড্ড চালাক লোক! ভুংভাং দেখিয়ে, ভালো ঘড়িও নষ্ট বানিয়ে ফেলে পাবলিকের কাছ থেকে মাত্রাতিরিক্ত পয়সা কামিয়ে নিত।

২০ টাকায় আমাদের কাছ থেকে ব্যাটারি কিনে, সেই ব্যাটারি কাস্টমারের কাছে জাপানি বলে চালিয়ে দিয়ে ৬০-৭০ টাকা হাতিয়ে নিত। আড়ালে আবডালে এজন্য অনেকেই লোকটাকে ডাকত—'চিটার ফারুক' বলে।

কাউকে এক হাটে কিনে আরেক হাটে বিক্রি করে ফেলা তার কাছে ছিল ডালভাত মাত্র। একবেলায় চার-পাঁচশ টাকা কামিয়ে নেওয়া তার কাছে কোনো ব্যাপারই ছিল না। কিন্তু কথায় আছে—

হারামের আরাম নাই।

বেইমানের নিস্তার নাই।

চিটার ফারুকের সংসারেও আরাম ছিল না। সবসময় ঝগড়াঝাঁটি লেগেই থাকত। ওর সহজ সরল বাবা প্রায়ই আব্বার কাছে এসে এটা-সেটা নালিশ করত ওর বিরুদ্ধে। বলত, 'ছেলেটাকে আপনাদের সঙ্গে তাবলিগে নিতে পারেন কিনা দেখেন। ওর জ্বালায় তো সমাজে আর মুখ দেখাতে পারছি না!'

নামাজ-রোজার কথা বললে, ফারুক বলত, 'হুজুর, এই বয়সে নামাজ ধরব পাগলে পাইছে? আপনারাই পড়েন... দোয়া কইরেন... ।'

এই করেই চলছিল চিটার ফারুকের দিনকাল। দিনে দিনে ওর বাটপারির মাত্রা যেমন বাড়ল, তেমনই বাড়তে লাগল শত্রুসংখ্যাও।

হঠাৎ করে একদিন চিটার ফারুক কোথায় যেন হাওয়া হয়ে গেল! বাজারেও আসে; না দোকানের সেই ছোট্ট টেবিলটাতেও আর বসে না। ঘড়ি ঠিক করতে আসা লোকজন ঘুরেফিরে চলে যায়।

একদিন। দুই দিন। তিন দিন।

ফারুকের কোনো পাত্তা নেই। চারিদিকে গুম আর খুনের যে দৌরাত্ম্য, সবাই বলাবলি করছিল, 'মনে হয় ব্যাটা গুমই হয়ে গেল!'

র‍্যাবের হাতে ক্রসফায়ারের ব্যাপারটাও উড়িয়ে দেওয়ার মতো ছিল না।

হঠাৎ এক সকালে বাজারের পাশে নদীর পাড়ের লঞ্চ টার্মিনালের বেঞ্চে পাওয়া গেল চিটার ফারুককে।

কিন্তু একী অবস্থা!... মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি মাথায় টুপি গায়ে রেডিমেড পাঞ্জাবিতে এ কোন ফারুক। চিটারের হঠাৎ এত পরিবর্তন? নাকি নতুন কোনো ফন্দি ফিকিরের ধান্দা?

কী জানি!

ওকে তো বোঝা মুশকিল!

দিনশেষে জানা গেল আসল ঘটনা। সেদিন বাড়ি থেকে বেরিয়ে বাজারের দিকেই আসছিল চিটার ফারুক। পথে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে মাথা ঘুরে পড়ে গিয়েছিল। লোকজন ধরাধরি করে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে গেল। ডাক্তারি পরীক্ষায় 'ক্যান্সার' ধরা পড়ল ফারুকের। ডাক্তার বললেন, 'রোগীকে ভালো মন্দ যা খেতে চায় খাইয়ে দিন।'

পাশে বসা চিটার ফারুকের বউ ভয়ার্ত গলায় জানতে চাইল, 'কেন, ডাক্তার সাহেব? আমার স্বামীকে কি বাঁচানোই যাবে না!'

'সম্ভাবনা দেখছি না। মনকে শক্ত করুন। আল্লাহকে ডাকুন। আপনার স্বামী আর বেশি দিন পৃথিবীর আলো দেখতে পাবেন না। বড়জোর দুই মাস!'

সেই থেকে ফারুকের আল্লাহকে ডাকা শুরু। আজানের ১০ মিনিট আগে থেকেই বাজারের লোকজনকে নামাজের দিকে ডাকতে থাকে। ফজরের সময় ফারুকের হাঁকডাকে কে আবার ঘুমিয়ে থাকে!

আমাদের দোকানের সেই ছোট্ট টেবিলটায় এখনো বসে, তবে এখন আর চায়না ঘড়ির ব্যাটারিকে জাপানি বলে চালিয়ে দেয় না। ভুজং ভাজং করে ভালো ঘড়িকে নষ্ট বানিয়ে ফেলে অতিরিক্ত পয়সা হাতিয়ে নেয় না।

তাবলিগে যাওয়ার জন্য নাম লিখিয়ে দেয়। যাকে তাকে, যখনতখন সালাম-মুসাফাহা করে মাফ চেয়ে নেয়। তার এই পরিবর্তনে সবাই খুশি! তবে এই পরিবর্তন মৃত্যুর ভয়ে নাকি আল্লাহর ভয়ে, সেটাই বোঝা মুশকিল ছিল!

মানুষ যখন সৎ পথে চলে, সকল প্রাণী তার জন্য দোয়া করতে থাকে। এই দোয়ার কল্যাণেই কিনা, ফারুক এক কবিরাজের সন্ধান পেয়ে গেল। কবিরাজ ফারুককে আশ্বাস দিলো, মৃত্যুকঠিন এই ক্যান্সার থেকে চিরমুক্তি দিতে পারবে! চিটার ফারুক তো মহাখুশি! সেই সাথে তার পরিবারও!

এরপর... আবার...

চার-পাঁচ দিন চিটার ফারুক লাপাত্তা। হঠাৎই আবার আগমন। এবার আর তার চোখে-মুখে মৃত্যুর ভয় নেই! ফুরফুরে চলনবলন। শরীর থেকে খসে পড়েছে শুভ্র-সুন্দর পাঞ্জাবি। মাথা থেকে নেমে পড়েছে টুপিও! মুখের দাড়িও ক্লীন শেভড! আবার আগের সেই চিটারি মূর্তি!

মসজিদে আসরের আজান হলো। ফারুক আর টেবিল থেকে নড়ে না। অন্যকে নামাজে ডাকবে দূরে থাক, এখন বলে, 'কবিরাজটা খুব দক্ষ ছিল! তার চিকিৎসায় এ যাত্রায় বেঁচে গিয়েছি!

...চিটার ফারুক বুঝে ফেলেছে, বিপদ কেটে গেছে। এখন আর আল্লাহকে না ডাকলেও চলবে। ঠিক যেন ঝড়ের কবলে পড়া জাহাজের যাত্রীদের মতো। ঝড় শুরু হলো। জাহাজ ডুবুডুবু। মৃত্যুর ভয়ে আল্লাহকে ডেকে ডেকে গলা শুকিয়ে ফেলা।

ঝড় শেষ। মৃত্যু ভয় নেই!

এখন বলা শুরু—'সারেংটা বড় দক্ষ ছিল! তাই এই যাত্রায় রক্ষা পেয়েছি!'

কী অদ্ভুত চিন্তাভাবনা! এই যাত্রাই যেন শেষ! 'অনন্তযাত্রা' বলে আর কোনো যাত্রাই যেন বাকি নেই!

অপমৃত্যু

একটা অপমৃত্যু দেখলাম কিছুক্ষণ আগে। সুস্থ-সবল তরুণ একটা ছেলে। রাস্তার পাশের ফুটপাত দিয়ে নিশ্চিন্তে হেঁটে যাচ্ছিল। কোথা থেকে যেন একটা মিনিবাস এসে ফুটপাতের ওপর উঠে গেল। ছেলেটা স্পটডেড। লোকজন জমে গেল। মাথাটা থেঁতলে গেছে। তাকানো যাচ্ছে না। কেউ একজন বীভৎস মাথাটা একটা ছেঁড়া ন্যাকড়া দিয়ে ঢেকে দিলো।

আসুন ছেলেটিকে নিয়ে একটু কল্পনার জগতে বিচরণ করি।

বাসা থেকে বের হওয়ার সময় ব্যাগটা গুছিয়ে নিলো সে। নীল রঙের টিশার্টটা গায়ে দিলো। ইস্ত্রি করা প্যান্টটা পায়ে গলিয়ে ড্রয়ার থেকে বের করল প্রিয় পারফিউমটা। গায়ে স্প্রে করে নিলো।

জুতা পরল।

মানিব্যাগটা পকেটে ঠিকঠাক আছে কি না দেখে নিলো। পকেটে ঢুকিয়ে নিলো স্মার্টফোনটা। সবশেষে মাকে ডেকে বলল, 'মা, আমি গেলাম! দরজাটা লাগিয়ে দিয়ো!'

মা ছেলেকে বিদায় জানালেন—'আচ্ছা, যা বাবা! রাত করিস না কিন্তু! তাড়াতাড়ি ফিরিস!'

ছেলে আর পেছনে তাকাল না। দ্রুতপায়ে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে এলো। ছেলেটা হয়তো ভার্সিটিতে যাচ্ছিল। অথবা বন্ধুর সঙ্গে দেখা হওয়ার কথা ছিল। হতে পারে কোনো মেয়েবন্ধুর সঙ্গে 'ডেট' ছিল। বাসা থেকে বের হওয়ার সময় কি সে ভেবেছিল, কারও সঙ্গেই আর কখনো দেখা হবে না!

বন্ধুরা কি ভেবেছিল, আড্ডা মাতানো টগবগে এই তরুণটি চিরতরে আজ বিদায় নেবে? মা কি ভেবেছিলেন তার আদরের সন্তানটির এটাই হবে বাসা থেকে শেষবারের মতো বের হওয়া? কারও ভাবনাতেই ছিল না; থাকেও না।

প্রতিদিন এরকম অসংখ্য মৃত্যু দেখেও আমরা বে-খবর থাকি। ভাবি, জীবনের এখনো অনেকটা দেখার বাকি। বয়স ৫০/৬০ পার হলে হয়তো ভাবনায় আসে। শিশু-কিশোর, তরুণ-যুবক কারও ভাবনাতেই 'মৃত্যু' শব্দটি নেই।

কিন্তু 'অপমৃত্যু'?

এটি তো অন্তত বয়স হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করে না! মৃত্যুকে না হয় ভুলে গেলাম, কিন্তু অপমৃত্যুর সঙ্গে তো যেকোনো সময়ই দেখা হয়ে যেতে পারে! ঘরে বসে আছি। মাথার ওপর ফ্যান ঘুরছে। হঠাৎ ফ্যানটি ছুটে এসে মাথায় পড়ে মাথাটা চিড়েচ্যাপ্টা হয়ে যেতে পারে!

মাঠে ক্রিকেট খেলছি। বোলার বল করল। দ্রুতগতিতে ছুটে আসা বলটি আমার বুকে আঘাত করল। নেওয়া হলো হসপিটালে। ডাক্তারের কণ্ঠে হতাশা—'হি/সি ইজ নো মোর!'

অথবা কোনো কারণ ছাড়াই। এমনিই। রাতের বেলা। শুয়ে আছি বিছানায়। ঘুমালাম। সকাল হলো। সবার ঘুম ভাঙলেও আমি রয়ে গেলাম চিরনিদ্রায়। হতে কি পারে না এমন!

প্রতিদিনই পৃথিবীজুড়ে এমন অগণিত ঘটনা ঘটছে। দেখছি, শুনছি, জানছি। আল্লাহ এগুলো আমাদের দেখাচ্ছেন, জানাচ্ছেন, শোনাচ্ছেন। যেন তা দেখে দেখে আমরা আমাদের জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ করতে পারি। মৃত্যুর আগেই পূর্বপ্রস্তুতি গ্রহণ করতে পারি। হয়ে উঠতে পারি তাঁর প্রিয় বান্দা। যেন 'আলাছতু বিরব্বিকুম' প্রশ্নের যথাযথ জবাব তৈরি করতে পারি। এবং সবশেষে তাঁর রেজামান্দি নিয়ে রওনা দিতে পারি পরকালের খাটিয়ায়।

নাটাইয়ের টান

ভারতের কর্ণাটকের একটি গ্রাম। এলাকাবাসী একটা ঘটনায় তটস্থ হয়ে বনবিভাগকে খবর দিলো।

ঘটনা ভয়ংকর!

কুকুরকে ধাওয়া করতে করতে এক বাঘ একটা বাড়ির টয়লেটে ঢুকে পড়েছে। বাড়ির লোকেরা ভয় পেয়ে বাইরে থেকে দরজা আটকে দিয়ে অপেক্ষা করছে।

খবর পেয়ে বনবিভাগের লোকজন দ্রুত সেই বাড়িতে ছুটে এলো। সঙ্গে এলো একদল সাংবাদিক। সবাই ভেবেছিল, ধাওয়া করতে থাকা কুকুরটির দফা ততক্ষণে রফা হয়ে গেছে। টয়লেটের ভেতর হাতের নাগালে পেয়ে বাঘটা নিশ্চয় চেটেপুটে 'শিকার'কে খেয়ে নিয়েছে।

সাংবাদিকরা ক্যামেরা নিয়ে তৎপর হলো। কুকুরটির কপালে শেষতক কী ঘটেছে, তা ক্যাপচার করার জন্য টয়লেটের ভেন্টিলেটরের ছোট্ট ছিদ্র দিয়ে ক্যামেরা প্রবেশ করাল।

ক্যামেরায় যা ধরা পড়ল তা ছিল বিস্ময়কর!

কুকুরটির ঘাড় মটকাবে দূরে থাক, বাঘটি এর ধারেকাছেও যায়নি। বাঘের ভয়ে জড়সড়ো হয়ে কুকুরটি শেষপ্রান্তে বসে আছে। আর দরজার কাছে বাঘটি অপেক্ষা করছে কখন তাকে টয়লেটের এ বন্দিদশা থেকে মুক্ত করা হবে। আদৌ হবে, নাকি এখানেই জীবনপাত ঘটবে বনের রাজার!

মৃত্যুভয়।

বিপদমুক্তির চিন্তা।

পাকড়াও হওয়ার আতঙ্ক।

যেটাই হোক, বাঘটির মধ্যে এর কোনো একটা কাজ করছিল। তাই সে অন্যকে আক্রমণ করার লোভ ত্যাগ করে নিজের হালত নিয়েই ভেবেছে। মানুষকেও আল্লাহ তাআলা একটা না একটা বিপদ দিয়েই রাখেন। যেন সে

নিজের অসহায়ত্ব বুঝতে পারে। নইলে মানুষ নিজেকে সংবরণ করতে পারত না।

ধরুন, একটা ডাকাত কোনো বাড়িতে ডাকাতি করতে এসেছে। বাড়ির লোকজনকে জিম্মি করে যেই না সোনা-গয়না লুটপাট শুরু করতে যাবে, অমনি সে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হলো। এখন কি সে ডাকাতি করবে, নাকি নিজের জীবন বাঁচাতে মরিয়া হয়ে উঠবে?

অথবা একটা জাহাজে দুজন লোক মারামারি করছিল। কঠিন মারামারি। একেবারে খুন-খারাপি পর্যায়ের। এই সময় সাগরে প্রচণ্ড ঝড় উঠল। ঝড়ের কবলে পরে জাহাজের অবস্থা ডুবুডুবু। এই অবস্থায় মারামারি করতে থাকা লোকগুলো কী করবে?

মারামারি চালিয়ে যাবে?

নিশ্চয় না।

বরং কী করে সলিল সমাধির হাত থেকে নিজেদেরকে বাঁচানো যায় সেই চেষ্টাই করবে।

এই যে মৃত্যুভয়, কঠিন বিপদ, দুঃখ-দুর্দশা; এগুলো আছে বলেই নিজেকে আমরা সংবরণ করতে পারি। নয়তো আল্লাহকে ভুলে যেতাম। নাফরমানি বেড়ে যেত। হিসাবের খাতায় যোগ হতো আরও বেশি পাপ। বেশি পাওয়ার, বেশি খাওয়ার, অন্যের সম্পদ আত্মসাৎ করার প্রবণতা বহুগুণে বৃদ্ধি পেত।

নাটাইয়ের হেঁচকা টান আছে বলেই, নর্দমায় পতিত হওয়ার হাত থেকে ঘুড়িটা নিজেকে সামলে নিতে পারে।

বিশ্বাসের নিশ্বাস নাই

নরসিংদীর বাবুরহাটে গিয়েছি কাপড় কিনতে। বিশাল বাজার। দোকানদার আর কাস্টমারের হাঁকডাকে বাজার গরম। একটা দোকানের দিকে তাকিয়ে হতবাক হলাম। দোকানি পানিভরতি বালতি সামনে নিয়ে বসে আছে।

: ঘটনা কী ভাই? কাপড়ের দোকানে পানির বালতি!

দোকানির কণ্ঠে হতাশা—

: দেশ থেকে বিশ্বাস জিনিসটা উঠে গেছে, ভাই! আমাদের কাপড় থেকে যে রং ওঠে না, এইটা কাস্টমারকে বিশ্বাস করাতে পারি না। এজন্য পানির বালতি সামনে নিয়ে বসা আছি। কাপড়টা পানিতে ধুয়ে রঙের হান্ড্রেড পার্সেন্ট গ্যারান্টির প্রমাণটা নগদ নগদ দিয়ে দিচ্ছি!

দেশ থেকে 'বিশ্বাস' জিনিসটা যে সত্যিই উঠে গেছে—এই ভদ্রলোকের কাণ্ড-কীর্তিতে সেটা পরিষ্কার। কেউ কেউ বলেন,'বিশ্বাসের মা মরে গেছে।'

আসলে কি তাই?

হবে হয়তো।

কথাগুলোর বাস্তবতা একেবারে অস্বীকার করার জো নেই। কেউ কাউকে বিশ্বাস করতে চায় না। না টাকা দিয়ে, না কথা দিয়ে। বিশ্বাসের অবস্থা হয়ে গেছে 'শেষ নিশ্বাস' ত্যাগ করার মতো।

এক দোকানে চাল কিনতে গেলাম। দোকানের মেমোর নিচে লেখা— 'বিক্রিত মাল ফেরত নেওয়া হয়।' লেখাটা দেখে একলোক বলল, 'মনে হয় ভুল লিখেছে। প্রিন্টিং মিসটেক।'

আমি বললাম, 'মোটেও প্রিন্টিং মিসটেক না। এটাই হলো ব্যবসার পদ্ধতি। কাস্টমার পণ্য কিনবে। পছন্দ না হলে ফেরত দিতে পারবে— সাহাবারা এই পদ্ধতিতেই ব্যবসা করতেন। অথচ আমরা আমাদের প্রতিষ্ঠানের মেমোর নিচে আগেভাগেই লিখে রাখি—'বিক্রিত মাল ফেরত নেওয়া হয় না।'

এই বিশ্বাস এমনভাবে অন্তরে গেঁথে গেছে, কেউ 'ফেরত নেওয়া হয়' কথাটা লিখলে মনে হয় প্রিন্টিং মিসটেক। ছাপার ভুল।

বিশ্বাসভঙ্গের এই ভীতটা কিন্তু আমরাই তৈরি করেছি! নিজে ঠকে গিয়ে আর অন্যকে ঠকিয়ে।

হুজুর হয়ে এই কাজটা করল!

আমাদের নিচতলায় খুবই নিরীহটাইপ এক ভদ্রলোক ভাড়া থাকতেন। আলাভোলা চেহারা। মাথায় একটা জালিটুপি থাকত সবসময়। নিয়মিত নামাজও পড়তেন।

বাসা ভাড়া নেওয়ার সময় জানা গেল, তার শুটকির ব্যবসা আছে। একজন পার্টনারের সঙ্গে এই ব্যবসাটা করছে। যাচ্ছিল ভালোই। হঠাৎ করেই তিন মাসের ভাড়া আটকে দিলো। জানাল, ব্যবসায় লস হচ্ছে। ব্যাংকে একটা ডিপোজিট আছে। সেটা ভেঙে ভাড়ার টাকাটা পরিশোধ করে দেবে।

একে তো নামাজি। তার ওপর আলাভোলা চেহারা। তাকে বিশ্বাস না করে উপায় ছিল না। এভাবে কিছুদিন গত হলো। হঠাৎ করেই লোকটা একদিন লাপাত্তা হয়ে গেল। ফ্ল্যাট তালা দেওয়া। কোনো খোঁজ নেই। বউবাচ্চা আগেই গ্রামের বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছিল। এখন সেও হাওয়া হলো। ফোন বন্ধ। খোঁজ নিয়ে জানা গেল, শুটকির ব্যবসা বলতে তার আদতে কোনো কিছুই নেই।

সবই ধোঁকাবাজি। ব্যবসা, নামাজি চেহারা-সুরত আর সরল অভিব্যক্তি ছিল তার সাইনবোর্ড। যে সাইনবোর্ড দেখিয়ে বিভিন্নজনের কাছ থেকে লক্ষাধিক টাকা হাতিয়ে নেওয়াই ছিল উদ্দেশ্য। উদ্দেশ্য পূরণ হয়েছে, তো আর দেরি করেনি। চোরের মতো গা ঢাকা দিয়েছে।

২.

আমাদের মসজিদে এক মুয়াজ্জিন সাহেব চাকরি করতেন। দীর্ঘদিন ছিলেন। অল্প বেতন। চাকরির পাশাপাশি দুটো টিউশনি আর মসজিদে

সকালবেলার মক্তব পড়ানো। এই আয়ে ভালো চলার কথা না থাকলেও তিনি চলতেন ফিটফাট হয়েই। গায়ে ইস্ত্রি করা জুব্বা, মাথায় মাড় দেওয়া টুপি, পরনে দামি সাদালুঙ্গি—দেখে ভালোই লাগত। হাসিখুশি, সদালাপি এই মানুষটিকে কেউ কখনো অপছন্দ করার সুযোগই পেত না!

আমার সঙ্গেও হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। টাকা-পয়সা যখন যা প্রয়োজন হতো, চাইলে না করতে পারতাম না। সাধ্যমতো করজে হাসানার হাত বাড়িয়ে দিতাম।

হঠাৎ একদিন ভোরে জানা গেল, তিনি লাপাত্তা। ফোন বন্ধ। ধীরে ধীরে জানলাম, অনেকের কাছ থেকেই তিনি টাকা-পয়সা নিয়েছেন। স্বয়ং ইমাম সাহেবকেও ছাড়েননি। মসজিদের সেক্রেটারি, ক্যাশিয়ার, পাশের দোকানদারও তার মিষ্টি ব্যবহার আর হাসিখুশি আচরণের ধোঁকাবাজি থেকে রেহাই পায়নি।

দুটো ঘটনায় কী বোঝা যায়? দাড়ি-টুপিওয়ালা কিংবা নামাজি হওয়া এর জন্য দায়ী? মোটেও না। আমরা অনেক সময় বলে থাকি—'হুজুর মানুষ হয়ে এই কাজটা করল!'

'নামাজ-রোজা করে এমন অঘটনটা ঘটাল!'

আসলে এর কিছুই এই ধোঁকাবাজির জন্য দায়ী না। দায়ী তাদের ব্যক্তিগত চরিত্র। দাড়ি, টুপি, জুব্বা এবং ভালো কাজগুলো ছিল তাদের সাইনবোর্ড। যা দেখিয়ে মানুষের সঙ্গে প্রতারণা করত। এই প্রতারণার শাস্তি তো আল্লাহ অবশ্যই দেবেন! বান্দার হক নষ্ট করার সাজা এত সোজা না। সাজা তারা অবশ্যই পাবে। কিন্তু কথা হলো, আমরা তাহলে বিশ্বাস করব কাকে?

বিশ্বাস সবাইকেই করব, তবে সচেতনতার সাথে। বিশ্বাস আছে বলেই দুনিয়াটা টিকে আছে। আমি যদি কাউকে বিশ্বাস না করি, সবাইকেই সন্দেহের চোখে দেখি, তবে তো আমাকেও কেউ বিশ্বাস করবে না!

৩.

ওমানে আমি তখন নতুন। ওমানিদের হাবভাব তখনো বুঝে উঠতে পারিনি। প্রচুর 'পানশালা' আছে ওমানে। এসব পানশালায় বিয়ার, হুক্কা, নেশাদ্রব্য দেদারসে বিক্রি হয়।

একদিন একটা পানশালার পাশ দিয়ে যাচ্ছি। ভেতর থেকে বিয়ারের দুর্গন্ধ আসছে। আমার সঙ্গে দুজন 'অ-হুজুর' বাঙালি। একই প্রতিষ্ঠানে কাজ করি। তারা বলল—

: দেখেন, দেখেন, হুজুর হয়ে কীসব খাচ্ছে! ছি! ছি! হুজুররাই যদি এসব করে, আমরা যাব কোথায়?

পানশালাটার ভেতরের দিকে তাকিয়ে আমারও চোখজোড়া কপালে উঠে গেল। দেখলাম, আঁটোসাঁটো পোশাকের মেয়েরা টেবিলে টেবিলে বিয়ার ইত্যাদি পরিবেশন করছে। 'বোতল' সাজিয়ে দিচ্ছে সুনিপুণ হাতে। বিশেষ প্রক্রিয়ায় নির্মিত, কারুকার্য খচিত হুক্কার নল এগিয়ে দিচ্ছে খদ্দেরদের মুখের কাছে। বিস্মিত হলাম, খদ্দেররা সবাই লম্বা জুব্বা পরিহিত। মাথায় (বিশেষ কায়দায় তৈরি) টুপি। প্রথম দেখায় খটকা লেগেছিল।

পরে বুঝেছি, জুব্বা-টুপি ওমানিদের জাতীয় পোশাক। ধর্মীয় মূল্যবোধের সঙ্গে ওদের এই পোশাকের সম্পর্ক নেই। তাই ওগুলো গায়ে দিয়ে ওরা যা ইচ্ছা তা-ই করতে পারে। একটুও দ্বিধা করে না।

মদ, বিয়ার বা এ জাতীয় নেশাদ্রব্য গ্রহণ করা ইসলামে নিষিদ্ধ। ধর্মীয় লেবাসে যদি এসব কেউ করে তখন সহজেই সাধারণ মানুষদের নজরে পড়ে। তারা ভাবে, হুজুররা পারলে আমরা কেন পারব না? যদিও দোষটা পোশাকের না। দোষ হচ্ছে যার যার স্বভাবের।

তবে হুজুর হলেই যে সবাই ওলি হয়ে গেল এমনটা ভাবাও ঠিক হবে না। তাহলে প্রতারিত হতে পারেন। সত্যিকারের আল্লাহওয়ালাদের পাশাপাশি সাইনবোর্ডসর্বস্ব লোকও আছে অনেক। পরের ঘটনাটা পড়া যেতে পারে—

জনৈক পীর সাহেবের মেয়ে আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিতে পড়ত। একই ভার্সিটিতে পড়ত এক জনপ্রিয় ক্রিকেটার। পড়তে পড়তে এবং একসঙ্গে চলতে চলতে দুজন একে অপরের কাছাকাছি আসে। মন দেওয়া নেওয়া হয়। দীর্ঘদিনের সম্পর্কের শেষে, দুজন এসে এক মোহনায় মেশে। পরিবারের সম্মতিতে দুজনার বিয়েও হয়।

পত্রিকায় 'পীর সাহেব'-সমেত বর কনের ছবি এসেছে। লক্ষ লক্ষ মানুষ 'চমৎকার' সেই দৃশ্য দেখেছে।

খোলা মন নিয়ে দেখতে গেলে, এসব কোনো বিষয় না। একটা মেয়ে ভার্সিটিতে পড়তেই পারে। কারও হৃদয়ের কাছাকাছি সে আসতেই পারে। কারও সঙ্গে তার মন দেওয়া নেওয়া হতেই পারে। এগুলো কলেজ-ভার্সিটির নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। এতে আশ্চর্যের কিছু নেই।

কিন্তু যখন শুনি মেয়েটি পীর সাহেবের। তাও আবার 'সৈয়দ' বংশের, তখন কিছুটা আশ্চর্য হতেই হয়। পীর সাহেবরা মুরিদদের মেয়েদেরকে পর্দায় চলতে বলবেন, আল্লাহর আদেশ-নিষেধের কথা বলবেন, সাধারণ মানুষরা তাদের বয়ান শুনে পরিবর্তন হওয়ার চেষ্টা করবে এটাই স্বাভাবিক।

যখন শোনা যায় স্বয়ং পীর সাহেবই 'উলটোপথে' চলছেন, তখন স্পষ্টতই বোঝা যায়, এই পীর পোশাকি। সাধারণ মানুষের বিশ্বাসের সঙ্গে এরা ধোঁকাবাজি করছেন। 'পীর' শব্দটা এদের কাছে জীর্ণ এবং মামুলি।

সুতরাং একজনের দোষ দেখে অন্য সবাইকে এক পাল্লায় মাপা যাবে না। আবার এটাও বুঝতে হবে, সাইনবোর্ড আর বাস্তবতা এক জিনিস না।

ভণ্ডপীরদের ভক্ত বৃদ্ধির রহস্যটা কী?

আমাদের দেশের এক পীর তার ভক্তদের কাছে নিজেকে 'মাহবুবে খোদা' হিসাবে পরিচয় দিয়ে বেড়ান। তার মুরিদানের সংখ্যা দিনদিন বেড়েই চলছে। তারা তাদের 'বাবা' বলতে অজ্ঞান! বাবা যা বলেন তা-ই। পীরবাবার প্রতি তাদের আস্থা ও বিশ্বাসের শেষ নেই।

অথচ এই পীর সাহেবের কাছে নামাজ-রোজার বালাই তো নেই-ই; মসজিদ-মাদরাসার নামও তিনি শুনতে পারেন না। এমনকি কখনো কখনো কুফরি কথাবার্তাও বলে ফেলেন। এরপরও তার মুরিদান বেড়েই চলছে।

কারণটা কী? রহস্যটা তাহলে কোথায়? এমন একজন ভুল পীরের পেছনে ছুটছে কেন মানুষ? কী আছে তার মধ্যে? খুঁজতে গিয়ে জানা গেল, তার আছে এমন আধ্যাত্মিক শক্তি যে, তিনি যখন তাওয়াজ্জুর সঙ্গে কলব বরাবর ফুঁ দিয়ে দেন, তখন নাকি কলব জারি হয়ে যায়। কলবে শুরু হয়ে যায় আল্লাহ্ আল্লাহ্ জিকির। যদি কামেল ওলি নাই-বা হবেন, তাহলে কেন তার ইশারায় কলব জারি হবে?

আসলে এরকম কিছু প্রশ্নের কাছে হেরে গিয়েই যুগে যুগে ভণ্ডবাবাদের ভক্ত হয়ে আসছে হাজার হাজার মানুষ। বরবাদ করছে নিজেদের দুনিয়া ও আখেরাত। অথচ এ জাতীয় আজগুবি কর্মপ্রদর্শনের ক্ষমতা বিশেষ উপায়ে কিছু সাধনা করলেই অর্জন করা যায়। এর জন্য কামেল ওলি হওয়া তো দূরের কথা, মুসলমান হওয়াও জরুরি নয়।

নিচের ঘটনা এর একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ।

ইংরেজ শাসনকাল। ভারতবর্ষে একবার বিতর্ক অনুষ্ঠান হচ্ছিল। আর্য হিন্দু বনাম মুসলমান। বিতর্ক শুরু হলো। প্রথমেই মুসলমানদের পালা। কিছুক্ষণ পর এক আশ্চর্যজনক ব্যাপার ঘটল! মুসলমানদের পক্ষে যিনিই কথা বলার জন্য স্টেজে দাঁড়াচ্ছেন, সঙ্গে সঙ্গে তার জবান বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। কিছুই বলতে পারছেন না।

চারিদিকে শোরগোল পড়ে গেল।

ঘটনা কী?

এমন হচ্ছে কেন?

হঠাৎ একজন আলেম লক্ষ করলেন আসল ঘটনাটা। আর্যদের স্টেজে এক হিন্দু যোগী গভীর ধ্যানে বসে আছে। সে-ই কিছুক্ষণ পরপর মুসলমান বক্তার দিকে তাওয়াজ্জুহ দিচ্ছে।

ঘটনার ভয়াবহতা লক্ষ করে সেই আলেম উঠে দাঁড়ালেন। ছুটে গেলেন বিখ্যাত বুজুর্গ খলিল আহমাদ সাহারানপুরি রহ.-এর কাছে। তাকে জানালেন সবকিছু। সব শুনে তিনি বিতর্ক অনুষ্ঠানে হাজির হলেন। মুসলমানদের স্টেজে বসে ওই পক্ষের যোগীর দিকে পালটা তাওয়াজ্জুহ নিবদ্ধ করলেন। কিছুক্ষণের মধ্যে যোগীর গায়ে জ্বালাপোড়া শুরু হয়ে গেল। এবং সে স্টেজ ছেড়ে ছোটাছুটি করতে করতে চলে গেল।

দিল্লির প্রখ্যাত ওলি নিজামুদ্দিন রহ.-এর সময়কার ঘটনা। তিনি একবার জানতে পারলেন, এক হিন্দু যোগসাধক আকাশে উড়ে বেড়াচ্ছে। আর বিভিন্ন আজগুবি ঘটনা দেখিয়ে সাধারণ মুসলমানদের গোমরাহ করে যাচ্ছে। তিনি তৎক্ষণাৎ সেখানে উপস্থিত হয়ে পায়ের জুতাজোড়া ছেড়ে দিলেন। অমনি জুতাজোড়া আকাশে উড়ে গেল। এবং ওই যোগসাধককে পিটিয়ে পিটিয়ে নিচে নামাল।

বোঝা গেল অলৌকিক বিভিন্ন বিষয় যেমন ওলি-আউলিয়াদের হাতে ঘটতে পারে, তেমনই ঘটতে পারে ফাসেক-ফাজের এমনকি কাফেরের হাতেও। এ বিষয়ে আধ্যাত্মিক জগতের বিখ্যাত বুজুর্গ আশরাফ আলি থানভি রহ. খুব সুন্দর উদাহরণ দিয়েছেন—'একটি আয়নাকে পানি দিয়ে ধুলেও ঝকঝক করবে, আবার প্রস্রাব দিয়ে ধুলেও ঝকঝক করবে। কিন্তু কোনটা দিয়ে ধুলে পবিত্র হবে আর কোনটা দিয়ে নাপাক হবে, তা তো সহজেই বোঝা যাচ্ছে!'

শিশু নির্যাতন : এক চরম নিমকহারামি

১.

মনিজার চোখদুটি নষ্ট করে ফেলা হয়েছে। গালে দেওয়া হয়েছে আগুন-গরম খুন্তির সেঁক। গালটা ফুলে লাল হয়ে আছে। পিঠেও আছে বেত্রাঘাতের দাগ। কী করেছে ছয় বছরের মনিজা?

চুরি করেছে?

নাকি ছিনতাই?

এর কিছুই করেনি। বাসায় কাজ করত সে। অসুস্থতায় ক্লান্ত ছিল। ঘুম থেকে উঠতে দেরি করেছে। কাজে করেছে সামান্য অবহেলা। এতেই গৃহকর্ত্রী খেপে গিয়েছে। খেপে গিয়ে উপর্যুপরি আঘাতে ক্ষতবিক্ষত করে দিয়েছে ছোট্ট এই শিশুটির শরীর।

২.

বরিশালে শিশু নির্যাতনের ঘটনাটি ঘটেছে খোদ শিশুসদনেই। এতিম শিশু। বাবা-মা নেই। শিশুটির একটাই দোষ, না বলে পাশের বাসস্ট্যান্ডে ঘুরতে গিয়েছিল। এই একটিমাত্র অপরাধে প্রায় ২০ মিনিট ধরে পিটিয়েছে শিশুসদনের কম্পাউন্ডার দুলাল মিয়া।

একবার চিন্তা করুন!

ছয় বছরের একটা বাচ্চাকে পেটাচ্ছে ৪০ বছরের শক্তপোক্ত একটা লোক। তাও আবার একটানা ২০ মিনিট ধরে। একের পর এক লাঠির

আঘাত যখন করা হচ্ছিল, কেমন লেগেছিল কোমলমতি শিশুটির? ভাবতেই শরীর কাঁটা দিয়ে ওঠে।

৩.

সিলেটে পিটিয়ে মেরে ফেলেছিল শিশু রাজনকে। মোবাইল চুরির অপরাধে। ঘাতকরা শিশুটিকে বেঁধে রেখে ঠান্ডা মাথায় মজা করে করে পিটিয়েছে। অন্যরা সেই মজা উপভোগ করেছে। ভিডিয়ো করে ছেড়ে দিয়েছে ইন্টারনেটে। যেন মানুষকে না; কোনো জন্তু-জানোয়ারকে মারা হচ্ছে।

৪.

কক্সবাজারে ঘটেছে আরও হৃদয়বিদারক ঘটনা। মাত্র ১৫০ টাকা চুরি করেছিল দুই শিশু। এইটুকুই অপরাধ। শিশুদুটিকে খাঁচায় ঢুকিয়ে ইলেক্ট্রিক শক দিয়েছে মানুষ নামের এক পাষণ্ড।

৫.

আরেক ঘটনায়, একটি শিশুকে মাটিতে শোয়ানো হলো। শক্ত-সমর্থ, গন্ডারের মতো একজন মাটিতে চেপে ধরল শিশুটির দুই হাত। অন্যজন নিজের দুইপায়ে শিশুটিকে চেপে ধরে পেটাচ্ছিল নির্মমভাবে।

অপরাধ কী?

গাছের আম চুরি করেছিল শিশুটি।

৬.

এতিম শিশু—আলি। ছোট্ট মানুষ। দুই কূলে কেউ নেই। ট্রলি চালিয়ে জীবিকা নির্বাহ করত। শরীরে প্রচণ্ড জ্বর থাকায় কাজে যেতে পারেনি। এই অপরাধে মালিক শিশুটির ওপর ভীষণ ক্ষিপ্ত হয়। ওষুধ কিনে দেবে বলে বাড়িতে ডেকে নিয়ে চোখ বেঁধে শুরু করে প্রচণ্ড শারীরিক নির্যাতন।

মালিক একা না।

তার সঙ্গে যুক্ত হয় আরও কয়েকজন যুবক। তারা কয়েক দফায় আলির ওপর নির্মম নির্যাতন চালায়। অতিমাত্রায় শারীরিক নির্যাতনের কারণে আলির শারীরিক অবস্থা যখন বেশ খারাপ হয়, তখন মরে গেছে মনে করে তাকে তার বাড়ির পাশের রাস্তায় ফেলে দিয়ে আসে পাষণ্ডরা।

শিশুদের সঙ্গে কেন এ অমানবিকতা। ওরা দুর্বল বলে? পালটা আঘাত করতে পারে না বলে?

আজকাল এ পাষণ্ডতায় পিছিয়ে নেই শিক্ষাগুরুরাও। স্কুলগুলোতে প্রায়ই শিশু নির্যাতনের কথা শোনা যায়। এমনকি মাদরাসাগুলোতেও। এটা কখনোই কাম্য নয়।

শাসন আর নির্যাতন কখনো এক নয়। শিক্ষক ছাত্রকে শাসন করবে, এটাই যুক্তিযুক্ত। কিন্তু শাসনের নামে নির্যাতন-নিপীড়ন কখনোই মানা যায় না। টেনেহিঁচড়ে, আছাড় দিয়ে, ছুড়ে ফেলে, মাথায়-চেহারায় গরুর মতো পিটিয়ে মারা—শাসনের এ কোন আজব পদ্ধতি। এ তো চরম বর্বরতা। এর নাম শাসন নয়। কেয়ামতের দিন অবশ্যই এর বিচার হবে। দুর্বলদের ওপর সবলদের অত্যাচারের বিচার। মাজলুমদের ওপর জালেমদের জুলুমের বিচার।

শিশুদের অমর্যাদা করা মানে প্রিয় নবীর আদর্শকে অমর্যাদা করা। কারণ, শিশুরা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে প্রিয় ছিলেন। তিনি বসে গিয়েছেন—শিশু, বৃদ্ধ এবং দুর্বলদের কারণে আসমান হতে রিজিক আসে।

যাদের অসিলায় রিজিকের ফায়সালা, তাদের সঙ্গেই কিনা পশুর মতো আচরণ! উঁচুদরের নিমকহারামি বোধহয় একেই বলে।

বাসা-বাড়িতে কাজ করা বা দোকানে কিংবা প্রতিষ্ঠানে শ্রম দেওয়া শিশুরা, অথবা যে শিশুটি আপনার কাছে পড়তে এসেছে, আপনার ছাত্র—তাকে আদর-স্নেহে ভরিয়ে তুলুন। একটি মর্যাদাশীল ভবিষ্যৎ তাকে উপহার দিন। শিশুদের প্রতি নির্মম হওয়া থেকে ফিরে আসুন।

এর অন্যথা করলেন তো নিজের ক্ষতি নিজে করলেন। আল্লাহর আদালত আপনার জন্য এর চেয়েও কঠিন নির্মমতা নিয়ে অপেক্ষা করছে!

বাসা কিন্তু পালটাতেই হবে

আপনি এখন যে বাসায় আছেন—এর রুমগুলো ছোট ছোট। বাচ্চারা বড় হচ্ছে। গ্রাম থেকে আগামী মাসে বাবা-মা আসছেন। তারা বৃদ্ধ হয়েছেন। বৌ-ছেলে, নাতি-নাতকুর নিয়ে বাকি দিনগুলো একসঙ্গে থাকতে চান।

তাই, আপনি সম্প্রতি চার রুমের ছিমছাম একটা ফ্ল্যাট কিনেছেন। অফিসের বেতন থেকে কিছু কিছু বাঁচিয়ে, ডিউটি শেষে সন্ধ্যার পর 'উবার' চালিয়ে, আপনার স্ত্রীর 'হোমমেইড' আইটেমের আয় থেকে জমিয়ে এবং গ্রামের কিছু জমি বিক্রি করে কিনেছেন ফ্ল্যাটটা।

বাসা পরিবর্তন করবেন আগামী মাসে। কিন্তু এই মাস থেকেই প্রস্তুতি নেওয়া শুরু করেছেন। আপনি এবং আপনার স্ত্রী মিলে ধীরে ধীরে সবকিছু গুছিয়ে ফেলছেন। বাচ্চারাও সাহায্য করছে। মনে অনেক আনন্দ; এতদিন ভাড়াবাসায় ছিলেন। এখন নিজের ফ্ল্যাটে শিফট হচ্ছেন!

খুব লক্ষ করছেন, যেন একটা জিনিসও এই বাসায় ফেলে যাওয়া না হয়। নতুন বাসায় গিয়ে কোনো কিছুর জন্য যেন অসুবিধায় পড়তে না হয়।

দেখতে দেখতে মাস শেষ হয়ে গেল। আপনার মনে দারুণ আনন্দ! কোনো টেনশনই নেই! কারণ, আগে থেকেই সব মালামাল ওখানে পাঠিয়ে দিয়েছেন!

প্রিয় ভাই, দুনিয়াটাও একটা ভাড়াবাসার মতোই। অস্থায়ী। যেকোনো সময় ছাড়তে হতে পারে। ওপারের জীবনটাই হলো স্থায়ী। এখান থেকে যা পাঠাব, এর ওপরই ওই বাড়ির সৌন্দর্য নির্ভর করে।

একটা ফ্ল্যাট কিনতে গিয়ে আপনি আর আপনার স্ত্রী মিলে কত কষ্ট করলেন।

কম খেয়ে, কম ঘুমিয়ে, ডিউটির পরেও বাড়তি ডিউটি করে, কত কষ্টে ফ্ল্যাটের মালিক হলেন। প্রিয় ভাই, ওপারেও নিশ্চয় আমরা এরকম নিশ্চিন্তে থাকতে চাই! প্রিয়তমা স্ত্রী-সহ পরিবারের সবাইকে নিয়ে একসঙ্গে হাসি-আনন্দে কাটাতে চাই!

চাইলেই হবে না। ওপারের সামান কিছু কিছু এখনই পাঠিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করতে হবে। কম খেয়ে, কম ঘুমিয়ে। গভীর রাতে স্ত্রীকে ডেকে তুলে, অজু করে মুসাল্লায় দাঁড়িয়ে। বাচ্চাদেরকে দ্বীন শিখিয়ে। মা-বাবার খেদমত করে। প্রচুর দান-খয়রাত করে। মুসলমান ভাইয়ের সঙ্গে হাসিমুখে কথা বলে। এতিম-অসহায়দের মুখে অন্ন জুগিয়ে। কত নেক আমলই না আছে!

আল্লাহর সন্তুষ্টির পথের তো শেষ নেই! ভালো কোনো কাজ আমার থেকে ছুটে না যাওয়া চাই!

ভালো কাজের ইচ্ছাটা যখনই হবে, তখনই করে ফেলা চাই! নয়তো শয়তান মনের অবস্থা ঘুরিয়ে ফেলবে।

অনেক সময় এমন হয়। মসজিদ থেকে বেরুচ্ছি। গেটে ভিক্ষুক ভিক্ষা চাইছে। আমারও নিয়ত আছে। কিন্তু আলসেমির কারণে পকেটে হাত ঢোকাই না। ঢোকালেও 'ভাঙতি নেই' অজুহাতে দিই না। অজুহাত দাঁড় করালাম তো একটা সাওয়াব থেকে পিছিয়ে পড়লাম। এই সুযোগ তো আর না-ও পেতে পারি!

এক বুজুর্গ বাথরুমে ঢুকলেন। কিন্তু হাজত না সেরে সঙ্গে সঙ্গেই বের হয়ে এলেন। খাদেম অবাক গলায় জানতে চাইল, 'কী হয়েছে হজরত!'

বুজুর্গ নিজের গায়ের জামাটা খুলে খাদেমের হাতে দিয়ে বললেন, 'জামাটা কোনো গরিব লোককে দিয়ে এসো।'

খাদেম বলল, 'এটা তো বাথরুম সেরে এসেও দিতে পারতেন!'

'তখন হয়তো শয়তান আমার মনোভাব পরিবর্তন করে ফেলত। অথবা এর আগেই আমার মৃত্যু হয়ে যেতে পারত।'

সুবহানাল্লাহ! কত সতর্ক ছিলেন; একটা নেক আমলও যেন ছুটে না যায়।

প্রিয় ভাই, এই সতর্কতা আমাদেরও অবলম্বন করা উচিত। বাসা পালটানোর সময় যেভাবে সতর্ক থেকেছি, এর চেয়েও কোটিগুণ বেশি সতর্ক হওয়া উচিত। কারণ, এখানে বাসা পালটানোর সময় কিছু ফেলে গেলে পাশের দোকানেই আবার কিনতে পাওয়া যায়। কিন্তু নেকি এমন এক জিনিস, মৃত্যুর পর আর কোথাও কিনতে পাওয়া যায় না।

চায়ের কাপ

বাজারের ব্যস্ততম চায়ের দোকান। প্রচণ্ড ভিড়। কেউ খাচ্ছে। কেউ বসছে। কেউ আবার খেয়েদেয়ে বিল পরিশোধ করে উঠে পড়ছে।

দোকানি মহাব্যস্ত! টিংটিং শব্দ তুলে কাপ থেকে কাপে চামচ চালাচ্ছে। কাস্টমার সামলাতে হিমশিম খাচ্ছে বেচারা। টেবিল থেকে টেবিলে চা নিয়ে দৌড়াচ্ছে ব্যস্ত বেয়ারা। অলস কাস্টমারদের ডেকে ডেকে বলছে,

: হইল তো, আর কত বইসা থাকবেন? উঠেন না। আপনার তো খাওয়া শেষ। এইবার অন্য কাস্টমারদের বসবার দ্যান!

কাস্টমার উঠে যেতে বাধ্য হচ্ছে। হবেই-বা না কেন? এই দোকান কি তার? এই টেবিল কি তার?

এই কাপও তো তার না!

সবই সাময়িক। অথচ কিছুক্ষণ আগেও সে এগুলো তার নিজের বলেই জানান দিচ্ছিল। বলছিল—

: ওই মিয়া! আমার টেবিলে চা দাও।

চা দেওয়া হলো। চায়ে যখন চিনি কম হলো, তখন বলেছিল—

: ওই মিয়া! আমার কাপে চিনি কম হইছে। চিনি দাও।

আমার কাপ।

আমার টেবিল।

আমার চা।

শব্দগুলো কি কানে বাজছে না? কিছুই কি বোঝা যাচ্ছে না? কিছুক্ষণ আগেই মাত্র বলা হয়েছিল 'আমার কাপ'। যখন চা খাওয়া শেষ, তখন আর আমার না। দোকানি আমাকে টেনে উঠিয়ে দিচ্ছে। বলছে, 'এইবার উঠেন। আপনার সময় শেষ। অন্যদের সুযোগ দ্যান।'

চায়ের কাপের সঙ্গে আমাদের জীবনের যেন চমৎকার একটা মিল আছে!

বাড়ি আমার।

গাড়ি আমার।

মিল কারখানা আমার।

জমিজমা? সবই আমার।

'আমার' বাড়িটাতে ইট বসাও। টাইলস লাগাও। চুনকাম চলবে না; এনামেল পেইন্টস লাগাও।

আমার গাড়িতে মবিল দাও।

আমার কারখানায় উৎপাদন বাড়াও।

আমার জমিতে ফসল লাগাও।

কী অদ্ভুত! দাদাও এমনটাই বলেছিল। বলেছিল বাবাও। এখন ছেলে বলছে। দাদা, বাবা, ছেলে—'চায়ের কাপ' ছেড়ে চলে গেল, এখন নাতি-নাতকুরদের পালা। তারাও বলছে সব আমার।

বড় অদ্ভুত এক চায়ের কাপ নিয়ে বসেছি আমরা। বলছি আমার, অথচ সঙ্গে নিয়ে যেতে পারছি না। কী অদ্ভুত! বড়ই অদ্ভুত!

নির্বোধ জীবন

ছোটবেলায় অ্যাম্বুলেন্সের সাইরেন শুনলেই চমকে উঠতাম। মনে হতো এই সাইরেনের সাথে গাড়ির ভেতরে থাকা রোগীর নিশ্বাসের একটা যোগসূত্র আছে। সাইরেন চলতে থাকা মানে রোগীর নিশ্বাস জারি থাকা। রোগীর এখন অন্তিম সময় চলছে। তাই সে ক্রমাগত সাইরেন বাজিয়ে বেঁচে থাকার আপ্রাণ চেষ্টা করছে।

কোনো কারণে সাইরেন বন্ধ হয়ে গেলেই ভাবতাম, আহ, বেচারা রোগী আর বেঁচে নেই। মারা গেছে। মনে হতো সাইরেন বন্ধ হয়ে যাওয়া মানেই রোগীর নিশ্বাসটাও বন্ধ হয়ে যাওয়া। কষ্ট হতো। আফসোস লাগত। অ্যাম্বুলেন্স, সাইরেন, মৃত্যু এবং মৃত্যুদাতার কথা ভাবলে ভয়ে এতটুকুন হয়ে যেতাম।

বড় হয়েছি। বুঝতে শিখেছি অনেক কিছু। এখন আর ভয়ে এতটুকুন হয়ে যাই না। ভয়-ডর কমে গেছে। হয়ে গেছি অসীম সাহসী। মৃত্যুভয় এখন আর আমাকে কাবু করতে পারে না। বড় হয়ে ডাক্তার চিনেছি। ওষুধের গুণাগুণ বুঝতে শিখে গেছি। বিশ্বাস করতে শিখেছি ডাক্তারের ক্ষমতা আর ওষুধের কার্যকারিতা।

মাথাব্যথা?

ডাক্তারের কাছে যাও।

পেটে ব্যথা?

ডাক্তারের কাছে যাও।

শরীরের যেকোনো সমস্যা হোক, চিন্তা কী! ডাক্তার আছে না! কবিরাজ আছে না! বাজারে কতশত ওষুধ আছে! দেশিতে কাজ না হলে বিদেশি আছে। ডাক্তারের সাজেশন নাও। বড় প্রফেসর ধরো। সেবন করো দামি দামি ওষুধ। বোকা নাকি তুমি! কী প্রয়োজন মৃত্যুকে ভয় করার?

যতক্ষণ মৃত্যুকে নিয়ে ভাববে, ততক্ষণে ১০টা টাকা বেশি উপার্জনের ফিকির করা যাবে। পৃথিবী যাচ্ছে সামনে এগিয়ে, আর তুমি মৃত্যুর মতো অলীক এক ভাবনা ভেবে পিছিয়ে থাকবে?

বোকা নাকি তুমি!

আসলে, যখন কেউ কাউকে ভয় পায়, বাধ্য হয়েই তাকে বেশি বেশি স্মরণ করে। তার কথা মনে হলেই ভয়ে কুঁকড়ে যায়। ভয় নেই তো ভাবনাও নেই। প্রতিদিন কত কত অ্যাম্বুলেন্স আমার সামনে দিয়ে যাচ্ছে আসছে। সাইরেনের সেই ভয়াল শব্দ আমাকে আর কাবু করতে পারছে কই?

জানাজায় দাঁড়ানোর পরেও। মৃত্যুভয় আমাকে তাড়া আর করছে কই? নিজ হাতে কবরে শোয়াচ্ছি প্রিয়জনকে। ঢেকে দিচ্ছি কঠিন আঁধারে। এই আঁধার আমার হৃদয়কে ভয়ার্ত করছে কই!

করছে না। বোধ নেই। অনুভূতি নেই। 'জড়' হয়ে যাচ্ছি আমি। টাকাপ্রেম, বাড়িপ্রেম, গাড়িপ্রেম, নারীপ্রেম আমাকে 'নির্বোধ' বানিয়ে দিচ্ছে। আমার গ্রাজুয়েশন, আমার ডক্টরেট ডিগ্রি, এমফিল সার্টিফিকেট, কোনো কিছুই এই নির্বুদ্ধিতা থেকে বাঁচাতে পারছে না।

আফসোস!

পাকাচুল সমাচার

ছোটবেলায় পয়সা কামানোর অনেক উপায় ছিল। উপার্জনের উৎস ছিলেন বড়রা। আব্বাকে দেখতাম, পাকাচুল নিয়ে বিব্রত হতেন। তখন তার যুবক বয়স। মাত্র দুই সন্তানের জনক। ওই বয়সেই চুল পেকে যাচ্ছে। টেনশনে ছিলেন। আব্বার এ টেনশনই ছিল আমাদের 'টু-পাইস' কামানোর অন্যতম উপায়।

ঘোষণা দেওয়া ছিল—যে পাকাচুল উঠিয়ে দিতে পারবে, তাকে উপহার দেওয়া হবে। যতটা পাকাচুল ততটা আটআনা। আমরা দুভাই-বোন মহা উৎসাহে কাজে লেগে যেতাম।

তখনকার আটআনা মানে, অনেক সহজেই একটা লজেন্স কিনতে পারা। অথবা কয়েকটা 'অক্ষর বিস্কুট'! কখনো কখনো পয়সা জমিয়ে কিনে ফেলতাম 'খেলনা লঞ্চ'। সামান্য কেরোসিন ঢেলে, সলতেটায় আগুন জ্বালিয়ে পানিতে ছেড়ে দিলেই চলতে থাকত—সত্যিকারের লঞ্চগুলোর মতো। পয়সা জমানোর বাতিক ছোটবোনেরও ছিল। সে কিনত 'কদমা', হাড়ি-পাতিল অথবা খেলনা-চুলা।

দিন গড়িয়েছে।

আব্বা এখন আর পাকাচুল উঠিয়ে দিতে বলেন না। কারণ, আমরাও বড় হয়েছি, আব্বারও বয়স হয়েছে। এখন আর পাকাচুলের ব্যাপারে তার কোনো মাথাব্যথা নেই।

এটাই স্বাভাবিক।

যখন দুয়েকটা চুল পাকে, টেনশন বাড়ে—হায় একী হচ্ছে! এত চটজলদি চুল পেকে যাচ্ছে!

কিন্তু যখন বয়স বাড়ে। বোঝা হয়ে যায় যে, যৌবনে ভাটা পড়বেই, এ আর অটুট থাকার নয়—তখন চুলপাকা নিয়ে আর মাথাব্যথা থাকে না।

শুধু আমার বাবা-ই না, সব মানুষই চায় যেন বুড়ো না হই। যেন যৌবন অটুট থাকে। চারপাশের মানুষজন যেন বলতে না পারে—'চাচা কই যান?'

চাচা কিংবা আঙ্কেল ডাক থেকে বাঁচার জন্য কত কৌশলই না অবলম্বন করা হয়। ষাট-সত্তরের দাদুদেরকেও দেখা যায় চুলে কলপ দিয়ে, রংচঙে জামা-কাপড় পরে 'ভাইয়া-বয়স' ধরে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করতে। কিন্তু চাইলেই কি যুবক থাকা যায়?

যায় না।

সবই বৃথা চেষ্টা।

চুল বাড়ে। কলপ-কালো চুলগুলো যত ওপরের দিকে ওঠে, গোড়া থেকে ততই প্রকাশিত হয় আসল রূপ। ঠেলেঠুলে সাদারা বের হয়েই পড়ে। ওপরে ফিটফাট হলেও, ভেতরের 'সদরঘাট'টা আরও বীভৎস আকারে তেড়েফুঁড়ে ওঠে।

বয়স বাড়বেই। একে আটকে রাখার কোনো উপায় নেই। জিম আর জগিং করে হয়তো সুস্থ থাকা যায়, কিন্তু বয়সকে বেঁধে রাখা যায় না। হায়াত ফুরাচ্ছে তার নিজস্ব গতিতেই। বড়দেরও ছোটদেরও। তাকদিরে লেখা হায়াতকে টাইম মেশিন দিয়ে আটকে রাখারও কোনো উপায় নেই। কেউ জানে না জীবনের কোন মুহূর্তে সেটি থমকে যাবে। শৈশবে, কৈশরে, নাকি যৌবনের উড়ন্তবেলায়।

হায়াতের সূর্য ডুবে যাবে যেকোনো মুহূর্তে। সন্ধ্যা হতে আর কতটুকুই-বা বাকি। আঁধার নামার আগেই কাজে লাগাতে হবে দিনটিকে।

কবরের নিকষ-কালো আঁধার অতি ভয়ংকর!

অদ্ভুত সাইনবোর্ড!

সেদিন এক অদ্ভুত সাইনবোর্ড দেখলাম! বিশাল এক খালি জমি। ইটের মজবুত গাঁথুনি দিয়ে বাউন্ডারি করা। জমির মাঝখানে গাঁথা আছে সাইনবোর্ডটা। সাইনবোর্ডের লেখাটায় চোখ বুলিয়েই চমকে গেলাম—'বায়নাসূত্রে এই জমির মালিক মরহুম...'।

নামের আগে 'মরহুম' শব্দটা লেগে গেছে। বায়না করে গেছে। জমি ভোগ করতে পারেনি। এর আগেই দুনিয়া ত্যাগ করতে হয়েছে। ভোগের আগেই ত্যাগ। জীবনের একটা মূল্যবান সময় কেটেছে এই জমিটা কিনতে গিয়ে। যখন ভোগ করার সময় হয়েছে, সব ছেড়েছুড়ে চলে যাওয়ার ডাক এসে গেছে!

আমাদেরই এক প্রতিবেশী জজমিয়া। সম্পর্কে আমার চাচা হন। লেকের পাড়ে চমৎকার লোকেশনে বাড়ির কাজ শুরু করেছিলেন। কত আশা; দখিনা বারান্দায় বসে মৃদুমন্দ হাওয়া খেতে খেতে বিকেলগুলো কাটিয়ে দেবেন। সামনে রাখা ছোট্ট টি-টেবিলে থাকবে চায়ের কাপ। ধোঁয়া ওঠা সেই চায়ে চুমুক দিয়ে প্রাণপ্রিয় স্ত্রীর সঙ্গে খোশগল্পে লিপ্ত হবেন। ছেলে-মেয়ে নাতি-নাতকুর নিয়ে আনন্দে কাটাবেন পড়ন্ত বিকেলগুলো।

কত্ত প্ল্যান!

বাড়ির ছাদে থাকবে নানানজাতের গাছগাছালি। একপাশে গড়ে তুলবেন পাখিদের অভয়ারণ্য। অন্যপাশে কৃত্রিম পুকুর। পুকুরে থাকবে নানান রঙের মাছ। লাল, নীল, হলুদ। মাছেরা খলবল করে খেলা করবে। জজ চাচা ছাদের সে দৃশ্য দেখতে দেখতে তৃপ্তির ঢেকুর তুলবেন।

পাঁচতলার ফাউন্ডেশন। মাত্রই তিনতলা পর্যন্ত করতে পেরেছিলেন। হঠাৎ তার কিডনি-সমস্যা শুরু হলো। ডাক্তার বলল, 'ডায়ালাইসিস করাতে হবে। অনেক টাকার প্রয়োজন। টাকা ম্যানেজ করেন।'

জজ চাচা পড়ে গেলেন টেনশনে। প্রায় সব টাকা বাড়ির পেছনে ব্যয় হয়ে গেছে। হাতে কোনো ক্যাশটাকা নেই। কিছু টাকা এখনো রড-

সিমেন্টের দোকানে বাকি। বাড়িভাড়ার টাকা থেকে সেই বাকি পরিশোধ করবেন বলে মনস্থ করেছিলেন।

এমন সময় এই দুঃসংবাদ!

যা-ই হোক, ধার-দেনা করে চিকিৎসা শুরু করলেন। চিকিৎসায় কাজ হচ্ছিল না। অবস্থা দিনদিন খারাপের দিকেই যাচ্ছিল। অনেক টাকা দরকার। দেনা করে আর কাহাতক? কে দেবে এত টাকা? অবশেষে সিদ্ধান্ত নিলেন, বাড়ি বিক্রি করে দেবেন।

সিদ্ধান্ত শুনে পরিবারের সবাই বেঁকে বসল। 'বাড়ি বিক্রি করা যাবে না। কিছুতেই না।'

'কেন?'

'আপনার শরীরের যে অবস্থা এই আছেন এই নেই। বাড়ি বিক্রি করে দিলে আমরা থাকব কই? খাব কী? কী উপায় হবে আমাদের? পথে বসব নাকি? বাড়ি আমরা বেচতে দেবো না। অন্য কোনো ব্যবস্থা থাকলে করেন। (নাহলে মরেন।)

জজ চাচা তখনই অনুভব করলেন জীবনের চরম সত্যটা। আসলে কেউ কারও জন্য না। একই ছাদের নিচে বসবাসকারী প্রাণপ্রিয় স্ত্রী, আদরের ছেলে-মেয়ে, প্রিয় আত্মীয়স্বজন—কেউ না। সবাই স্বার্থপর। নিজেদেরকে নিয়েই যত ভাবনা। কে ভাবে অন্যের কথা? কেউ ভাবে না।

বাড়ি রইল বাড়ির মতোই। জজ চাচা চলে গেলেন পরপারে। জীবনের লম্বা একটা সময় কাটিয়েছিলেন বিদেশে। কলুর বলদের মতো খেটেছেন। জান-পানি করা উপার্জন দিয়ে বাড়ি করেছেন। কত ত্যাগ, কত তিতিক্ষা। যখন ভোগ করার সময় হয়েছে, চলে গেলেন সব ছেড়ে।

জজ চাচা এখন যে বাড়িতে আছেন, কবর নামক সেই বাড়িটাই তার নিজের বাড়ি। যেটা রেখে গেছেন তা ছিল অন্যদের। কখনোই নিজের ছিল না। অন্যদের আরাম-আয়েশের জন্য আমাদের কত প্রচেষ্টা!

কিন্তু, কখনো কি ভেবেছি?

চাকরির বেতন, ব্যবসার লভ্যাংশ, প্রবাসের হাড়ভাঙা পরিশ্রমের টাকা—যাদের পেছনে ব্যয় করছি, তারা কখনো আমার পাপের ভাগ বইবে

না! বড়জোর মাটির ওপর পর্যন্ত। মাটির নিচের বাড়িটাতে আমাকে একাই যেতে হবে, কেউ আমার সঙ্গী হবে না।

প্রিয় ভাই আমার!

কত কৌশল খাটিয়ে একেকটা টাকা উপার্জন করি। কখনো কখনো হালাল-হারামের পরোয়া করি না। ব্যাংক-অ্যাকাউন্টে অ্যামাউন্ট বাড়ানোর সেকী দুর্বার গতি! প্রতিপক্ষকে টেক্কা দিয়ে এগিয়ে যাওয়ার সেকী প্রচেষ্টা! সহকর্মীকে পেছনে ফেলে পদোন্নতি পাওয়ার সেকী ঘোড়দৌড়!

অন্যদের পৃথিবী সুন্দর করার খাটুনি তো অনেক হলো। এবার একটু নিজের জন্য ভাবি! সকল বুদ্ধিমত্তা, জ্ঞান আর বিচক্ষণতা দিয়ে একবার ভাবি, ওপারে অপেক্ষমাণ নিজের পৃথিবীটার জন্য এখনো পর্যন্ত কিছু কি করেছি?

‘প’ আদ্যাক্ষরের এক অভিনেত্রী

সুন্দরী এক অভিনেত্রীর অন্ধপ্রেমে পাগল হয়ে গেছে অয়ন। প্রথমে অভিনয় দেখে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল সে। এরপর মুগ্ধ হয়েছে তার নয়নকাড়া রূপে। এখন অয়নের অবস্থা নাজেহাল। কী শয়নে, কী স্বপনে; একজনই বাস করছে এখন। সে এবং সে। তাকে ছাড়া আর কিচ্ছু চাই না তার।

অভিনেত্রীর জন্য ঘুম নষ্ট হয়ে গেছে অয়নের।

খাওয়া-দাওয়া প্রায় বন্ধ।

হৃদয়টা পুড়ে পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে। ‘আন্ত-নগর’ ট্রেনের কলকব্জা বিকল হতে বসেছে ইদানীং! যে করেই হোক প্রেয়সীকে চায় সে। তাকে ছাড়া অয়নের জীবন অর্থহীন। কিন্তু কী করে মনের কথাটা জানাবে তাকে? সে তো আর সাধারণ মানুষ না। জগদ্‌জোড়া খ্যাতি তার। ব্যস্ত সে। ব্যস্ত সেলিব্রিটি।

আজ এ দেশে শুটিং তো কাল অন্য দেশে। আজ এই লোকেশনে তো কাল ওই লোকেশনে। হাজার হাজার ভক্ত-অনুরাগী তার পেছনে ঘুরঘুর

করে। তাকে একনজর দেখার, তার সঙ্গে দুদণ্ড কথা বলার ফুরসত খোঁজে সবাই। অথচ অয়ন নিতান্তই একজন সাধারণ যুবক। সে কী পাবে জনপ্রিয় এই 'মানসী'র দেখা? জানাতে কি পারবে হৃদয়ের ব্যাকুলতা?

জানে না অয়ন।

কিচ্ছু জানে না।

শুধু একটা কথাই জানে—'তাকে আমার চাইই চাই।'

এদিকে শুধু অয়নই না, রূপবতী এই অভিনেত্রীর জন্য পাগল পুরো দেশ। উঠতি তরুণ থেকে নিয়ে যুবক, বৃদ্ধ, পৌঢ়—সবারই মন কেড়ে নিয়েছে সে। যেমন তার রূপ, তেমনই ঢলঢল যৌবন। ভালো অভিনয়ও করে। সিনেমা হলে, ইউটিউবে কিংবা নেটফ্লিক্সে তার ছবি আসা মানেই হুলুস্থুল অবস্থা। পাবলিক হুমড়ি খেয়ে পড়ে। হুহু করে বেড়ে যায় 'ভিউ'। কয়েক ঘন্টার মধ্যেই ভিউয়ারের সংখ্যা ছাড়িয়ে যায় অন্যান্য অভিনেত্রীদের চেয়ে কোটিগুণ উচ্চতায়।

এরই মধ্যে কত দেশ যে সে ঘুরে বেড়িয়েছে তার কোনো ইয়ত্তা নেই। বিভিন্ন দেশের ক্লাবে-রিসোর্টে, বারে-বাইরে তাকে নিয়ে কাড়াকাড়ি অবস্থা! পুরো দুনিয়াজুড়ে তার অবাধ বিচরণ। তার রূপের কাছে পরাজিত হয়েছে হোমড়া-চোমড়ারাও। মন্ত্রী, আমলা, বড় ব্যবসায়ী, বড় নেতা—কার সঙ্গে নেই তার সখ্য?

কাউকেই অখুশি করে না সে।

সবাই তার প্রতি সন্তুষ্ট।

তাই শতবার নগ্নতা প্রদর্শন করলেও কেউ তার দিকে আঙুল তোলার সাহস পায় না। বরং সে যত বেশি নগ্ন হয়, ততই তার ভক্ত-অনুরাগী বেড়ে যায়। ঢালিউড তো আছেই; হলিউড, বলিউড, টলিউড কোথায় নেই তার চাহিদা?

অভিনয়-গুণে সবার কাছ থেকেই সে আদায় করে নিয়েছে সমান গ্রহণযোগ্যতা। অপরাধ জগতেও রয়েছে তার আধিপত্য। আজ কাউকে খুন করছে তো কাল লুটে নিচ্ছে কারও কোটি কোটি টাকা। কেউ কিচ্ছু বলার সাহস পায় না। কোনো জেল নেই তাকে আটকায়। আটকাবে কে? সংশ্লিষ্ট সবাইই তো তার প্রেমে মুগ্ধ!

এদিকে অয়নের অস্থিরতা বাড়তেই থাকে। অভিনেত্রীর চরিত্র নিয়ে নানান কানাঘুষা হলেও অয়নের তাতে তোয়াক্কা নেই। অয়ন বরং আরও মুগ্ধ হয়! আরও ভালোবাসতে থাকে।

দীর্ঘদিন পেছন পেছন ঘুরে হঠাৎ একদিন সুযোগ পায় অয়ন। আগপাছ না ভেবে বলেই ফেলে মনের কথাটি—'আমি আপনাকে ভালোবাসি, প্রিয়তমা!'

অয়নকে অবাক করে দিয়ে, নয়ন ভোলানো হাসি হেসে অভিনেত্রীও বলে—'আমিও তোমাকে ভালোবাসি।'

হকচকিয়ে গেল অয়ন! যেন বিশ্বাসই করতে পারছিল না। এতদিন ভাবত অয়নের ভালোবাসা একপাক্ষিক। অভিনেত্রী তাকে ভালোবাসে না। এখন দেখা যাচ্ছে এই ভালোবাসা একপাক্ষিক না। দুজনই দুজনের প্রতি অনুরাগী। অয়ন খুশিতে আত্মহারা হয়ে বলল, 'সত্যিই!'

'হুম, সত্যিই। অনেক বাসি।'

'আমি আপনাকে একান্ত আপন করে পেতে চাই!'

'চাইলেই পেতে পারো। আমি একান্তই তোমার।'

অভিনেত্রীর কথা শুনে অয়ন নিজেকে সবচেয়ে সুখী মনে করতে লাগল। মনে মনে ঠিক করে নিলো, জীবন-যৌবন সব বিলিয়ে দেবে 'ও'র জন্য। হৃদয়ের পুরোটা জায়গাজুড়ে এখন থেকে ও-ই থাকবে। আর কারও স্থান নেই ওখানে। অভিনেত্রীর সামান্য ভালোবাসা পেয়েই অয়ন নিজের সর্বস্ব বিলিয়ে দিতে লাগল।

বোকা অয়ন। বুঝতেই পারল না এ ছিল সেই অভিনেত্রীর অভিনয়। সবাইকেই সে এভাবে ভালোবাসা জানায়। নিজের দিকে আকৃষ্ট করে। যখনই কেউ তার জালে জড়িয়ে পড়ে, তখনই সে তার নিজের ফায়দা হাসিল করে নেয়।

প্রিয় পাঠক, 'প' আদ্যাক্ষরের এই অভিনেত্রীটি আর কেউ না। এই অভিনেত্রীর নাম—পৃথিবী। যাকে আমরা 'দুনিয়া' নামেও চিনি। যার মতো দুর্দান্ত অভিনয়ক্ষমতা আর কারও নেই। যার প্রেমে শুধু একজন 'অয়ন' না; কোটি কোটি অয়ন বুঁদ হয়ে আছে। আমি যেন অন্তত সচেতন হই! কোটি কোটি প্রেমিক আছে যার, সেই দুশ্চরিত্রাকে আমি কেন ভালোবাসতে যাব? কেনই-বা তার প্রতারণার ফাঁদে পা দিয়ে নিজের আখেরাতকে ধ্বংস করব?

ধোঁকাবাজ দুনিয়াটা এমনই

১.

কক্সবাজারে বেড়াতে গেছেন। হোটেল নিলেন। সারা রাত জার্নি করেছেন। হোটেলে ঢুকে ফ্রেশ হলেন। বিকেলের দিকে গেলেন সমুদ্র সৈকতে। বিশাল বিশাল ঢেউ। ঢেউয়ের উচ্চতা একেকটা দুই তিনতলা ভবনের মতো। আচ্ছা ঢেউয়ের এই যে তরঙ্গ। এখানে কি কেউ প্রাসাদ বানাতে পারবে?

দুনিয়ার হায়াতের অবস্থাও সাগরের ঢেউয়ের মতোই। এই আছে এই নেই। অতএব, এখানে চিরস্থায়ী বসবাস করার চিন্তা করা যেন ঢেউয়ের ওপর প্রাসাদ নির্মাণ করার মতোই।

২.

দুনিয়াটা শয়তানের দোকান। কিছু কিনতে গেলে নকল জিনিস গছিয়ে দেবে। আবার এই দোকান মালিকই 'আপনার ব্যাগে অবৈধ মাল আছে' বলে পুলিশে ধরিয়ে দেবে। এ যেন সাপ হয়ে দংশন, ওঝা হয়ে বিষ নামানোর চতুরতা।

৪.

স্বপ্নে দেখলেন অনেক কিছুর মালিক হয়েছেন। গাড়ি, বাড়ি, টাকা, পয়সা, স্বর্ণ, হিরা। বাস্তবে পেলেন এক মুঠো চাল, ১০টা টাকা, এক টুকরো গোশত। কোনটা নেবেন?

৫.

স্বর্ণের দোকান বিক্রি হচ্ছে। লোকজন দোকানটা কেনার জন্য সিরিয়াল ধরে দাঁড়িয়ে আছে। শর্ত হলো পুরো দোকানের সব স্বর্ণ কেনার দুই মিনিট পরই মাটিতে পরিণত হয়ে যাবে। এখন কী করবেন? আপনিও কি সিরিয়ালে দাঁড়াবেন?

৬.

প্রচণ্ড রোদ। আপনি রোদে দাঁড়িয়েছেন। মাটিতে আপনার শরীরের ছায়া পড়েছে। এখন আপনি ভাবলেন, ছায়াটার জন্য সুন্দর একটা জামা বানাবেন। দরজি ডেকে ছায়ার গায়ের মাপ নিলেন। একটা পাজামারও মাপ নেওয়ালেন। সকালে তো ছায়াটা ছিল আপনার সাইজের। দুপুরের মধ্যে সেই ছায়া বেঁটে হয়ে গেল। এখন বলুন, এই জামা কার গায়ে লাগবে? না আপনার গায়ে, না ছায়ার গায়ে। মূলত ছায়া তো ছায়াই, যা এখন আছে একটু পরেই নেই। দুনিয়া হলো ছায়ার মতো। কিছুক্ষণ আপনাকে আরাম দেবে তো একটু পরেই বলবে—টা টা গুডবাই!

জাদুর টাকা

রাস্তার পাশের ফুটপাতে দাঁড়িয়ে এক জাদুকর জাদু দেখাচ্ছে। শত শত মানুষ মহা আনন্দে সেই জাদু দেখছে। জাদুকর দর্শকদের উদ্দেশে বলল—

: এখন আমি একটা সাধারণ সাদা কাগজ দিয়ে কড়কড়ে নতুন টাকা বানানোর আশ্চর্য এক জাদু দেখাব। কেউ আমাকে একটা সাদা কাগজ দিতে পারেন? একটা সাদা কাগজ প্লিজ!

দর্শকরা হাততালি দিয়ে হর্ষধ্বনি করে উঠল। অনেকেই পকেটে হাত দিলো। পকেট থেকে সাদা কাগজ বের করে জাদুকরের দিকে বাড়িয়ে দিলো। জাদুকর সবারটা নিলো না। তার একটা কাগজই দরকার। সে একজনের দিকে তাকাল। তার হাত থেকে কাগজটা নিলো। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কাগজটা দেখাল সবাইকে। একদমই সাদা কাগজ। সাধারণ। কোনো কিছুই লেখা নেই তাতে। জাদুকর শূন্যে হাত বাড়াল। 'ছু মন্তর ছুহ' বলে কীসব তুকতাক মন্ত্র পড়ল। এরপর সাদা কাগজটাতে ফুঁ দিলো।

কী আশ্চর্য!

কাগজটা কড়কড়ে ৫০০ টাকার একটা নোটে পরিবর্তন হয়ে গেল!

জাদু দেখানো শেষ হলো। জাদুকর এবার তার টিনের বাক্সটা বের করল। দর্শকদের দিকে সেটা বাড়িয়ে দিয়ে বলল—

: আমার জাদু আপনাদের কাছে কেমন লেগেছে?

: অনেক ভালো। খুবই আশ্চর্যজনক ও আনন্দদায়ক। দর্শকরা বলে উঠল।

: তাহলে আমাকে এর বিনিময় দিন। এই বাক্সটায় যে যা পারেন সাহায্য করুন। আমারও তো পেট আছে; সংসার আছে!

দর্শকরা জাদু দেখে অভিভূত। খুশি মনে টিনের বাক্সটায় যত খুশি টাকা ফেলতে লাগল। মুহূর্তেই বাক্সটা টাকায় ভরে উঠল। দর্শকদের মধ্য থেকে কেউ একজন অবাক গলায় বলে উঠল—

: একটা ব্যাপার বুঝতে পারছি না, আপনাকে সাহায্য চাইতে হচ্ছে কেন? একটু আগেই তো সাদা কাগজ থেকে টাকা বানিয়ে দেখালেন। টাকা বানানোর ক্ষমতা যার আছে তার তো কোনো অভাবই থাকার কথা না!

জাদুকর হেসে ফেলল। টাকায় ভরা বাক্সটা একপাশে রেখে বলল—

: ওটা তো একটা ভোজবাজি ছিল মশাই! জাদু মানেই তো ভোজবাজি আর হাতের সাফাই। দর্শকদের চোখে ধুলো দেওয়া। ওই টাকাটাও ছিল ভোজবাজির টাকা। আসল টাকা না। ওটা দিয়ে বাজার থেকে চাল, ডাল, লবণ, তেল—কিছুই তো কেনা যাবে না!

জাদু-মন্ত্রের এই পৃথিবীটায় সবই নকল। ভোজভাজির খেলা। সবটাই ক্ষণিকের। আসল পৃথিবী অন্য কোথাও। যেখানে ভোজভাজির কোনো মূল্য নেই। সেখানে 'নকল' বলতেও কিছু নেই। সেখানকার প্রেম-প্রীতি, সুখ-অসুখ, আনন্দ-বেদনা সবই আসল। সবই অবিনশ্বর।

: তাহলে কি নশ্বর এই পৃথিবীর জন্য কিছুই করব না?

: করব। তবে গাড়ির লুকিংগ্লাসের মতো।

: কী রকম?

: গাড়িতে দুই রকম গ্লাস থাকে। একটার নাম—ফ্রন্ট গ্লাস। বিশাল আকৃতির। যা দিয়ে সামনের পুরো পথ দেখা যায়। আরেকটা গ্লাস থাকে সাইডে। যেটাকে সাইড মিরর বা লুকিংগ্লাস বলা হয়। তো, একজন ড্রাইভার গাড়ি চালানোর সময় কী করে? সবসময় ফ্রন্ট গ্লাসটির দিকে তাকিয়েই গাড়ি চালায়। কারণ, ওটাই তার লক্ষ্য।

—জরুরি প্রয়োজনে মাঝে মাঝে সাইডে থাকা লুকিংগ্লাসটির দিকে তাকায়, কিন্তু সেটা নিতান্তই অল্প সময়ের জন্য। যেন পেছন থেকে কোনো গাড়ি এলে সহজেই বুঝতে পারে। যেন অ্যাকসিডেন্ট থেকে বাঁচতে পারে। এখন যদি কোনো ড্রাইভার ফ্রন্ট গ্লাস বাদ দিয়ে সবসময় লুকিংগ্লাসের দিকে তাকিয়ে গাড়ি চালাতে থাকে, সে কি সুস্থ অবস্থায় লক্ষ্যে পৌঁছতে পারবে? নিশ্চয় না। এভাবে চালালে তো গাড়িটি অ্যাকসিডেন্ট করবে!

দুনিয়া তো হাসিল করব, কিন্তু লক্ষ্য থাকবে আখেরাত। ঠিক যেন নদীতে চলা নৌকার মতো। নদীতে চলব, কিন্তু নদীর পানি যেন নৌকায় প্রবেশ না করে।

ট্রেনের টিকেট

দুইজন যাত্রী ট্রেনে উঠেছে। একজন টিকেট ছাড়া। অন্যজন টিকেট-সহ। যার টিকেট নেই, সে ট্রেনে উঠে এসি কামরায় ঢুকেছে। উন্নত চেয়ারে বসেছে। তার জন্য ভালো ভালো খানা আসছে।

বিরিয়ানি, রোস্ট, জর্দা, ফিরনি। যতই তার সামনে মজাদার খাবার হাজির করা হোক, তার মনে শান্তি নেই। একটা টেনশন তার সব আনন্দ মাটি করে দিয়েছে—এই বুঝি টিটিই এলো। তার কাছে টিকেট নেই। টিটিই যদি টিকেট দেখতে চায়, তখন কী উপায় হবে? কোত্থেকে দেবে ভাড়া?

আর যার কাছে টিকেট আছে, সে বসেছে সাধারণ শোভন চেয়ারে। সিট ছাড়াও অসংখ্য লোক দাঁড়িয়ে আছে। মাথার ওপর এসি তো নেইই, ফ্যানটাও ঠিক মতো ঘুরছে না। ঠ্যালা-ধাক্কা দিয়ে কোনোরকমে ঘুরানো হচ্ছে। গরমে হাঁসফাঁস অবস্থা। পাশের টয়লেট থেকে আসছে পেশাবের উৎকট গন্ধ। জেনারেটরের ঘটঘট শব্দে কান ঝালাপালা।

তবুও!

মনজুড়ে আছে অনাবিল শান্তি! টিটিইর ভয় নেই। ধরা পড়ার ঝামেলা নেই। ভয় নেই মাঝপথে নামিয়ে দেওয়ারও। কারণ, সঙ্গে আছে টিকেট।

একটু কষ্ট হয়তো হচ্ছে। কিন্তু সুখময় গন্তব্যে পৌছতে পারার মহাসুখের কাছে ওইটুকু কষ্ট কিছুই না।

'ইউরোপ-আমেরিকান ডলার-ইয়েন কামানো নাফরমানরাই দেখি ভালো আছে! এত ইবাদত-বন্দেগি করে, কম খেয়ে, কম পরে, কষ্টেসৃষ্টের জীবন কাটিয়ে আমাদের লাভটা কী হলো'—এই প্রশ্নের জবাব, ওপরের উদাহরণে আছে।

ডলার কামানো মানেই প্রশান্তি না। ইউরোপ-আমেরিকানরা কতটা 'শান্তি'তে আছে, নিচের ঘটনাটি তার প্রমাণ—

প্রখ্যাত দাঈ প্রফেসর হামিদুর রহমান স্যার তাঁর এক বইয়ে লেখেন—১৯৬৫ সালের কথা। ইংল্যান্ডের লিভারপুলে লিলি নামে এক ভদ্রমহিলার বাড়িতে ভাড়া থাকতাম। ভদ্রমহিলার এক ছেলে, এক মেয়ে। তারা একই শহরে আলাদা থাকে।

মিসেস লিলি যেদিন মারা গেলেন, ছেলে-মেয়ে কিছুই জানে না। অথচ একই শহরের বাসিন্দা। প্রথমে বুঝতে পারে দুধওয়ালা। সে বাড়ির দরজায় এসে দেখে, আগের দিনের দুধের বোতল পড়ে আছে। ভেতর থেকে কেউ নেয়নি। পরের দিনও দুধ দিতে এসে দেখে একই অবস্থা। দুধ পড়ে আছে দুধের জায়গায়। কেউ রিসিভ করেনি।

পরপর দুই দিন একই ঘটনা ঘটল।

দুধওয়ালা চিন্তিত মুখে প্রতিবেশীদের কাছে গিয়ে বলল, 'একটা বিষয় বুঝতে পারছি না!'

'কী?'

'বুড়ি কি ভেতরে নেই? ঘর তো ভেতর থেকে আটকানো!'

দরজা ভেঙে দেখা গেল, বুড়ি ঘরের ভেতর মরে পড়ে আছে। শেষ সময়ে আদরের সন্তানদের যত্নটুকুও পেল না। একা একা অসহায়ের মতো চলে গেছে।

প্রশান্তি তাহলে কোথায়?

টাকার মধ্যে?

বড় একটা বাড়ির মধ্যে?

মোটাসোটা ব্যাংক-ব্যালেন্সের মধ্যে? নাকি ভালো ভালো খানাপিনার মধ্যে? এগুলোর কোনোটাতেই মূলত শান্তি নেই।

ওদের অনেক টাকা আর প্রাচুর্য থাকতে পারে। কিন্তু মানবিক গুণাবলি আর মানসিক প্রশান্তি একেবারেই ভিন্ন জিনিস। যেটা না টাকায় কেনা যায়, না সম্পদের বিনিময়ে হাসিল করা যায়।

প্রশান্তি আছে 'দ্বীন' নামক টিকেটের মধ্যে। জীবনে দ্বীনদারি আছে, তো প্রাচুর্য না থাকলেও প্রশান্তি আছে। সম্পদ না থাকলেও সন্তুষ্টি আছে। অর্থ না থাকলেও ব্যর্থতাকে 'বুড়ো আঙুল' দেখানোর মতো ঐশ্বরিক শক্তি আছে।

এখন আমিই ভাবি, কী করব? নাফরমানদের প্রাচুর্য দেখে হিংসায় জ্বলব, নাকি মহান মালিকের ফরমাবরদারি করে এপার-ওপারে প্রশান্ত হৃদয়ের মালিক হব!

খুন করার আগে খুনির মৃত্যু

অদ্ভুত লাগছে না শিরোনামটা! খুলেই বলি তাহলে।

...নাসির সাহেব। পেশায় টিচার। ভদ্র মানুষ। চলা, বলা, গাম্ভীর্যতায় অনন্য এ মানুষটির খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিল না হঠাৎ করেই।

চাকরি থেকে অবসর হওয়ার পর মোটা একটা অ্যামাউন্ট পেনশন পেয়েছিলেন। সেই টাকায় চারতলা বাড়ি করলেন। আরও কিছু টাকা অবশিষ্ট ছিল। সেই টাকা আর বাড়িটার ওপর চোখ পড়ল দুর্বৃত্তদের। আক্রমণটা হঠাৎ করেই করেনি ওরা। পুরো ঘটনাই ঘটিয়েছে পরিকল্পনামাফিক।

সুস্থ মানুষ। গণ্যমান্য লোক। পাড়ার সবাই সমীহ করত। বয়স হয়েছিল যদিও, কিন্তু শক্তসমর্থ ছিলেন। প্রাণবন্ত এই লোকটাকে দুর্বৃত্তরা কী নৃশংসভাবেই না শেষ করে দিয়েছিল!

বিস্ময়কর ঘটনা হলো, দুর্বৃত্তরা বাইরের কেউ না। ঘরের লোকই! স্বয়ং প্রিয়তমা স্ত্রী আর প্রিয় সন্তানেরা। মূল হোতা ছিলেন স্ত্রীই। সন্তানদের

একদিন ডেকে বললেন, 'বুড়োটা যতদিন না মরবে, সম্পদের এক কানাকড়িও ভোগ করতে পারবি না। দেখছিস তো, কীভাবে সবকিছু কুক্ষিগত করে রেখেছে! কতদিন অপেক্ষা করবি? কিছু একটা কর!'

সন্তানদেরও যেন তর সইছিল না। বাবার অঢেল টাকা। বিরাট বাড়ির ভাড়া আর ব্যাংক-ব্যালেন্স। বুড়োটা একটা টাকাও সহজে দিতে চায় না। টাকা-পয়সা চাইলে নানান জবাবদিহি করতে হয়।

-কেন লাগবে?

-কী করতে চাও টাকা দিয়ে?

-সেদিনই তো টাকা নিলে আবার এখনই কেন?

-এভাবে দুহাতে টাকা-পয়সা উড়াতে চাও কেন? আমার মরার পর তো সবই তোমাদের হয়ে। তখন না হয় উড়িও।

তো, কবে মরবে বুড়ো! কবেই-বা সব নিজেদের হবে! এত অপেক্ষা করার সময় কোথায়?

ভদ্রলোককে দীর্ঘদিন ধরে ওষুধ প্রয়োগ করা হচ্ছিল। তিনি বুঝতেও পারছিলেন না কী ঘটছে। ওষুধের প্রভাবে দ্রুতই বুড়িয়ে যাচ্ছিলেন। শরীরে বাসা বাঁধতে থাকল নানান রোগবালাই। চলতে পারতেন না। বাড়ির ভেতরে দীর্ঘদিন আটকে ছিলেন। পাড়া-প্রতিবেশীরা খোঁজ পাচ্ছিল না। মসজিদের নিয়মিত মুসল্লিদের কাতারে, বিকেলে বাড়ির পাশের মাঠে প্রবীণদের স্মার্ট আড্ডায়, কিংবা ভোরের 'ডায়াবেটিস রাস্তায়' তাকে আর আগের মতো পাওয়াই যাচ্ছিল না।

ছেলেদের কাছে খোঁজ জানতে চাইলেই বলত, 'বাবা খুব অসুস্থ। বেডরেস্টে আছেন। বাড়ি থেকে বের হওয়া ডাক্তারের নিষেধ!'

একদিন সকালেই ঘটল দুর্ঘটনাটা। ভদ্রলোকের স্ত্রী ছাদের গাছগুলোতে পানি দিচ্ছিলেন। পাইপ দিয়ে বেশ স্পিডে পানি পড়ছিল। কার্নিশের সঙ্গে ঝুলছিল ফোরফোর্টি লাইনের তার। সাবধানই ছিলেন তিনি। সবসময়ই সাবধানে পানি দেন। আজ যেন কী হয়ে গেল। যেন মৃত্যুটা প্রবল আগ্রহে ওত পেতে ছিল।

ভদ্রমহিলার চিৎকারে হইচই পড়ে গেল। নিচ থেকে লোকজন ছোটাছুটি করে দৌড়ে ছাদে যেতে লাগল। ততক্ষণে সব শেষ। খুন করার আগেই খুনির মৃত্যু।

ঘটনা আরও আছে।

বাবাকে তো মা আর সন্তানেরা মিলে আগেই আধমরা করে রেখেছিল। মায়ের নৃশংস মরণের পর আধমরা বাবা আর বেশিদিন বেঁচে রইলেন না। অত্যাচারে জর্জরিত হয়ে তিনিও চলে গেলেন কিছুদিন পর। আগে মা, পরে বাবা। পথের দুটো কাঁটাই তো শেষ। ভাইদের তাতে পোয়াবারো হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু, না। নাটাই তো অন্য কারও হাতে! তিনি তা হতে দিলেন না।

সম্পত্তি নিয়ে ভাইয়ে ভাইয়ে বিরাট ঝগড়া বেধে গেল। তুমুল ঝগড়া। মাথা ফাটাফাটি অবস্থা। পুলিশ এলো। থানায় মামলা হলো। থানা-পুলিশ করে করে দুই ভাইকে অল্প কদিনেই নিঃস্ব হতে হলো।

অন্যের ক্ষতি করার আগে মনে রাখতে হবে, ওপরে একজন আছেন। তাঁর হাতেই ঘুড়ির নাটাই। আমার শত প্ল্যান, শত কূটবুদ্ধি একটা হেঁচকা টানেই তিনি ভেস্তে দিতে পারেন। সকল ক্ষমতা নিঃসন্দেহে একমাত্র তাঁরই।

আল্লাহর দান বিরিয়ানি

বাড়ির পাশের বাসস্ট্যান্ডে একটা বিরিয়ানির দোকান আছে। আল্লাহর দান বিরিয়ানি। ভালোই রাঁধে। সুস্বাদু। দোকানের সামনে দিয়ে গেলে আপনাকে থমকে দাঁড়াতেই হবে। বিরিয়ানির ম ম করা সুঘ্রাণ আপনার নাকে এসে লাগলে লোভী হয়ে উঠবেনই উঠবেন। এর অসাধারণ স্বাদ জিভে না লাগিয়ে ফিরে যেতে ইচ্ছাই করবে না।

দোকানটা ভালোই চলছিল। ছোট্ট দোকান। সারাক্ষণ ভিড় লেগে থাকত। কিছুদিন যেতেই নতুন আরেকটা দোকান গড়ে উঠল। এই দোকানের নাম—ঢাকার কিং বিরিয়ানি। চমৎকার ডেকোরেশনে আলো-আঁধারি লাইটিং। পরিচ্ছন্ন। সু-পরিসর। তবুও চলছিল না।

আমরা বাঙালিরা যা করি। অন্যের ভালো সহ্য করতে পারি না। এটা মুসলমানদের গুণ থাকার কথা ছিল না। মুসলমান তো সারাক্ষণ অন্যের ভালো চাইবে! অন্যের স্বার্থে জীবন বিলিয়ে দেবে।

এক সাহাবির দোকান ছিল মদিনার বাজারে। বিক্রি-বাট্টা ভালোই হতো। পাশের দোকানির বেচাকেনা কম। কাস্টমার নেই। বেচারা মন খারাপ করে থাকে। বেচাকেনা নেই। সংসারে রাজ্যের খরচ। কী করে সামলাবে এত খরচ? চিন্তিত।

সাহাবি সেই দোকানির কথা ভাবলেন। কাস্টমারকে বলতে লাগলেন, 'অনুগ্রহ করে ওই দোকানে যান। আমার দোকানে যা আছে, ওর দোকানেও তাই আছে। দামও একই। দয়া করে ওই দোকান থেকেই কিনুন।'

অবাক লাগছে না? আমাদের ব্যবসায়ীরা কেউ এমনটা করে? স্বেচ্ছায় নিজের দোকানের গ্রাহকদের অন্য দোকানে পাঠিয়ে দিতে দেখেছেন কখনো? দেয় না। দিতে চায় না। মন মানে না আসলে। অন্যের মঙ্গলের জন্য মনটা কাঁদে না। 'বেচাইন' হয় না। বরং উলটোটা চাই আমরা। কী করে পাশের দোকানের লস করা যায়। তল্পিতল্পা গুটিয়ে পালাতে বাধ্য করা যায়।

ডেকোরেশন করা বিরিয়ানিওয়ালাও এমনটাই ভাবল। কীভাবে 'আল্লাহর দান'-এর ক্ষতি করা যায়? ভাবতে লাগল ওই দোকানের কাস্টমার বাড়ানোর মূল টেকনিক কী? অনেক ভেবেচিন্তে আবিষ্কার করল—সুঘ্রাণই এর মূল কারণ।

'ঢাকার কিং' এবার অভিনব পন্থায় এগিয়ে গেল। নিজের দোকানের পক্ষে লিফলেট ছাপাল। ভালো কথা! ছাপাও। কিন্তু অন্যের বদনাম করতে হবে কেন বাপু! লিফলেটে যা লিখল, তার অর্থ—সুঘ্রাণ দেখলেই পাগল হয়ে যাবেন না। ওই সুঘ্রাণের আড়ালে ক্যামিকেল থাকতে পারে! আমাদের এখানে আসুন। ক্যামিকেল নেই। একশ ভাগ ভালো খাবার।'

আমি যতই অন্যের ক্ষতি করতে চাই, আল্লাহ না চাইলে হবে না। লাভ-ক্ষতি আমার হাতে না। আল্লাহর হাতে। লিফলেটের ওই প্রচারে কাজ হলো না। উলটো ফল হলো। পাবলিক এখন মারাত্মক! অনেক সচেতন। 'কিং' এর জারিজুরি বুঝে ফেলল। আগে যা-ও কিছু কাস্টমার ঢুকত, সেটাও কমে গেল। মাত্র এক মাসের মামলা। অন্যের ক্ষতি করতে চেয়ে কিং-ই বরং ল্যাং খেয়ে, এক মাসের মধ্যে তল্পিতল্পা বেঁধে বাড়ির পথ ধরল।

দুর্গন্ধের উৎস

মসজিদের আশপাশ থেকে প্রচণ্ড দুর্গন্ধ আসছে। প্রথমে ভেবেছিলাম ইঁদুর-টিদুর হবে হয়তো। মরে পড়ে ছিল। এখন দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে।

সকাল, দুপুর, সন্ধ্যা।

ধীরে ধীরে দুর্গন্ধ বাড়তে লাগল। দরবার, ফেরদাউস, নাইম, বেলিফুল—আতর মেখেও কাজ হচ্ছিল না। টেকাই দায় হয়ে পড়ল। রুমালকে বাধা হিসাবে দাঁড় করিয়েও রেহাই পাওয়া গেল না। চাপা দেওয়া রুমাল ভেদ করেও গন্ধটা আসছিল।

রাতেও যখন একই অবস্থা চলতে থাকল, টনক নড়ল সবার। ব্যাপার কী? গন্ধটা আসছে কোত্থেকে! মুসল্লিরা টর্চ নিয়ে উৎস খুঁজতে বেরিয়ে পড়ল। ইঁদুরমরা হলে তো এত দূর গন্ধ ছড়াত না! নিশ্চয় অন্যকিছু। বিড়াল, শেয়াল অথবা কুকুর মরা নয়তো!

বেশ কিছুক্ষণ খোঁজাখুঁজির পর পাওয়া গেল উৎস। একে অন্যের মুখ চাওয়াচাওয়ি করল মুসল্লিরা। গামছা, রুমাল, কাপড় দিয়ে নাক চেপে ধরল। 'ওয়াক থুহ' করে একদলা থুথু ফেললেন বৃদ্ধ জমির শেখ।

একটা লাশ।

কবরের ওপরে পড়ে আছে।

লাশটা আর কারও না—দবির চৌধুরির। শেয়াল-কুকুরের নখের আঁচড়ে দবির চৌধুরির নাজেহাল অবস্থা। পেট ফুঁড়ে নাড়িভুঁড়ি বেরিয়ে এসেছে। বড় জঘন্য এক অবস্থা। কদিন আগেই দাফন করা হয়েছিল তাকে।

এরও কয়েক দিন আগে ক্ষমতার দাপটে কী না করেছে সে? মানুষকে মানুষই মনে করেনি। গায়ের জোরে অন্যের সম্পদ নিজের করে নিয়েছে। গরিব কৃষক ময়নাল-সহ অন্যান্যদের জমি দখল করে গড়ে তুলেছে রিয়েল এস্টেট কোম্পানি। নিরীহ আনসার উদ্দিনের দোকান উচ্ছেদ করে, গড়েছে ইট-বালুর গদি।

আর আজ?

অন্যায় পথে গড়া কোটি টাকার বাড়ি ছেড়ে পড়ে আছে মাটির নিচে। পরিণত হয়েছে শেয়াল-কুকুরের খাদ্যে।

কী এক করুণ পরিণতি! সব অত্যাচারীদেরই এই পরিণতি বরণ করতে হবে। আরাম-আয়েশে লালিত হওয়া দেহ-পিঞ্জিরা পরিণত হবে দুর্গন্ধের উৎসে। ক্ষমতার অপব্যবহারকারীদের কি বোঝার মতো সময় এখনো আসেনি?

ঠকবাজ-চালবাজ

অনেকদিন ব্যবহার করা সিমটা হঠাৎ ব্লক হয়ে গেছে। কোড নম্বর দিলেই চালু হয়ে যায়। কিন্তু পাব কোথায় কোড নম্বর? সিম কেনার সময় সঙ্গে থাকা কার্ডে কোডটা লেখা থাকে। কার্ডটা ততটা যত্ন করে রাখা হয় না। সিম লাগানোর পর কার্ড ফেলেই দেওয়া হয় সাধারণত।

বাড়ির পাশের সিম রিপ্লেসমেন্ট অফিসে গেলাম। লোকটা বলল, 'কোড নম্বর পাওয়া যাবে না। রিপ্লেস করতে হবে। চার্জ লাগবে ২০০ টাকা।'

কী আর করা! জরুরি জিনিস। কত জায়গা থেকে কল আসে। বন্ধ করে তো আর ফেলে রাখা যায় না। ২০০ টাকা খরচ করে সিমটা রিপ্লেস করতে হলো। অথচ পরে জানতে পারলাম, খরচ ছাড়াই ঠিক করা যেত।

কীভাবে?

সব সিম কোম্পানির অ্যাপস আছে। একটু চেষ্টা করলেই অ্যাপস থেকে কাজটা বিনা মূল্যে করে ফেলা যায়।

বন্ধু আজিজের মোবাইল ফোনে সমস্যা হচ্ছিল। টেকনিশিয়ান কতক্ষণ নেড়েচেড়ে বলল, 'বিগ প্রবলেম। রেখে যান। দুইদিন পরে আসেন।'

'কী প্রবলেম? যদি বলতেন!'

টেকনিশিয়ান নানান ফিরিস্তি দিতে লাগল। এটা নষ্ট, ওটা পালটাতে হবে; অমুকটা কাজ করছে না, তমুকটা সার্ভিসিং করতে হবে। বন্ধু বলল, 'কত টাকা লাগবে?'

'হাজার খানেক তো লাগবেই।'

ফোনটার দামই ১২ হাজার টাকা। বেশিদিন ব্যবহারও করা হয়নি। এখনই ১ হাজার টাকা খরচ করতে কারই-বা ইচ্ছা করে! বন্ধু মন খারাপ করে ফোন ঠিক না করেই চলে এলো।

অথচ পরে জানা গেল সেটিংসে সমস্যা হয়েছে। বাচ্চারা টিপেটুপে সেটিং গড়বড় করে ফেলেছিল। যা এক মিনিটেই ঠিক করা গেছে। কোনো কিছু নষ্ট হওয়ার তো প্রশ্নই আসে না।

আরেক বন্ধুর গাড়ি। নতুন কিনেছে। বহু কষ্টের টাকা। কিনে রেন্ট-এ কারে ভাড়া দিয়েছে। কয়েক মাস পর। ড্রাইভার বলল, 'ঝামেলা হয়েছে। ঠিক করাতে হবে। টাকা লাগবে।'

'সেকী, নতুন গাড়ি! এত তাড়াতাড়ি ঝামেলা! কত টাকা লাগবে?'

ড্রাইভার-সহ বন্ধুটি নিজেই গেল মেকানিকের কাছে। অনেক টাকা খরচ করে গাড়িটি ঠিক করা হলো। পরে জানা গেল, গাড়িতে কোনো সমস্যাই ছিল না। বন্ধুর কষ্টের টাকা, ড্রাইভার আর সেই মেকানিক মিলে ভাগ-বাটোয়ারা করে নিয়েছে।

আমার সঙ্গে ঘটে যাওয়া আরেকটা ঘটনা বলি। কয়েক বছর আগের কথা। জীবনে প্রথম দেশের বাইরে যাচ্ছি। এয়ারপোর্টের অনেক নিয়মকানুন। ভালো করে জানি না সব। প্রিয়জনদের ছেড়ে চলে যাচ্ছি। এমনিতেই মন খারাপ। ইমিগ্রেশনের সব ফরমালিটি শেষ করে বিমানে উঠতে যাব, ঠিক সেই সময় 'লাস্ট চেকিংয়ে' দাঁড়িয়ে থাকা কর্মকর্তারা আমাকে আটকে দিয়ে বলল, 'সঙ্গে নগদ টাকা কত আছে?'

আমি সরল মনে বললাম, 'হাজার দশেক।'

'এত টাকা তো সঙ্গে নিতে পারবেন না।'

'কেন?'

'এটাই নিয়ম। সর্বোচ্চ ২ হাজার টাকা নিতে পারবেন। বাকিগুলো পরিবারের লোকজনদের কাছে রেখে যেতে হবে।'

মহা ঝামেলা দেখছি! অনেকক্ষণ ধরে ভেতরে ঢুকেছি। ইমিগ্রেশনের আনুষ্ঠানিকতা সারতে সারতে ইতিমধ্যেই দীর্ঘ সময় ব্যয় হয়ে গেছে। পরিবারের লোকেরা কি এখনো দাঁড়িয়ে আছে? ওরা তো আমাকে বিদায় জানিয়ে আরও আগেই চলে গেছে।

বিমানে উঠব এখন। এই সময় এ কোন ঝামেলা?

আমাকে 'উদ্ধার' করলেন এক কর্মকর্তা। আড়ালে ডেকে নিয়ে ফিঁসফিসিয়ে বললেন, 'চা-নাস্তার জন্য শ-পাঁচেক দিয়ে যান। বাকিটা আমি দেখছি। নয়তো বিমান ছেড়ে দেবে। আপনি আটকে যাবেন।... ভেবে দেখুন কী করবেন।'

অগত্যা ৫০০ টাকা (কুকুরকে হাড্ডি দেওয়ার মতো করে) দিয়ে বিমানে উঠলাম। পরে জানা গেল, ওরা আমাকে 'নতুন' পেয়ে বোকা বানিয়েছে। আদৌ এমন কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই। সবটাই ধান্দাবাজি। নতুন যাত্রীদের চেহারা দেখলেই বুঝে যায় ওরা। সুযোগ বুঝে 'টু-পাইস' কামিয়ে নেয়। ঠিক যেন রাস্তার পকেটমারদের মতো। পথচারীর হাবভাব আর চলাফেরা দেখলেই বুঝে যায় কার কাছ থেকে কতটা 'কামিয়ে নেওয়া' যাবে।

মাত্র ৫০০ টাকার জন্য স্যুটেড-বুটেড ভদ্রলোকগুলোর এহেন কর্মকাণ্ড দেখে সেদিন করুণা হয়েছিল। মনে হয়েছিল এর চেয়ে তো রাস্তার ফকিরগুলোও ভালো!

এই যে, অন্যকে ঠকিয়ে বড় হওয়ার চেষ্টা। আসলেই কি বড় হওয়া যায়? হয়তো যায়। ক্ষণিকের জন্য। কিন্তু এর পরিণতি বড় ভয়ংকর, বড় পীড়াদায়ক, বড় যন্ত্রণাকর!

আমার নিজ চোখে দেখা এক পুলিশ কর্মকর্তা। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়েন। দান-খয়রাতও করেন। হলে কী হবে? উপার্জন হালাল হলে তবেই তো। ভদ্রলোকের একটা মেয়ে আছে। প্রতিবন্ধী। কথা বলতে পারে না। হাঁটাচলা অস্বাভাবিক। ধরে ধরে হাঁটাতে হয়। অন্য আরও অনেক অসুস্থতা আছে। প্রতিমাসে আদরের মেয়ের চিকিৎসার পেছনে প্রচুর টাকা ব্যয় করা হচ্ছে। কিন্তু সুস্থতার কোনো লক্ষণ নেই।

সব পুলিশ একরকম না নিশ্চয়! কিন্তু কিছু কিছু পুলিশদের উপার্জন নিয়ে অনেক কথা শোনা যায়। এই ভদ্রলোকের আয়-ইনকাম নিয়েও অনেক

কথা শুনেছি। যা আয় করেন, ব্যয় তার চেয়েও বেশি। সংসারে শান্তি নেই। তার ওপর অসুস্থ মেয়ে। বাবা হয়ে মেয়ের এই অস্বাভাবিকতা দিনের পর দিন সহ্য করতে হচ্ছে। এজন্য কি ভদ্রলোক নিজেই দায়ী না?

হয়তো এই ভদ্রলোকের কাছে অনেক বাবা বিচার নিয়ে এসে ন্যায়বিচার পায়নি। অথবা তার কারণে কেউ না কেউ অন্যায়ভাবে ফেঁসে গেছে! অথবা টাকা খেয়ে অন্যকে ঠকিয়ে নিজের পকেট ভারী করেছে!

কারও অসহায়ত্বের সুযোগ নিয়ে ঠকিয়ে যাওয়া। এটা কখনোই জিতে যাওয়ার মাপকাঠি হতে পারে না।

একটা গল্প পড়েছিলাম। একজন বুড়ো মুদি দোকানদারের কাছে অনেকেই বাকি খেত। কেউ চাল। কেউ ডাল। কেউ পান। কেউ সিগারেট। টাকা চাইলেই বলত—'লিখে রাখো দাদু! সময় হলে সব একসঙ্গে পরিশোধ করে দোবো!'

আসলে প্রত্যেকেরই উদ্দেশ্য ছিল, বাকি খেয়ে খেয়ে বুড়োকে ফাঁকি দেওয়া। কীসের পরিশোধ, কীসের কী! বাকি দিতে দিতে বুড়ো লোকটা ফতুর হয়ে গেল। বুড়ো মানুষ। অসুখবিসুখ লেগেই ছিল। একে তো দোকানে মালামাল নেই। তার ওপর চিকিৎসার ব্যয়। ভালো চিকিৎসা করাতে না পেরে বৃদ্ধ একদিন দুনিয়া থেকে চির বিদায় নিয়ে চলেই গেল।

পরদিন সকালে এসে দেখা গেল দোকানটা বন্ধ। বাকিখোররা খোঁজ লাগাল—'ঘটনাটা কী? বুড়োটা আজ দোকান খুলছে না কেন?'

লোকজন বলল, 'বুড়ো মারা গেছেন।'

বাকিখোরদের মাথায় যেন বাজ পড়ল। পকেটে পয়সাকড়ি নেই। একমাত্র বুড়োটাই ছিল, যাকে ধোঁকা দিয়ে বাকি খেয়ে কাজ চালানো যেত। এখন উপায়! তবে বুড়োর কাছ থেকে বাকি খাওয়া টাকাগুলো আর পরিশোধ করতে হবে না ভেবে ওরা চরম আনন্দিত হলো।

আসলে কি এভাবে বুড়ো লোকটাকে ঠকিয়ে বাকিখোর লোকগুলো জিতে গেল? মোটেও না। বরং উলটো নিজেরাই বড় নৃশংসভাবে ঠকে গেল! বুড়ো বেঁচে থাকতে যদি টাকাগুলো পরিশোধ করে ফেলত, তাহলেই বেঁচে যেত। এখন তো আর কোনো উপায়ই রইল না। একটা উপায় অবশ্য আছে। বৃদ্ধের ঘরওয়ালাদের কাছে টাকাগুলো পরিশোধ করে মাফ চেয়ে নেওয়া।

কিন্তু যারা দিনের পর দিন পরিচিত-অপরিচিত বিভিন্ন লোকদেরকে পথে-ঘাটে, বাজারে-দোকানে, এখানে-সেখানে ঠকিয়ে যাচ্ছে—তাদের উপায় কী? তারা কার কাছে মাফ চাইবে?

সুতরাং সামান্য ফুটো পয়সার জন্য হলেও অন্যকে ঠকানোর আগে চিন্তা করা উচিত—নিজেই ঠকে যাচ্ছি না তো!

লোক ঠকিয়ে পয়সা কামানোকে কেউ কেউ আবার বাহাদুরিও মনে করে! আমার এক আত্মীয় বিদেশে চাকরি করতেন। অনেক পরিশ্রমের কাজ ছিল বেচারার। না খেয়ে, রোদে পুড়ে, বৃষ্টিতে ভিজে, হাড়ভাঙা খাটুনি খেটে বেশ কিছু টাকা জমিয়েছিলেন। বড় আশা নিয়ে দেশে এলেন। দীর্ঘদিনের উপার্জন, কষ্টের এই টাকাগুলো দিয়ে একটা দোকান কিনবেন বলে ঠিক করলেন।

নারায়ণগঞ্জের সাইনবোর্ড নামক এলাকার মিতালি মার্কেট। বিশাল এরিয়া নিয়ে বহুতল ভবন নির্মিত হওয়ার বিজ্ঞাপনসংবলিত বিলবোর্ডগুলো হয়তো তখনকার সময়ে অনেকের চোখেই পড়ে থাকবে। এখানে তখন অল্পদামে দোকান পাওয়া যাচ্ছিল। আমার সেই আত্মীয় সারা জীবনের সব উপার্জন মার্কেট কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দিয়ে বললেন, 'অনেক কষ্টের টাকা। ঠকে যাব নাতো! আমার দোকান অন্য কেউ দখল করে নেবে নাতো!'

কর্তৃপক্ষ বলল, 'কী যে বলেন! ঠকবেন কেন? ছাদে আসেন, আপনারে একটা জিনিস দেখাই।'

ছাদে যেতেই ওরা বেশ কিছুটা দূরের একটা প্লট দেখিয়ে বেশ বাহাদুরির সঙ্গে বলল, 'ওই যে প্লটটা দেখছেন? ওটা আমরা কিনতে চেয়েছিলাম। প্লটমালিক বেঁকে বসল। বিক্রি করবে না বলে আমাদের মুখের ওপর সাফ জানিয়ে দিলো। আমরা যে কী জিনিস ওই ব্যাটা তো চিনে নাই! আমরা কী করলাম জানেন?'

'কী করলেন?'

'আশেপাশের সব প্লট কিনে ওই ব্যাটারে এমন কোনঠাসা করলাম, উড়োজাহাজ ছাড়া ওই ব্যাটা এখন আর নিজের প্লটে ঢুকতে পারবে না। আমরা এমনই লোক! আমাদের জায়গা দখল করে এমন কেউ এই দুনিয়ায়

জন্মায় নাই। নিশ্চিন্তে থাকেন। আপনার দোকান আপনারই থাকবে। কেউ দখল করতে পারবে না।'

পরে জানা গেল, আমার আত্মীয়টি হচ্ছেন এই দোকানের নয় নম্বর কাস্টমার। এর আগে আরও আটজনের কাছে এই দোকান বিক্রি করা হয়েছে। কেউ দখলে যেতে পারেনি। সবাইকেই ধোঁকা দিয়ে টাকা খেয়েছে। আমার আত্মীয়টি হচ্ছেন ওদের ধোঁকাবাজির নয় নম্বর শিকার!

শুধু এই একটা দোকানই না; পুরো মার্কেটই ক্ষমতা আর টাকার জোরে একেকজন একেকবার দখল করে নিয়েছে। এতে কি লোকগুলো জিতে গেছে?

কখনোই না।

খোঁজ নিলে জানা যাবে একজনও শান্তিতে নেই। একদিক থেকে আয় করেছে, অন্যদিক দিয়ে বেরিয়ে গেছে কোটি কোটি টাকা। অন্যকে ঠকিয়ে বড় হতে চাওয়া এই লোকগুলোর অনেকে হয়তো এরই মধ্যে কবরে কীট-পতঙ্গের খাদ্যে পরিণত হয়েছে।

নিরীহ জনতার আহাজারি নিশ্চয় ওদের জন্য ভালো ফলাফল বয়ে আনেনি! আনবেই-বা কেন? আনার তো কথা না!

সুইসাইড নোট

'আমি হত্যা করব ছোটবোন আর নানীকে। আমার ভাই করবে মা-বাবাকে। এরপর উভয়ে আত্মহত্যা করব। ব্যস, সব শেষ! কেউ থাকবে না আর আমাদের শোকে কষ্ট পাবার।...'

যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাস স্টেটের, ডালাস-সংলগ্ন এলেন সিটি। এখানে বাস করত এক বাংলাদেশি পরিবার। পরিবারের সদস্যসংখ্যা ছয়। বাবা, মা, দুই ভাই, এক বোন আর নানি। একরাতে ছয়জনই খুন হয়। হত্যাকারী আর কেউ না; ছয় সদস্যদেরই দুজন। সম্ভাবনাময় তরুণ দুই ভাইই খুন করে নিজেদের পরিবারের সবাইকে। এরপর নিজেরাও সুইসাইড করে।

সেদিন ভোররাতে টেলিফোন পায় এলেন সিটির পুলিশ। বাসাটিতে গিয়ে দেখে নৃশংসভাবে পড়ে আছে ছয় সদস্যের লাশ। তদন্তের পর পুলিশ জানায়, দুভাই মিলে তাদের মা-বাবা, নানি এবং একমাত্র বোনকে হত্যার পর নিজেরাও আত্মহত্যা করে।

দুইভাইয়ের একজনের নাম ফারহান। মূলত সে-ই হত্যাকাণ্ডের মূল পরিকল্পনাকারী। মাত্র ১৯ বছর বয়স ফারহানের। এই বয়সে কেন করল সে এই নৃশংস কাজটা? হত্যার আগেই ফারহান তার ফেসবুক স্ট্যাটাসে বর্ণনা করে গেছে সেসব। পুরো স্ট্যাটাসটিতে রয়েছে হতাশার ধারাবিবরণী।

ওই পরিবারের এক প্রতিবেশী বলেন, 'যথারীতি আমরা কাজে গেছি। কিছুই বুঝিনি যে, ওরা কেউ আর বেঁচে নেই। এই পরিবারের ব্যাপারে আমাদের বেশি ধারণাও নেই। তবে এইটুকু জানি যে, পরিবারের একমাত্র তরুণীটি খুবই মেধাবী ছাত্রী ছিল। আমার মেয়ের স্কুলেই পড়ত।

আরেক প্রতিবেশী জানান, তাদের বিষয়ে খুব বেশি জানতাম না। তবে তারা সুখী পরিবার ছিল বলেই মনে হতো। সোমবার সকাল সাড়ে ৭টায় কাজ থেকে ফিরেই দেখি পুলিশের উপস্থিতি। অবাক হয়েছি ঘটনা জেনে।

বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব নর্থ টেক্সাসের সেক্রেটারি নাহিদা আলি হতাশার সাথে জানান, 'এমন সংবাদে সকলেই হতভম্ব। শোকাচ্ছন্ন গোটা

কমিউনিটি। ৫৬ বছর বয়সী বাবা তৌহিদুল ইসলাম খুবই ভালো মানুষ ছিলেন। তার স্ত্রী আইরিন ইসলাম আসতেন কমিউনিটির অনুষ্ঠানে। সবসময় তার দুইপুত্র তানভির ও ফারহানকে নিয়ে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করতেন। একইভাবে তাদের মেধাবী কন্যা পারভিনকে নিয়েও তার গর্বের শেষ ছিল না।

পারভিন পড়ত নিউইয়র্ক ইউনিভার্সিটিতে। সপ্তাহখানেক আগে তাকে নিউইয়র্ক থেকে বাসায় আনা হয়। ফারহান গত বছর ভর্তি হয়েছিল ইউনিভার্সিটি অব টেক্সাসে। তানভিরও পড়ত একই প্রতিষ্ঠানে। তার এবারই গ্র্যাজুয়েশনের কথা। এমন একটি পরিবারের সবাই একসঙ্গে নিঃশেষ হয়ে যাবে, এটি ছিল কল্পনারও অতীত।'

কী ছিল ফারহানের সেই ফেসবুক স্ট্যাটাসে?

'২০১৬ সালে নবম গ্রেডে পড়ার সময় আমি বিষণ্নতায় আক্রান্ত হয়ে পড়ি। এজন্য আমি পরীক্ষায়ও ফেল করি। আজকেও আমি আমার শরীর দুইবার কেটেছি। কষ্ট পেয়েছি যদিও। তবে কিছুটা হলেও প্রশান্তি পেয়েছি। আমার মনে আছে ২০১৭ সালের ২২ আগস্ট, ওই প্রথম ধারালো অস্ত্র দিয়ে নিজেকে নিজে রক্তাক্ত করেছিলাম। অনুভব করেছি অসহনীয় যন্ত্রণা। মনে হতো, বয়ে যাওয়া রক্তের সঙ্গে বুঝি বিষণ্নতাও কেটে যাবে। যায়নি। তবুও প্রায় প্রতিদিনই ছুরি-চাকুর ভেতর দিয়ে বিষণ্নতার দুঃখবোধ লাঘবের পথ খুঁজেছি।

আমার এ অস্বাভাবিক আচরণ দেখে আমার ঘনিষ্ঠ তিন বন্ধু আমাকে ত্যাগ করেছে।

এমন হতাশার মধ্যেই আমাকে ভর্তি করা হয় ইউনিভার্সিটি অব অস্টিনে কম্পিউটার সায়েন্স ডিপার্টমেন্টে। মনে হয়েছিল, এবার বুঝি জীবনটা সঠিক ট্র্যাকে উঠেছে। উঁহু, বাস্তবে তা ঘটেনি। বিষণ্নতায় জর্জরিত হয়ে পুনরায় আমি নিজের শরীর রক্তাক্ত করি এবং কাঁদতে কাঁদতে বিছানায় ঘুমাতে যাই। সান্ত্বনা খুঁজি যে, আমি সুস্থ হয়েছি। অন্যদের মতোই হয়েছি স্বাভাবিক, সাবলীল। কিন্তু না। সেটি কখনোই সত্যি বলে ধরা দেয়নি। সুতরাং আত্মহত্যাই আমার জন্য বড় সমাধান।

একপর্যায়ে সে লিখেছে, 'আমি যদি আত্মহত্যা করি তাহলে আমার গোটা পরিবার সারাটি জীবন কষ্ট পাবে। সেটি কখনোই চাই না। সেজন্য

পরিবারের সকলকে নিয়ে মারা যাওয়ার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিলাম। বিষণ্ণতায় আক্রান্ত ছিল আমার বড় ভাই তানভিরও। চূড়ান্ত সিদ্ধান্তটা তাকেও জানালাম। সে রাজি হলো। এরপর দুভাই গেলাম বন্দুক কিনতে। সিদ্ধান্ত নিলাম, আমি হত্যা করব ছোটবোন আর নানিকে। আমার ভাই করবে মা-বাবাকে। এরপর উভয়ে আত্মহত্যা করব। ব্যস, সব শেষ। কেউ থাকবে না আর আমাদের শোকে কষ্ট পাবার।' সূত্র : সংবাদমাধ্যম।

ঘটনাটা সত্যিই মর্মান্তিক। কত আর বয়স? এই বয়সেই হতাশার কী চরম পর্যায়ে পৌঁছে গেছে!

হতাশায় নিমজ্জিত থাকা যেন এই সময়ের এক অভিশাপের নাম। ভার্চুয়াল জগতে কাটানো প্রতিটি মুহূর্ত সবাইকেই যেন একাকী করে দিচ্ছে। ধীরে ধীরে, ক্রমে ক্রমে। পরিবার, বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজনের আত্মিক বন্ধন থেকে নিয়ে যাচ্ছে যোজন যোজন দূরে। সারাক্ষণ নেটে ডুবে থাকা একেকটা হৃদয় যেন একেকটা রোবট। কোনো প্রাণচাঞ্চল্য নেই। রোবটের মতো হৃদয়গুলোতে একসময় ভর করে একাকিত্ব আর হতাশা।

তরুণরা বেশি আক্রান্ত হচ্ছে। যুবকরাও। হতাশায় নিমজ্জিত হয়ে কেউ কেউ নিজেকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিতেও দ্বিধা করছে না। হতাশাগ্রস্ত হয়ে আত্মহত্যার মতো জঘন্য কাজটি করে ফেলা কি আদৌ কোনো সমাধান? কখনোই না; বরং আত্মহত্যা করে সমস্যার পথটি আরও সুগম করা হলো।

প্রিয় হতাশাগ্রস্ত ভাইবোন!

নিজেকে নিঃশেষ করার আগে অন্তত একবার হলেও ঘুরে আসুন কোনো হাসপাতালে। বাঁচার জন্য একেকটি প্রাণের কী করুণ আকুতি। আগুনে পুড়ে, গাড়ির নিচে চাপা পড়ে কিংবা কোনো না কোনো দুর্ঘটনায় আহতদের দেখে বোঝার চেষ্টা করুন। তাদের আর্তনাদ আর হাহাকারের শব্দে নিজেকে বিলিন করলেই বুঝতে পারবেন কত মূল্যবান এ জীবন।

তাদের আহত দেহের কষ্টের চেয়েও কি আপনার সুস্থ জীবনটা বেশি যন্ত্রণাদায়ক? উত্তরটা হয়তো, হ্যাঁ। কিন্তু কদিনেরই-বা জীবন? ভাবুন তো, ছোট্ট এ জীবনে সুখী হোন, কিংবা দুঃখী—বেলা কি অতি শীঘ্রই ফুরিয়ে যাবে না? জীবনের পরেও যে আরেকটা জীবন, সেটা অনন্তকালের।

সেই জীবনের জন্য কি একবারও ভাববেন না?

কেন বঞ্চিত থাকব?

ওমানে ঈদটা সেবার খারাপ কাটেনি আমার। আমি আসলে 'শপিং মল পাগল মানুষ'। ভাবছেন, খুব কেনাকাটা করি? উঁহু। কিনি না কিছুই। শুধু ঘুরেফিরে দেখি। বিভিন্ন দেশের নিত্যনতুন জিনিসের সাথে পরিচিত হই। নানান দেশের নানান রঙের মানুষ, নানান ভাষা, নানান পেশা—দেখতে ভালোই লাগে।

তা ছাড়া শপিং মলে ঢোকার আরও একটা কারণ আছে। বাইরের রোদে ঘুরে ঘুরে ঘর্মক্লান্ত হয়ে গেলে শপিং মলগুলোতে ঢুকে গেলেই হয়। মলের সেন্ট্রাল এসিগুলো মুহূর্তেই ঠান্ডা করে দেয় শরীরটাকে।

ঈদের দিন মানেই ছুটির দিন। বিকেল থেকেই বিভিন্ন শপিং মলে ঘোরাঘুরি করছি। একটা শপিং মলের নাম 'জাবাল আলি হাইপার মার্কেট'। মার্কেটটি পাহাড়ের ওপরে না। তবু কেন 'জাবাল' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে জানি না।

এই মার্কেটের একটা বৈশিষ্ট্য আছে। যেকোনো পণ্য ১০০ পয়সা থেকে এক রিয়ালের মধ্যে। অর্থাৎ বাংলাদেশি মুদ্রায় ২০ থেকে ২০০ টাকা। অনেকটা গুলিস্তান কিংবা নিউমার্কেটের 'বাইচ্ছা লন! দেইখ্যা লন!' টাইপ দোকানগুলোর মতো।

এ ধরনের অফার দেওয়া হয় ক্রেতাদের মাথা নষ্ট করার জন্য। সস্তা পেয়ে অপ্রয়োজনীয় অনেক কিছুই কিনে ফেলেন ক্রেতারা। প্রায়ই 'কোনটা রেখে কোনটা কিনব' অবস্থায় পড়ে যেতে হয় ক্রেতাসাধারণকে। এই মার্কেটেও ক্রেতাদের বিশেষ ভিড় লক্ষ করা গেল।

আতরের সেকশনটাতে হইচই চলছে। আমি হইচই লক্ষ করে এগিয়ে গেলাম। আতরের বাক্সগুলো মোড়কে মোড়ানো। মোড়ক ছিঁড়ে, বাক্স খুলে আতর দেখার ওপর নিষেধাজ্ঞা আছে। র‍্যাকের ওপরে বড় বড় অক্ষরে লেখা আছে—Box do not open. তবুও এক ওমানি মহিলা আতরের বাক্স খুলে বসে আছেন।

বাঙালি সেলসম্যান বলল—

: ম্যাডাম, বাক্স কেন খুললেন? দেখছেন না কী লেখা আছে?

: আমি খুলবই। তাতে তোমার কী?

: ম্যাডাম, এইটা তো এখন কেউ কিনতে চাইবে না। অনুগ্রহ করে আপনাকেই নিতে হবে।

ব্যস, এতেই লেগে গেছে মহাযুদ্ধ। মহিলা হইচই করে শপিং মল মাথায় তুলছেন। বাঙালি কাস্টমাররা কেনাকাটা বাদ দিয়ে উনার কাণ্ডকীর্তি অবলোকন করছে। আরবিতেও যে গালাগাল করা যায়, এটা সম্ভবত তারা এই প্রথম দেখছে!

ফুলের প্রতি আমার অগাধ ভালোবাসা। হোক সেটা আর্টিফিশিয়াল কিংবা ন্যাচারাল। আমি 'আরবি গালাগাল' উপেক্ষা করে ফুল বেচারাদের প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ করতে এগিয়ে গেলাম। বোঝা গেল ইদানীং ফুলের প্রতি ক্রেতাসাধারণের আগ্রহ কমে গেছে। কারণ, এইদিকে তেমন কেউ ঢুঁ মারছে না। আমি ১০০ টাকা মূল্যের একটা ফুলের তোড়া হাতে নিয়ে কাউন্টারের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলাম।

বাঙালি সেলসম্যান মন খারাপ করে দাঁড়িয়ে আছে। ওমানি মহিলার ঝাড়িটা সম্ভবত সে হজম করতে পারছে না। আমি বাঙালি ভাইটিকে বললাম—

: থাক ভাই, বাদ দিন। মন খারাপ করবেন না।

লোকটা কিছু বলল না। সম্ভবত সে এখন 'অধিক শোকে পাথর' অবস্থার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। আমি বললাম—

: বাড়ি কোথায় ভাই আপনার?

: কুমিল্লা।

: ওমানে কতদিন হয়?

: তিন বছর।

: ও আচ্ছা। ...শোনেন ভাই, কেউ যদি আপনাকে অন্যায়ভাবে গালাগাল করে, আল্লাহর কাছে অবশ্যই এর প্রতিদান পাবেন। এবং বহুগুণ বেশি পাবেন ইনশাআল্লাহ। অতএব, মন খারাপ করে থাকবেন না প্লিজ!

লোকটার মন খারাপ ভাবটা চলে গেল। আল্লাহর কাছ থেকে প্রতিদান পাওয়ার কথা শুনে সে আশায় বুক বেঁধেছে। সে আনন্দিত। আনন্দেও যে চোখে পানি আসে, তার চোখের দিকে তাকিয়ে বুঝলাম। চোখদুটি তার চিকচিক করছে।

সামান্য একটি কথা দিয়ে কারও হৃদয়টা ভেঙে টুকরো টুকরো করে ফেলা যায়। আবার একটি কথাতেই কারও মুখে হাসি ফোটানো যায়। আমার একটি বাক্যে যদি কেউ আনন্দিত হয়, একটু সান্ত্বনার বাণী যদি কারও মুখে হাসি ফোটায়, কেন বঞ্চিত থাকব? কেন এ মহান আনন্দযাত্রায় নিজেকে পিছিয়ে রাখব?

মন জয় করার সহজ অস্ত্র

ছোটবোন নতুন বাড়ি করেছে। কিছু ফার্নিচার কিনবে। কুমিল্লা থেকে ঢাকায় এসেছে। পুরান ঢাকার নাজিমুদ্দিন রোডে খাট, চেয়ার, সোফা ইত্যাদি কিনতে গেলাম।

কেনাকাটা শেষ হলো। এবার একটা ট্রাক দরকার। রাত আটটা বেজে গেছে। শীতের রাত। ব্যবসায়ীরা দোকানপাট বন্ধ করার প্রস্তুতি নিচ্ছে। তাড়াতাড়ি করা দরকার। পাশেই ট্রাকস্ট্যান্ড। ছুটে গেলাম সেখানে।

জায়গাটা প্রায় অন্ধকার। ট্রাকগুলো গাবতলির গরুর হাটের মতো গাদাগাদি করে একটার সঙ্গে একটা লেগে আছে। গলিঘুঁজি দিয়ে ঢুকে সাইজমতো ট্রাক খুঁজতে লাগলাম। পেলামও। অল্পবয়সী একটা ছেলে। ভাষায় বোঝা গেল বরিশালি। গন্তব্যের বিস্তারিত বলার পর জানতে চাইলাম, 'ভাড়া কত ভাই?'

'আমি ভাড়া বলব না।'

'তাহলে কে বলবে?'

'ওই যে দাঁড়ায়া আছে, উনিই ভাড়া ফাইনাল করে দেবে। উনার সাথে কথা বলেন।'

যাকে দেখিয়ে দিলো, সে ট্রাকস্ট্যান্ডের দালাল টাইপের কেউ। একটু ভদ্রভাবে বললে—ব্রোকার। ড্রাইভার আর পেসেঞ্জারের মধ্যে ভাড়া নিয়ে সমঝোতা করে দেয়। বিনিময়ে দুই-চারশ হাতিয়ে নেয়।

লোকটার চেহারাসুরত দেখে ভালো মানুষ বলে মনে হলো না। ট্রাকস্ট্যান্ডে নানান কিসিমের লোক বাস করে। এদের মধ্যে ভালো মানুষ খুঁজে পাওয়া মুশকিল। তার ওপর লোকটাকে দেখে ভয়ই লাগছিল। একটু ভড়কে গেলাম। ভয় পাওয়ারই কথা। আমার সাথে বেশ কিছু নগদ টাকা। আছে মোবাইল ফোন। এই নির্জন জায়গায় আমাকে ধরে মেরে সবকিছু কেড়ে নিলেও কিছুই করার থাকবে না। যেই ঘিঞ্জি পরিবেশ। চিল্লালেও কেউ শুনতে পাবে না।

কী করা যায় এখন?

কারও মন জয় করার সহজ একটা অস্ত্র আছে। সালাম, মুসাফাহ। অব্যর্থ নিশানা। ব্রোকার ভাইকে শুদ্ধ উচ্চারণে সালাম দিলাম। এরপর দিলাম হাতদুটি বাড়িয়ে। 'ভদ্রলোক' সালাম নিলেন। সিগারেটটা বাঁ-হাতে ট্রান্সফার করে মুসাফাহর জন্য হাতও বাড়ালেন।

ভয়টা কেটে গেল মুহূর্তেই। সামান্য কথাতেই ভাড়া চূড়ান্ত হয়ে গেল। বাড়তি কোনো টাকাও দিতে হলো না। নিশ্চিন্তমনে গাড়িতে উঠলাম। গাড়ি ছাড়ল। কিছুদূর যেতেই পেছনে তাকালাম। ভাইটি তখনো বিস্মিত চোখে তাকিয়ে আছেন। হয়তো কেউ তাকে কখনো এভাবে সম্মান করেনি। বড়জোর সালাম দিয়েছে, মুসাফাহ করে কুশলাদি জিজ্ঞাসা করেনি। এইটুকু সম্মান করায় সে তো খুশি হয়েছেই, আমিও কোনো ঝামেলা ছাড়াই সেখান থেকে গন্তব্যে রওনা করতে পেরেছি।

সালাম আর কালাম। সালাম দেওয়া এবং হাসিমুখে কথা বলা—রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নত। সুন্নতের ওপর আমল করার মধ্যেই আছে মুক্তি। যে-কেউ যেকোনো সময় এর ওপর আমল করে দেখুন। অবশ্যই মুক্তি পাবেন, ইনশাআল্লাহ। এ প্রসঙ্গে আরেকটি বাস্তব ঘটনা মনে পড়ল—

পুরান ঢাকার চকবাজারে থাকি তখন। বেশ কয়েক বছর আগের ঘটনা। ইয়াসিন নামের এক সন্ত্রাসীর ভয়ে স্থানীয় ব্যবসায়ীরা আতঙ্কিত

ছিল। আমাদেরও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ছিল এখানে। দোকান চলছে। ম্যানেজার সাহেব ক্যাশে বসা। একদিন ইয়াসিন এসে বলল—

: ওই মিয়া ম্যানেজার সাব, ক্যাশ ছেড়ে বাইরে আসেন!

: কেন ভাই?

: আসেন না, কথা আছে।

: দোকানে তো কাস্টমারের চাপ, পরে আসি?

রেগে গেল ইয়াসিন—

: ফাইজলামি করেন আমার সাথে? জলদি ক্যাশ থেকে ৫০০ টাকা বের করেন।

: কী বলছেন ভাই! টাকা দেবো কেন?

: আবার কথা বলে! মালিক-সহ দোকানটা আগুন দিয়া জ্বালাইয়া দেবো, চিনেন আমারে?

এভাবে এক দিন, দুই দিন, তিন দিন। প্রায়ই দোকান থেকে টাকা নিয়ে যেত সে। অন্য কোনো ঝামেলা না থাকলেও ইয়াসিনের ভয়ে সবাইকেই তটস্থ থাকতে হতো। অন্ধকার গলির মুখে প্রায়ই লোকজনের পথ আটকে অস্ত্র তাক করে টাকা-পয়সা হাতিয়ে নিত সে। কেউ কিছু বলবে দূরে থাক, পুলিশও তাকে সমীহ করে চলত!

এই অবস্থায় আব্বা তার দ্বীনি সাথিভাই এবং মসজিদের ইমাম সাহেবের সঙ্গে পরামর্শ করলেন, 'কী করা যায়! এই অত্যাচার চুপচাপ সহ্য করিই-বা কী করে? কিছু একটা বিহিত করা দরকার!'

পরামর্শে সিদ্ধান্ত হলো, আর কিছু নয়—দ্বীনি দাওয়াত আর সালাম-কালাম দিয়েই এই সন্ত্রাসীর চিকিৎসা করতে হবে!

কয়েক দিন পর...

আব্বা দোকানে বসা। ফের ইয়াসিন এলো—

: হুজুর, ৫০০টা টাকা বের করেন।

: মাত্র ৫০০! ...আসেন না, ভেতরে আসেন!

: না আমার সময় নাই!

আব্বা ৫০০ টাকা ইয়াসিনের হাতে ধরিয়ে দিয়ে দাওয়াত দেওয়া শুরু করলেন—

: ভাই বলছিলাম কি, আল্লাহ্ আপনাকে এত সুন্দর করে বানিয়েছেন, দেখলেই মায়া লাগে! আমার অনেক আশা আপনার সাথে এক কাতারে নামাজ পড়ার। একদিন কিন্তু আমার সঙ্গে মসজিদে যাবেনই যাবেন! এ আমার অনুরোধ! মসজিদে প্রতিদিন হাদিসের তালিম হয়। নামাজের পর একটা হাদিস হলেও যদি শুনতেন ভালো হতো। ইমাম সাহেব প্রতিসপ্তাহে কুরআনের তাফসির করেন। আপনি যদি মাঝে মাঝে সময় দিতেন!

ইয়াসিন বলল—

: না, আমার সময় নাই।

: ভাই একটু কষ্ট করে সময় বের করেন শুধু ৫০০ কেন, যখন যা লাগে নিয়ে যাবেন। তবুও একটু চেষ্টা করেন না, ভাই!

: আচ্ছা দেখি, জানাব।

... সেই থেকে শুরু। এরপর টাকা চাওয়া তো দূরের কথা, দোকানের সামনেও আসত না। বরং পথেঘাটে আব্বাকে দেখলে সালাম দিত। খোঁজখবর নিত। মসজিদে যেত না যদিও, কিন্তু (না যেতে পারার কারণে) শরমিন্দা হতো।

এ সবই দাওয়াতের বরকত, হাসিমুখে কথা বলার উপকারিতা এবং সালামের বিনিময়ে অকল্পনীয় কল্যাণ। দ্বীনের দাওয়াত, সালাম-মুসাফাহা এবং হাসিমুখে কথা বলার উপকারিতার কথা বলে শেষ করা যাবে না। অন্যায়ের বিরুদ্ধে এগুলো অত্যন্ত সফল হাতিয়ার!

প্রয়োগ করে দেখতে পাবেন আপনিও!

মতবিরোধ কি অমঙ্গলজনক?

বাড়ির পাশে মাদরাসা। হেফজখানা। একেবারে দেয়াল ঘেঁষে। প্রতিদিন ভোরবেলা সেখান থেকে ভেসে আসত কচিকাঁচা কুরআনের পাখিদের কলধ্বনি। ছাদে উঠলে দেখতে পেতাম, পাখিগুলো দুলে দুলে মধুর সুরে কুরআন তেলাওয়াত করছে।

হঠাৎ শুনলাম, সেই বাড়িটির বাড়িওয়ালা 'মাদরাসাটি' বিদায় করে দিতে চাচ্ছেন। মন খারাপ হয়ে গেল। পরে জানলাম, বাড়িওয়ালার ছেলে দাওরা পাশ করে ফিরে এসেছে। ছেলে নিজেই এখন মাদরাসা দিতে চাচ্ছে। তাই তাদেরকে অন্য কোথাও শিফট হতে বলা হয়েছে।

জমে ওঠা মাদরাসাটি বিদায় করে দেওয়া হলো!

এটা কি ঠিক হলো?

আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে—এটা ঠিক হয়নি। অন্যায় করা হয়েছে। এতে বাড়িওয়ালা এবং তার আলেম ছেলের স্বেচ্ছাচারিতা প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু একটু গভীরভাবে চিন্তা করলে এর উপকারিতা টের পাওয়া যাবে। উপকারিতাটি কী? ভেঙে বলছি।

১. আগের মাদরাসাটি সরে গেছে। সরে গিয়ে অনেকটা দূরে, এর চেয়ে ভালো একটা লোকেশনে; নতুন ভবনে, নতুন উদ্যমে কার্যক্রম শুরু করেছে। বাসস্ট্যান্ডের পাশে হওয়ায় নতুন করে ছাত্রও বেড়েছে।

২. বর্তমান ভবনে বাড়িওয়ালার আলেম ছেলে চালু করেছে তার নিজস্ব মাদরাসা। নিজেদের ভবন। পূর্ণ নিরাপত্তাব্যবস্থা। অতএব, সহজে ছাত্রও পাচ্ছে। যেহেতু নিজস্ব ভবন, বাড়িভাড়া দেওয়ার মতো বাড়তি খরচ নেই। তাই কম খরচে গরিব ও মেধাবী ছাত্ররাও পড়াশোনার সুযোগ পেয়েছে।

৩. আগের মাদরাসার যোগ্যতাসম্পন্ন বেশ কয়েকজন উস্তাদ ছিলেন। উনাদের মধ্য থেকে দুজন উস্তাদ ভাবলেন, (একসঙ্গে না থেকে) আমরাও যদি আলাদাভাবে নতুন কিছু করি, মন্দ হবে না। বরং ভালোই হবে। ভাবনাটা তারা কাজে লাগালেন।

সুতরাং একটা মাদরাসা ভাগ হয়ে, প্রতিষ্ঠা লাভ করল তিন তিনটা মাদরাসা। তিন মাদরাসা থেকে নিশ্চয় তিনগুণ বেশি ছাত্র উপকৃত হতে পারবে! দেশব্যাপী ছড়িয়ে পড়বে ভালো মানের বেশি বেশি হাফেজে কুরআন!

অতএব, এটা বলাই যায়—আলেমদের মতবিরোধে, জাতির জন্য কখনো কখনো কল্যাণকামিতা রয়েছে। অনেক সময় আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে, আলেমদের মধ্যে এত মতবিরোধ কেন? আমরা তাহলে কার কাছে যাব?

প্রথমত মতভেদ থাকতেই পারে। এটা মানুষের একটা সহজাত প্রকৃতি। পছন্দ-অপছন্দের দিক থেকে কোনো এক বিষয়ে একাধিক ব্যক্তির মধ্যে দ্বিমত হওয়া অস্বাভাবিক নয়। এক চিকিৎসকের চিকিৎসা ও ব্যবস্থাপত্র অন্য চিকিৎসকের সঙ্গে সবসময় মিলে যায় না। এক প্রকৌশলীর কৌশল কি অন্য প্রকৌশলীর সঙ্গে সবসময়ই খাপ খায়? না। ইসলামি শরিয়তের বিষয়েও অনুরূপ। মতভেদ থাকা স্বাভাবিক।

মানুষের মধ্যে মতভেদ অনেক কারণেই হয়ে থাকে। সেই কারণগুলো সম্পর্কে ধারণা নেওয়া গেলে কারও মনে মতভেদ সম্পর্কে আর এমন প্রশ্ন জাগবে না।

উলামায়ে কেরামের মধ্যে কোনো বিষয়ে মতভেদ দেখলে উদ্বিগ্ন হওয়ার কিছু নেই। কেউ কেউ এ নিয়ে ফেসবুক সরগরম করে ফেলেন। নিজেদের মতো করে যা ইচ্ছা তাই বলতে থাকেন। এতে ফায়দার চেয়ে ক্ষতিই বেশি। এভাবে ফেসবুক কিংবা ইন্টারনেটে ঢালাও সমালোচনা না করে বরং মতভেদপূর্ণ বিষয়বস্তু নিয়ে বিজ্ঞ আলেমদের সঙ্গে পরামর্শ করা যেতে পারে। প্রয়োজনে দেশের নির্ভরযোগ্য ফতোয়া বিভাগগুলোর আশ্রয় নেওয়া যেতে পারে।

তবে মতভেদ যে সবসময় রহমত, তা নয়। হক জানার পর সে বিষয়ে মতভেদ করা নিন্দনীয়। আল্লাহ আমাদের ভুলত্রুটি ক্ষমা করে সঠিক পথে পরিচালিত করুন।

এমনটা আপনারও হতে পারত

হাসপাতালের বেডে দুটি বাচ্চা শুয়ে আছে। অদ্ভুত জোড়া বাচ্চা। একজনের পেটের সঙ্গে আরেকজনেরটা জোড়া লেগে আছে। অপারেশন করে আলাদা করতে হবে। ডাক্তার বলে দিয়েছে। বাঁচতেও পারে, আবার বিপরীতটাও হতে পারে। অনেক টাকার দরকার। কই পাবে এত টাকা? বাচ্চাদের বাবা-মা পেরেশান। টেনশনে ঘুম উড়ে গেছে।

এই টেনশন আপনারও হতে পারত।

শত্রুতা করে মিজান সাহেবের প্রতিবেশী মিথ্যা মামলা দিয়েছে। থানা থেকে ওয়ারেন্ট জারি হয়েছে। পুলিশ মিজান সাহেবের বাসায় এসে উপস্থিত। মিজান সাহেব টয়লেট থেকে বের হয়েছেনমাত্র। সেখান থেকেই টেনেহিঁচড়ে বের করে পুলিশ বলল, আপনাকে থানায় যেতে হবে।

কেন?

কোনো কেন নয়। যেতে হবে, ব্যস।

মিজান সাহেবের পরিবার চিন্তায় পড়ে গেছে। যে করেই হোক লোকটাকে ছাড়িয়ে আনতে হবে। দেরি করলে কোর্টে চালান হয়ে যেতে পারে। উকিল ধরো, টাকা ঢালো, দৌড়াদৌড়ি, জানকোরবান। পেরেশান।

... এই পেরেশানি আপনারও হতে পারত!

একটা ভিডিয়ো দেখে আঁতকে উঠলাম। বাস্তব ভিডিয়ো। ফটোশপে এডিটিং করা না। দেখে মাথাটা এখনো ঝিমঝিম করছে। নাস্তাটাও খেতে ইচ্ছা করছিল না। পানি মুখে দিয়ে ঢোক গিলতে কষ্ট হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল এখনই মাথা ঘুরে পড়ে যাব!

একটা অ্যাকসিডেন্ট।

মহিলার পায়ে হাঁটু পর্যন্ত কোনো মাংস নেই। খসে পড়েছে। শুধু লম্বা একটা হাড্ডি ঝুলে আছে সেখানে। রক্ত ঝরছে অবিরত। অসম্ভব যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছেন তিনি। আহ, কী কষ্ট!

তার এই যন্ত্রণাটা যতটুকু ব্যথার, তার চেয়েও বেশি, সারা জীবন পঙ্গু হয়ে বসবাস করতে হবে, এই ভাবনার। যদি এই মহিলার স্বামীটি স্বার্থপর হয়, নিশ্চয় তাকে ছেড়ে চলে যাবে। চিরপঙ্গু হয়ে যাওয়া, ক্রাচনির্ভর স্ত্রীকে নিয়ে নিশ্চয় সে ঘর করতে চাইবে না!

যদি অতটা স্বার্থপর না হয়, হয়তো ছেড়ে যাবে না, কিন্তু স্ত্রী হিসাবে এই মহিলাটির কীই-বা মূল্য থাকবে সংসারে?

...এমন এক অথর্ব জীবন আপনারও হতে পারত।

বছর খানেক আগে পত্রিকায় একটা খবর পড়েছিলাম। একসময়ের পর্দা কাঁপানো এক অভিনেত্রীর করুণ কাহিনি। পথে পথে বই বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করেন। অসুস্থ সন্তানের চিকিৎসার জন্য তার অনেক টাকার দরকার। অনেকের দুয়ারে কড়া নেড়েছেন। সাড়া দেয়নি কেউ।

অথচ এই অভিনেত্রীর দুয়ারে একসময় পরিচালক-প্রযোজকদের লাইন লেগে থাকত। শিডিউল পেতে জান-প্রাণ বের হয়ে যেত। তিনি সহজে দেখাও দিতেন না। দুতলা থেকে নিচতলায় নামতেনই না। পিএসকে বলে দিতেন—'চলে যেতে বলো। আগামী এক বছরেও আমার কোনো শিডিউল নেই।'

সেই তিনি এখন বস্তিতে দিনযাপন করছেন। দুতলায় থাকা তো দুর কি বাত, শোয়ার জন্য একটা খাটের ব্যবস্থাও নেই।

চেহারায় জৌলুস ছিল। চোখের বাঁকা চাহনি ছিল। যা দিয়ে লক্ষ লক্ষ দর্শকের চোখ জুড়াতেন। আকাঙ্ক্ষার বস্তু হতেন। মনোরঞ্জন করতেন নামি-দামি 'বস'দের। সবাই আজ চোখ ফিরিয়ে নিয়েছে। নেবেই-বা না কেন?

আছে তার চেহারার সে জৌলুস, বাঁকা চাহনি? হাহ! এখন তো তিনি চোখেই দেখতে পান না ভালো করে। এক অসহায় জীবনযাপন করছেন এই অভিনেত্রী।

আমরা হয়তো ভাবছি, অমুকের হয়েছে দেখে কি আমারও হবে নাকি? ভাই, হতে কতক্ষণ? অ্যাকসিডেন্ট করা মহিলাটির কথাই ধরুন। তিনি কি কল্পনা করেছিলেন, একটা যন্ত্রদানবের চাকার তলায় তার মূল্যবান পা'টা পিষ্ট হবে?

কিংবা ওই অভিনেত্রী?

কখনো কি ভেবেছিলেন, তার আয়েশি জীবনটা এভাবে এলোমেলো হয়ে যাবে?

ভাবেননি নিশ্চয়!

আসুন, আমরা ভাবি। সতর্ক এবং নিরহংকারী হই। অহংকার একমাত্র সৃষ্টিকর্তাকেই মানায়। আমাকে-আপনাকে নয়।

হুজুর, নামাজ কবে?

—নামাজ করে মানে? নামাজ তো প্রতিদিনই!

—না, মানে... শবে বরাতের নামাজের কথা জানতে চাইতেছিলাম আর কী!

—মিয়া, সারা বছর একবারও পশ্চিম দিকে আছাড় খান না! বছরে একবার জিগান 'নামাজ কবে!'

ধমক খেয়ে এবং বেমালুম লজ্জা পেয়ে লোকটি চলে গেল। আমি বললাম—ভাই, লোকটিকে এভাবে বলা বোধহয় ঠিক হয়নি। বেচারা মন খারাপ করে ফেলেছে।

—আর বলবেন না মাহমুদ ভাই! গত ১৫ দিন ধরে 'নামাজ কবে' শুনতে শুনতে কান ঝালাপালা! আর পারতেছি না!

আমি বললাম—উনারা সাধারণ মানুষ। হুজুরদের অনেক উচ্চজ্ঞান করে। আমাদের মতো হুজুরদের কাছ থেকেই তো এটা-সেটা জানতে চেয়ে বিরক্ত করবে। এমনিতেই জনসাধারণ আলেম-উলামা থেকে দিনদিন দূরে সরে যাচ্ছে। আমরা যদি ভালোবাসা দিয়ে না বোঝাই, তাহলে তো আরও দূরত্ব বজায় রাখবে ভাই!

—নাহ! ঠিকই বলেছেন। এভাবে বলা ঠিক হয়নি। আসলে একই প্রশ্নের জবাব দিতে দিতে বিরক্তি ধরে গিয়েছিল। তাই মাথা ঠিক ছিল না। কী বলতে কী বলে ফেলেছি!

—থাক, এখন আর মন খারাপ করে লাভ নেই। চলেন লোকটাকে খুঁজে বের করি। তাকে মমতা দিয়ে বুঝিয়ে বলি।

লোকটা খুব বেশি পরিচিত না হলেও চেহারা চেনা। তখনকার মতো তাকে আর পাওয়া গেল না। এশার সময় মসজিদের কাতারগুলোতে লোকটাকে খুঁজতে লাগলাম। শবে বরাতে মসজিদভরতি মুসল্লি। লোকে লোকারণ্য অজুখানা। কেবল ওই লোকটিই নেই!

আমার মন খারাপ হয়ে গেল। আমাদের সামান্য কটু ব্যবহারে বছরে একবার হলেও মহান রবের দরবারে হাজিরা দিতে চাওয়া, শবে বরাতে নিজের পাপ-পঙ্কিলতার কাদামাটি পরিষ্কার করে নিতে চাওয়া লোকটির মন ভেঙে গেল না তো!

আল্লাহ থেকে দীর্ঘ একটি বছর মুখ ফিরিয়ে রাখা বান্দাটি সারা জীবনের জন্য আল্লাহবিমুখ হয়ে গেল না তো!

এমনও তো হতে পারে! আল্লাহ তাকে মাফ করে দিতে চেয়েছিলেন, আর আমরা তাকে সে পথ থেকে ফিরিয়ে দিয়ে নিজেরাই পাপী বনে গিয়েছি!

নামাজের ইকামাত হচ্ছে। শেষবারের মতো চারিদিকে লোকটাকে খুঁজে-টুজে মন খারাপ রেখেই নামাজে দাঁড়াতে যাব, তখনই দেখি লোকটি আমার সামনের কাতারেই দাঁড়ানো!

অজানা এক খুশিতে মন ভরে গেল!

আমরা ফিরিয়ে দিলেও দয়ালু প্রভু তার প্রিয় বান্দাটিকে ভুলেননি। তার অপার রহমত ঠিকই লোকটিকে নামাজের কাতারে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে।

আসলে, আল্লাহর দিকে মানুষকে ডাকার ক্ষেত্রে নম্র ভাষা ব্যবহার করা উচিত। নবীরা এভাবে ডাকতেন। কাওলাল লাইয়িনা। নরম নরম কথায়। কঠোর কথা বলা যাবে না। খলিফা মামুনকে কেউ কঠোর ভাষায় দাওয়াত দিচ্ছিল। তিনি বললেন, দয়া করে ভাষাকে সংযত করুন। আমার চেয়ে অধম বান্দা ফেরাউনকে দাওয়াত দিতে গিয়ে, আপনার চেয়ে উত্তম মানুষ মুসা আলাইহিস সালাম নরম ভাষা ব্যবহার করেছেন।

একজন নামাজ পড়ছে না। তাকে এভাবে বলা যাবে না, 'আপনি তো মিয়া বরবাদ হয়ে যাচ্ছেন। বেনামাজি হয়ে মরতে চান? জাহান্নাম ছাড়া আপনার আর কোনো গতি নেই।'

গতি আছে কি নেই, এটা আল্লাহ ছাড়া কেউ বলতে পারেন না। তাকে প্রথমে নামাজ পড়ার কী কী উপকারিতা, তা বলতে হবে। রোজা রাখার বিনিময় কী, তা বোঝাতে হবে। বলতে হবে, অন্যের উপকার করার উপকারিতা, সুদ থেকে বেঁচে থাকার লাভ। ১০টা সাওয়াবের কথা বলে তাকে আগে আনন্দিত করুন। আগে তার দিলকে জিতে নিন। এরপর কিছু কিছু শোনান আজাবের কথা। নামাজ না পড়ার শাস্তি কী, আজান শুনেও মসজিদে না যাওয়া লোকটির ব্যাপারে প্রিয় নবী কী বলেছেন।

আমি নামাজ পড়ি, আমি ভালো। সে পড়ে না, সে পাপী—এই ভাবনা ভুলেও হৃদয়ে ধারণ করা যাবে না। অন্যকে ছোট মনে করে দাওয়াত দিলেন তো, অহংকার করে ফেললেন। আর, অহংকারীর হাশর কী হবে বুঝতেই তো পারছেন।

কলেজ-ভার্সিটিপড়ুয়ারা কি দ্বীন থেকে দূরে?

একবার এক আত্মীয়ের বাসায় বেড়াতে গিয়েছি। বউ-বাচ্চা-সহ দুপুরে খাবারের দাওয়াত ছিল। বাসায় ঢোকার পর ডাইনিং রুমের দিকে দৃষ্টি গেল। অবাক হয়ে লক্ষ করলাম, দেয়ালে লেখা—

খাবার সামনে এলে পড়ব—"আল্লাহুম্মা বারিক লানা ফি মা রাযাকতানা ওয়াকিনা আযাবান্নার"। আরেক পাশে লেখা—খাওয়ার শুরুতে পড়ব "বিসমিল্লাহি ওআলা বারাকাতিল্লাহ"। এভাবে, বিসমিল্লাহ ভুলে গেলে কী পড়তে হবে, খাওয়ার শেষে কী পড়তে হবে, মাঝে মাঝে কোনটা পড়তে হয়—সব লিখে রেখেছে।

একই অবস্থা বাথরুমের দরজায়ও। ঢোকার আগে কোন দোয়া, বের হয়ে কোন দোয়া। বেডরুমে লেখা—ঘুমানোর সময়ের দোয়া, ঘুম থেকে ওঠার দোয়া। মোটকথা যখন যেখানে যা পড়তে হবে সব কাগজে লিখে দেয়ালে সেঁটে দেওয়া হয়েছে। নিয়মিত আমল করার জন্যই নিশ্চয় এই কৌশল অবলম্বন করা হয়েছে!

অথচ আমরা যারা নিজেদেরকে 'দ্বীনদার' বলে দাবি করি, মাসনুন দোয়াগুলো কজনেই-বা সময়মতো আদায় করি? অনেকেই করে হয়তো। কিন্তু জানা থাকা সত্ত্বেও অনেকে আবার ভুলেও যাই। দেখা গেছে, টয়লেটে যাব, তাড়াহুড়ায় দোয়া পড়তে ভুলে গেছি। বের হয়েছি, তখনো ব্যস্ততার কারণে বের হওয়ার পরের দোয়াটা পড়িনি।

হয় না এমন?

কিন্তু কখনো কি এ ব্যাপারে উদ্যোগ নিয়েছি? এমন কোনো ব্যবস্থা কি করেছি, যেন দোয়াগুলো সময়মতো মনে পড়ে যায়? করিনি বোধহয়। হয়তো অতটা গুরুত্ব দিইনি।

কলেজ-ভার্সিটিপড়ুয়াদের নিয়ে আমরা সাধারণত ভাবি, দ্বীন আর কতটুকুই-বা মেনে চলে? অথচ খোঁজ নিলে দেখা যাবে অনেকেই ঈমান-আমলের লাইনে এগিয়ে থাকার আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছে।

আসলে কাউকেই ছোট করে দেখার কোনো অবকাশ নেই। আমি অনেক কিছু জানি, অনেক কিছু বুঝি—এই অহংকারে আত্মতৃপ্ত হয়ে যতই পাঞ্জাবির কলার নাড়ি, কাজ হবে না। যতক্ষণ না আল্লাহ আমার আমলকে কবুল করে নিচ্ছেন, ততক্ষণ আমার চেয়ে অধম কেউ নেই; কিচ্ছু নেই।

আয়নাতে কার মুখ দেখব

বাথরুমে একটা আয়না লাগানো ছিল। কত কাজেই-না লাগত। মাথা আঁচড়ানো। চুল ঠিক করা। ব্রাশ করা। ফেসওয়াশ লাগানো। ...আয়নাটা হঠাৎ ভেঙে গেল। তবে অভ্যাস গেল না। আয়না না থাকলেও, আছে মনে করে সেইদিকে দৃষ্টি যায়। বিব্রত হয়ে পড়ি। অনুভব করি, জিনিসটা কত কাজেরই-না ছিল!

আয়নাটা জায়গামতো না থাকায় যেমন অসুবিধা হচ্ছে, ঠিক এমন একটা অসুবিধা আছে আমাদের মনেরও। মনের আয়না বলতে একটা কথা আছে। সে আয়নায় কার ছায়া পড়ল, কিংবা কার মুখ দেখা গেল সেটা হয়তো কারও কারও কাছে মুখ্য। কিন্তু মনের আয়নায় একজনকে কন্টিনিউ দেখে রাখা দরকার।

কাকে বলুন তো?

অন্য কাউকে না; নিজেকেই।

জি।

মনের আয়নায় নিজেকে দেখুন। এ আয়নাটা ঘোলা হলেই সমস্যা। নিজের দোষগুলো দেখা থেকে বঞ্চিত হতে হবে। দোষই যদি না দেখি, সংশোধন হব কীভাবে!

অপরের সংশোধনের প্রচেষ্টা সবার মধ্যেই। কী বাস্তবে, কী ইন্টারনেটে। আমার কথা শুনে, আমার লিখিত পোস্ট পড়ে অন্যরা পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে! অথচ আমারই কোনো পরিবর্তন নেই। যেই লাউ সেই কদু।

এ যেন যাত্রাবাড়ীর মোড়ে লাঠি হাতে দাঁড়িয়ে থাকা সেই পাগলটার মতো। বাঁশি ফুঁকছে। ট্রাফিক পুলিশ হয়তো জরুরি কোনো কাজ সারতে গেছে, এই সুযোগে সে এসে ট্রাফিক সেজে বসে আছে!

লাঠি উঁচিয়ে, বাঁশি ফুঁকে গাড়িগুলোকে নির্দেশনা দিচ্ছে। যেন সবাই আইন মেনে গাড়ি চালায়। যেন বে-লাইনে গিয়ে বেঘোরে প্রাণ না হারায়।

তার নির্দেশনা অনুসরণ করে সবাই যার যার গন্তব্যে চলে গেলেও, তার নিজের জীবনের গন্তব্য আগের মতোই।

ছন্নছাড়া।

মূল্যহারা।

অকাজের।

প্রিয় ভাই, কথাগুলো আমাকেই বলা। বলটা দেয়ালে ছুড়ে দিলে নিজের কাছেই ফিরে আসে। কথা যে বলে তার নিজের কানই সবচেয়ে কাছে। লিখে লিখে, বলে বলে, দেখে দেখে—আমিই যেন পরিবর্তন হতে পারি। আমার জীবন যেন রাস্তার সে 'এক্সট্রাঅর্ডিনারি' ট্রাফিক পুলিশটির মতো না হয়।

আল্লাহ কবুল করুন।

লাইক-কমেন্টনির্ভর জীবন

ফেসবুকে ফলোয়ার বাড়ানো নিয়ে আমার পরিচিত এক ভদ্রলোক উঠেপড়ে লাগলেন। বেচারার মনে রাজ্যের আক্ষেপ। লাইক-কমেন্ট কম। ভিউয়ার নেই। ফ্রেন্ড রিকোয়েস্টও বেশি আসে না।

তো, তিনি রাত-দিন এক করে ইউটিউবে ঢুঁ মারতে লাগলেন। কী করে ফ্রেন্ড-ফলোয়ার বাড়ানো যায়। যত চেষ্টাই করেন, কাজের কাজ কিছুই হয় না। একদিন দেখি প্রচণ্ড মন খারাপ।

জানতে চাইলাম, 'কী ভাই! কী হয়েছে?'

'আর বলবেন না। গতকালের ছবিতে যা-ও ২০টা লাইক পড়েছিল, আজকেরটায় তা-ও না। মাত্র ১৬।'

অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম। চারটা লাইক কম হওয়ায় তার লাইফটাই যেন নষ্ট হয়ে গেছে! অথচ এই লোকটিকে বহু জুমায় সুন্নতে মুআক্কাদা না পড়েই বেরিয়ে আসতে দেখেছি। কত নামাজ তার থেকে ছুটে গেছে! লোকলজ্জায় রোজাটা হয়তো রাখেন। কিন্তু রোজার দিনেও ঘণ্টার পর ঘণ্টা 'নেটিজেন' হয়ে বসে থাকতে দেখেছি।

নেট-দুনিয়া আমাদের ওপার-দুনিয়া নিয়ে ভাবা থেকে বঞ্চিত করছে। একটা লাইক কম পেলে আমাদের মন খারাপ হয়ে যায়। একবার সুবহানাল্লাহ পড়া থেকে কতবার বঞ্চিত হচ্ছি, সে খবর কি রাখি?

একটা কমেন্টের আশায় যতবার টাইমলাইনে যাই, ততবার কি নিজেদের অপচয় হওয়া সময়টার জন্য চিন্তিত হয়েছি?

যতটা খুশি হই ইনবক্সে কারও হাই-হ্যালো দেখে, ততটা খুশি হই কি কুরআনের একেকটি আয়াত পড়তে পেরে?

অভ্যাসই মানুষের দাম

সকালবেলা ঘুম থেকে উঠেছেন। পেটে প্রচণ্ড ক্ষুধা। বাসায় খাবার রান্না হয়নি। বুয়াটা আজকাল ফাঁকিবাজি শুরু করেছে। ঠিকমতো আসে না। প্রায়ই বিভিন্ন অজুহাতে অনুপস্থিত থাকে। কিছু বলাও যায় না। ঢাকার শহরে কাজের বুয়া আর আকাশের চাঁদের দাম একই। টাকা দিয়েও কিনতে পাওয়া যায় না।

যা-ই হোক, আজকেও হোটেলেই খেতে হবে। ওয়াশরুমে ঢুকে ফ্রেশ হয়ে নিলেন। এরপর জামাকাপড় পরে আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। চুলটা আঁচড়ে, বালিশের নিচ থেকে মানিব্যাগটা নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলেন।

হোটেলে ঢুকেছেন। থরে থরে সাজানো ভাত, মাছ, মাংস, ডাল, পরোটা। হোটেলের পরিবেশও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। মার্জিত পোশাকে দাঁড়িয়ে আছে সার্ভিসবয়। টেবিলের ফ্লাওয়ার ভ্যাসে সাজানো তরতাজা ফুল। এসির বাতাসের সঙ্গে ছড়াচ্ছে রুমস্প্রের মিষ্টি ঘ্রাণ। কিন্তু একটা ব্যাপার দেখে খুবই অবাক হলেন। খাবারগুলোর ওপরে লেখা—'এগুলো খাবেন না, পেট খারাপ হবে!'

মেজাজটাই খারাপ হয়ে গেল আপনার। কিছুটা খটকাও লাগল। এরা কি কাস্টমারদের সঙ্গে রসিকতা করছে নাকি! কত তারিখ আজকে? তারিখটা মনে করার চেষ্টা করলেন। মনে পড়ছে না। পেটে খিদে থাকলে

আজকাল তারিখ-ফারিখও মনে আসতে চায় না। পকেট থেকে মোবাইল ফোন বের করলেন। তারিখ তো ঠিকই আছে! পহেলা এপ্রিলের ফালতু সে দিবসটাও তো না।

তাহলে?

কী ধরনের মজা করছে ওরা?

বুয়া না আসায় এমনিতেই খেপে আছেন। তার ওপর সকাল সকাল হোটেলওয়ালাদের এই ইয়ার্কি আপনার মোটেও পছন্দ হলো না। খাপ্পা মেজাজে হোটেল থেকে বের হয়ে এলেন।

কিন্তু ক্ষুধা লেগেছে, খেতে তো হবে। ছুটে গেলেন চায়ের দোকানে। গরম গরম চা দিয়ে বিস্কুট। জমবে ভালো। চা তো নিলেন, বিস্কুটের প্যাকেটের গায়ে চোখ যেতেই বিস্মিত হয়ে গেলেন! প্যাকেটে লেখা—'এই বিস্কুট ভুলেও খাবেন না। শরীরের চরম ক্ষতি হবে!'

বিস্মিত গলায় দোকানদারের কাছে জানতে চাইলেন, 'কী ভাই, বিস্কুটের প্যাকেটে কী লেখা এসব?'

'দেখতেছেনই তো কী লেখা। তারপরও প্রশ্ন করার কী আছে? সবাই খাচ্ছে। চাইলে আপনিও খেতে পারেন। না খেলে রাস্তা মাপেন।'

মেজাজটা আরও তেঁতে গেল। রেগেমেগে জানতে চাইলেন, 'যে বিস্কুট শরীরের জন্য ক্ষতি হবে, সেটা দোকানে রেখেছেন কেন?'

দোকানদার কোনো জবাব দিলো না। ব্যস্ত হাতে নিজের কাজ করতে লাগল। আপনি শুধু এক কাপ চা খেয়ে মন খারাপ করে উঠে পড়লেন। খিদেটা মেটেনি। এক কাপ চায়ে আর কতটাই-বা মেটে? মেজাজটাও দিনদিন খারাপ হয়ে যাচ্ছে। নিজের ওপর কন্ট্রোল রাখা যাচ্ছে না। কিছু একটা করতে হবে। ভালো কোনো ডাক্তার দেখাতে হবে। কোন ডাক্তার দেখানো যায়! ফিজিক্যাল নাকি সাইকোলজিক্যাল?

ভাবতে ভাবতে পাশের মিষ্টির দোকানে গেলেন। একই অবস্থা। মিষ্টির বাক্সের গায়ে বড় বড় করে লেখা—'এই মিষ্টি খাবেন তো মরবেন!'

অবাক হয়ে লক্ষ করলেন, মাছের দোকান, ফলের দোকান, কাঁচাবাজার সব জায়গায় একই লেখা—'এই মাছ, এই ফল, এই তরকারি খাবেন না, ক্ষতি হবে।'

আজব ব্যাপার! পাগল নাকি এরা? স্বয়ং বিক্রেতাই বলছে ক্ষতি হবে! এদের কি কিছু বিক্রি করার ইচ্ছাই নেই নাকি! নাকি অন্য কোনো ঘটনা? চারিদিকে হচ্ছেটা কী? নাকি নিজেরই মাথাটা গেছে।

প্রিয় পাঠক, এই পর্যন্ত পড়ে আপনারও নিশ্চয় খটকা লাগছে। আচ্ছা আপনিই বলুন, খাবারের প্যাকেটে যদি এসব লেখা থাকে, কেউ কি সেই খাবার ছুঁয়েও দেখবে? নিশ্চয় ছোঁবে না! কেউ যদি ছোঁয়ও, সে কখনো সুস্থ এবং বুদ্ধিমান মানুষ হতে পারে না। হয়তো সে পাগল, নয়তো বেকুবের হদ্দ। কারণ, একজন সুস্থ মানুষ জেনেশুনে এসব খাবারে ভুলেও হাত দেবে না।

এবার সিগারেটপ্রেমী আমার প্রিয় ভাইদেরকে বলছি, আপনিও লেখাটা পড়েছেন। বাজার ঘুরে (আই মিন লেখাটা পড়ে) এতক্ষণ বিভিন্ন খাবারের প্যাকেটে যা দেখেছেন, তা ছিল আপনার মনের ভুল। কোনো দোকানদারই তার পণ্যের গায়ে 'ক্ষতিকর' কথাটা লিখবে না। অথচ আপনার পকেটে থাকা সিগারেটের প্যাকেটে যা লেখা আছে, তা মোটেও আপনার মনের ভুল না। আর, এই লেখাটা লিখেছে অন্য কেউ না; স্বয়ং প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান। যারা এটাকে প্রস্তুত করেছে তারাই স্পষ্ট অক্ষরে লিখে দিয়েছে—'ধূমপান স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর'।

'ধূমপান বিষপান।'

ইদানীং আরও স্পষ্ট লিখে দেয়—'ধূমপান ক্যান্সারের কারণ।'

'স্মোকিং কজেস ব্লাইন্ডনেস।'

'স্মোকিং কিলস।'

কোনো কোনো প্যাকেটের গায়ে আক্রান্তের বীভৎস ছবিও দেওয়া থাকে।

তবুও খাচ্ছেন। খেয়েই যাচ্ছেন। প্রতিদিন শত শত টাকা এর পেছনে অপচয় হচ্ছে! মদ একটা নিকৃষ্ট খাবার। আপনিও নিশ্চয় ঘৃণা করেন! কিন্তু মদও কেউ টয়লেটে বসে খায় না। পুরো পৃথিবীতে সিগারেটই একমাত্র জিনিস, যা টয়লেটেও খাওয়া যায়। ভেবে দেখুন, যে খাবারটি টয়লেটে খাওয়ার উপযুক্ত, সেটি আপনি খাচ্ছেন। একটু তো বিবেক করুন!

অনেক দ্বীনদার ভাইদের মধ্যেও ধূমপানের এই 'বদভ্যাস'টা দেখা যায়। ধরুন আপনি নামাজে দাঁড়ালেন। আপনার পাশের মুসল্লির শরীর থেকে মলমূত্রের গন্ধ আসছে। কেমন লাগবে আপনার? ঘৃণা লাগবে না? কষ্ট হবে না? মনে রাখবেন, আপনি যার পাশে দাঁড়িয়েছেন সেও আপনার কাছ থেকে এমনই নিকৃষ্ট গন্ধ পাচ্ছে। হয়তো ভদ্রতার খাতিরে কিছু বলছে না।

মসজিদে মুসল্লিদেরকে কষ্ট দিচ্ছেন। বাইরে কষ্ট দিচ্ছেন হাজারো মুসলমানকে। ঘরে কষ্ট দিচ্ছেন প্রিয় স্বজনদেরকে। আপনার ঘরে থাকা প্রিয় শিশুটিও চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

সিগারেটের গন্ধে কষ্ট পাচ্ছেন আপনার প্রিয়তমা স্ত্রীও! হয়তো বেচারি আপনার ধমকের ভয়ে কিছু বলছে না। কিন্তু কষ্ট যে পাচ্ছে, তা কি আপনি অস্বীকার করতে পারেন?

এক স্ত্রী তার প্রিয়তম স্বামীকে সিগারেট না খেতে নিয়মিত অনুরোধ করে আসছিল। অবিবেচক স্বামী এই অনুরোধকে পাত্তাই দিচ্ছিল না। একের পর এক খেয়েই যাচ্ছিল। দুর্গন্ধে বেচারি স্ত্রী কষ্ট পাচ্ছিল। পত্রিকায় একদিন দেখতে পেল সিগারেটের কুফল নিয়ে একটা আর্টিকেল লিখেছে। স্ত্রী বেচারি খুশি হয়ে, মনে বড় আশা নিয়ে স্বামীকে গিয়ে বলল, 'এই দেখুন পত্রিকায় লেখা এসেছে।'

'কী বিষয়ে?'

'ধূমপানের ক্ষতির বিষয়ে। এবার তো এই কু-অভ্যাসটা ছাড়ুন!'

স্বামী পত্রিকাটা হাতে নিয়ে বেশ সময় নিয়ে মনোযোগ দিয়ে লেখাটা পড়ল। এরপর কিছুক্ষণ গভীরভাবে চিন্তা করে বলল, 'যাও, আজ থেকে ছেড়ে দিলাম।'

স্ত্রী খুশি হবে উচ্ছ্বসিত গলায় বলল, 'সত্যি বলছেন?'

'অবশ্যই সত্যি বলছি। আজ থেকে এই পত্রিকা পড়াই ছেড়ে দিলাম।'

দেখুন অবস্থা। পত্রিকা পড়া তো ছাড়বেই, স্ত্রীর মনটাও ভেঙে দেবে; তবুও সিগারেট ছাড়বে না। প্রিয় ভাই, আছেটা কি এই জিনিসে? সাময়িক আনন্দ, কিছুটা উদ্যম, কিছুক্ষণের জন্য মাথাটা হালকা হওয়া—এই-ই তো বলবেন! কিন্তু একবার অন্তত বোঝার চেষ্টা করুন, এতে যদি বড় ধরনের

কোনো ক্ষতিই না থাকত, তাহলে কি স্বয়ং এর নির্মাতারা এর ক্ষতিকর দিকটি লিখে দিত? তবুও কেন আল্লাহকে নারাজ করে, মানুষের বদদোয়া অর্জন করে, প্রিয়জনদের ক্ষতিগ্রস্ত করে এর প্রতি নেশাতুর হয়ে থাকা?

কেউ কেউ এই বলে অজুহাত দেন—এটা তো হারাম না, মাকরুহ বা এর কাছাকাছি কিছু। খেলে ক্ষতি কী?

মনে রাখবেন, এটা নিজেকেই নিজে ধোঁকা দেওয়া। কারণ, মুফতিয়ানে কেরাম ধূমপানের ভয়াবহতা লক্ষ করে একে মাকরুহ নয়; নাজায়েজ বলেছেন। মাসিক *আলকাউসার* পত্রিকা-সহ বিভিন্ন ইসলামিগ্রন্থে পাঠকদের প্রশ্নের জবাবে স্পষ্ট বলা হয়েছে—ধূমপান নাজায়েজ। এতে আর্থিক অপচয়ের পাশাপাশি স্বাস্থ্যগত ক্ষতি রয়েছে ব্যাপক! জেনেশুনে নিজের জান-মালের ক্ষতি করা অত্যন্ত গুনাহের কাজ। অধিকন্তু ধূমপায়ীর মুখের দুর্গন্ধে অন্যদের কষ্ট হয়, যা পৃথক একটি গুনাহ। তাই ধূমপান থেকে বিরত থাকা আবশ্যক।

প্রিয় ভাই, জানি দীর্ঘদিনের এ অভ্যাসটি হুট করে ছেড়ে দেওয়া আপনার জন্য কষ্টকর। কিন্তু চেষ্টা করে আপনি জীবনে কী-না অর্জন করতে পেরেছেন? চেষ্টা করেছেন বলেই লেখাপড়া শিখতে পেরেছেন। চেষ্টা ছিল বলেই ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, চাকরিজীবী, ব্যাংকার ইত্যাদি হতে পেরেছেন।

এমনও মানুষ আছে, দুটো হাত নেই; পা দিয়ে লিখে লিখে পরীক্ষায় ভালো রেজাল্ট করেছে। কেন পেরেছে? চেষ্টা আর অধ্যবসায় ছিল বলেই। এমনকি, দুটো চোখই নেই তবুও আপ্রাণ চেষ্টা ছিল, পবিত্র কুরআনের হাফেজ হবে। হয়ে দেখিয়েছে। অবাক হচ্ছেন? এটাই সত্যি। আমি নিজেই এর প্রত্যক্ষ সাক্ষী।

পৃথিবীতে এমন অনেক প্রেমিক-প্রেমিকা আছে, একসময় একে অন্যের জন্য জীবন দিয়ে দিতেও প্রস্তুত ছিল। সুইসাইড করবে বলে গাছে দড়িও ঝুলিয়ে ফেলেছিল। যখন ভুল বুঝতে পেরেছে, দড়ি ছেড়ে নেমে এসে অন্যদের সঙ্গে দিব্যি সুখের সংসার করছে! বরং সেসব 'ভুল' সময়গুলোর জন্য নিজেকে ধিক্কার দিয়ে বলছে—'কী আজেবাজে কাজের মধ্যেই-না ছিলাম!'

তো, আপনিই বলুন। 'নরাধম' সিগারেটটা কী এমন জিনিস যে, একে ছেড়ে দেওয়া যাবে না? এই 'নরকের আগুন'কে ভুলে গিয়ে স্বর্গীয় সুখে জীবন কাটানো যাবে না?

তবুও। এতদিনের অভ্যাস ছেড়ে কী করে থাকব? সাহস পাচ্ছেন না? ওই দেখুন, দ্বীনদার ডাক্তাররা আপনাকে কী পরামর্শ দিচ্ছেন—

১. সিগারেট ছাড়তে গেলে সাময়িক কিছু অসুবিধা হতে পারে। তবে এর প্রতিকারও আছে। যখনই খেতে ইচ্ছা করবে, ভুলে থাকার চেষ্টা করুন। এই সময়টা সুন্দর কোনো সুখস্মৃতি মনে করার চেষ্টা করুন।

২. একটা চুইংগাম কিনে নিন দুটাকা দিয়ে। মুখে দিন। চাবাতে চাবাতে মুখটাকে রাখুন শশব্যস্ত।

৩. যখন মেজাজ বিগড়ে যেত, সিগারেটে ফুঁক দিয়ে শান্ত হওয়ার উপায় খুঁজতেন। সিগারেট যেহেতু ছেড়ে দিচ্ছেন, এই সময় হয়তো জিনিসটাকে মিস করবেন! গভীরভাবে নিশ্বাস নিন। এই বলে মনটাকে বুঝ দিন—'আল্লাহই আমার মেজাজ-মর্জির মালিক; সিগারেট না।' অতএব, গভীরভাবে নিশ্বাস নিতে নিতে আল্লাহর কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করুন।

৪. ক্লান্তি, অবসাদ, রুক্ষভাব অথবা কঠোরতা অনুভূত হলে—বেশি করে ঘুমানোর চেষ্টা করুন।

৫. মুখ ও গলা শুকিয়ে গেলে—বেশি করে পানি পান করুন।

৬. কখনো কখনো কাশি হতে পারে। নেমে আসতে পারে অনিদ্রার সমস্যাও। মনে রাখবেন, এই সমস্যা মাত্র কিছুদিন। নিয়মিত ব্যয়াম করুন। গরম পানি দিয়ে প্রতিদিন গোসল করুন। ঠিক হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ।

৭. মাঝে মাঝে মাথা ঘোরা অনুভূত হতে পারে। সবুজ গাছগাছালির কাছাকাছি চলে যান। প্রাণ ভরে নির্মল বাতাস নিন। ভালো লাগবে।

৮. অস্থিরতা অনুভব হলে ভালো বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দিন। গল্প করুন। চা খান। ক্ষুধামন্দার ভাব হলে চুইংগাম চাবাতে থাকুন। চঞ্চলতা অনুভূত হলে খেলাধুলা বা ব্যায়ামের অনুশীলন করুন।

৯. গাড়ি চালাচ্ছেন। অথবা কোথাও ঘুরতে গেছেন। জিনিসটার কথা মনে পড়ে অস্থিরতা অনুভব হচ্ছে? কুরআন তেলাওয়াত বা ভালো কোনো ইসলামি আলোচনা শুনুন।

১০. কখনো কখনো বাথরুম করতে কষ্ট হতে পারে। দেখা দিতে পারে কোষ্ঠকাঠিন্যও। বেশি করে তরল খাবার খান। মৌসুমি ফল খাওয়ার চেষ্টা করুন।

আসলে চেষ্টার অসাধ্য কিছু নেই। মানুষ অভ্যাসের দাস নয়; অভ্যাসই মানুষের দাস। এই যে আপনি একটা নাপাক জিনিস খাওয়া থেকে বিরত থাকছেন। অন্যরাও এই দুর্গন্ধময় জিনিসটা থেকে নিরাপত্তা পাচ্ছে, এই অসিলায় অবশ্যই আল্লাহ আপনার গুনাহগুলো মাফ করে দেবেন। ফেরেশতাদের কাছেও আপনার মর্যাদা বেড়ে যাবে বহুগুণে, ইনশাআল্লাহ।

আফসোসটা অন্তত করি!

ওমানে থাকি তখন। রমজান মাস চলছে। একদিকে রোজা। অন্যদিকে বিশ্বকাপ ফুটবল। টুর্নামেন্টগুলো হতো ভোররাতে। সারা দিন রোজা রেখে পরিশ্রমের কাজ করেও অনেকেই রাতে ঘুমাত না। খেলা দেখা মিস হয়ে যাবে, এই কারণে। রাতে খেলা দেখার পরই ঘুম, এর আগে না।

একদিন সকালবেলা রুম থেকে বের হতেই দেখি আমাদের এক কলিগ বিষণ্ন মনে গালে হাত দিয়ে বসে আছে আর, একটু পরপর বলছে—'ধ্যাৎ! মিস হয়ে গেল!'

পাশে আরেকজন তাকে সান্ত্বনা দিয়ে যাচ্ছিল, 'আরে, বাদ দে তো! কাল মিস হয়েছে তো কী হয়েছে? আজকে তো ইউটিউবে দেখে নিতেই পারিস!' তবুও তার আফসোস কমানো যাচ্ছিল না। বারবার একই কথা বলছিল—'ধ্যাৎ! কেন যে ঘুমালাম!'

সে যে দলের সাপোর্টার ছিল, সেই দলেরই খেলা ছিল সে রাতে। দেখতে পারেনি। রাতে ঘুমিয়ে পড়েছিল। সবাইকে বলেও রেখেছিল, যেন সময়মতো ডাক দিয়ে দেয়। ডাকেনি কেউ। হয়তো খেয়াল ছিল না। খেলা

মিস হওয়ার আক্ষেপে তার বুকটাই ফেটে যাচ্ছিল। অথচ ভোররাতে সাহরি খেতে পারেনি বলে তার একটুও আফসোস নেই। পবিত্র রমজান মাস! ফজর পড়তে পারেনি বলে তার একফোঁটাও আক্ষেপ নেই, যতটা খেলা দেখতে না পারার আক্ষেপ ছিল!

প্রিয় ভাই, ইবাদত ছুটে গেলে আফসোস থাকা চাই। এমনও আল্লাহর বান্দা আছেন, তাহাজ্জুদ ছুটে গেলেও আফসোসে কেঁদে ফেলে। নামাজ কাজা হওয়া তো দূরের কথা, জামাত ছুটে গেলেও খাওয়া-দাওয়া ছেড়ে দেয়! অথচ আমরা আফসোসটাও করি না।

আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক রহ.-এর যুগের একটা ঘটনা পড়েছিলাম। তিনি যখন তার বাড়ির ছাদের ওপর তাহাজ্জুদে দাঁড়াতেন, এত নিমগ্ন হয়ে যেতেন, মনে হতো একটা কাষ্ঠখণ্ড দাঁড়িয়ে আছে। তার মৃত্যুর পর একলোক তাকে স্বপ্নে দেখল। জানতে চাইল, 'আল্লাহ আপনার সঙ্গে কেমন আচরণ করেছেন?'

'আল্লাহ আমাকে অনেক মর্যাদা দিয়েছেন, তবে আমার প্রতিবেশী কর্মকার লোকটির মতো নয়। কর্মকার আমার চেয়ে অনেক বেশি মর্যাদার অধিকারী হয়েছে!'

স্বপ্ন দেখে লোকটার ঘুম ভেঙে গেল। আর ঘুম আসছিল না। হিসাবই মিলছিল না তার! সামান্য এক কর্মকার। সাধারণ মুসলমান। কী করে সে আবদুল্লাহ ইবনে মুবারকের মতো এত বড় মুহাদ্দিস ও বুজুর্গের চেয়ে এগিয়ে গেল!

পরদিন সকালে লোকটা কর্মকারের স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনার স্বামীর কী এমন আমল ছিল যে, সে আবদুল্লাহ ইবনে মুবারকের চেয়েও উত্তম মর্যাদা পেয়েছে?'

স্ত্রী বলল, 'তার বিশেষ কোনো আমলের কথা আমার মনে পড়ছে না। খুব বেশি নফলও পড়ত না। তাসবিহ পাঠেও মগ্ন থাকত না। তবে দুটি বিষয় ছিল।'

'কী সেই বিষয়?'

'সে আমাকে প্রায়ই একটা কথা বলত।'

'কী কথা?'

'আমাদের বাড়ির সামনের এ বুজুর্গ আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক কত ইবাদত করছেন! সারা রাত আল্লাহর ইবাদতে কাটিয়ে দিচ্ছেন। আমারও যদি তার মতো এত সচ্ছলতা থাকত! যদি তার মতো আমারও জীবিকা নির্বাহের ঝামেলা না থাকত, তাহলে আমিও এভাবে ইবাদত করতে পারতাম।—এই আফসোস করতেন।'

'আর, অন্যটি কী আমল?'

'সে তো সারা দিন লোহা দিয়ে এটা-সেটা বানাত। কিন্তু যখনই আজান হতো, হাতুড়িটা আর একবারও ওপরে উঠাত না! তক্ষুনি সেটা ফেলে দিয়ে ছুটে যেত নামাজের প্রস্তুতি নিতে! আজানের পর সে দুনিয়াবি আর কোনো কাজই করত না।'

লোকটা কর্মকারের স্ত্রীর কথাগুলো শুনে বলল, 'সম্ভবত এই দুটি কারণেই আল্লাহ তাকে এত মর্যাদার অধিকারী বানিয়েছেন।

প্রবাসী ভাইদের বলছি

ওমানে একটা দোকানে বসে নুডুলস খাচ্ছিলাম। প্রথম চামচ মুখে দিয়েই মনটা খারাপ হয়ে গেল। লবণ কম হয়েছে। খেতে পানসে লাগছে। ঝাল হয়েছে প্রচুর!

মন খারাপ লাগার আরও কারণ, এই দোকানের নুডুলস কখনো দুই রকম হয় না। ভালো বানায় বলেই আসি। কিন্তু লবণ ছাড়া নুডুলস খাইয়ে কেন যে তারা নিজেদের 'গুডউইল'টা নষ্ট করতে চাচ্ছে!

এতদিনের গুডউইল একদিনেই খতম হয়ে যাচ্ছে দেখে খারাপ লাগল। আমি দোকানদারকে বললাম,

: ভাই, নুডুলসের এই অবস্থা কেন?'

দোকানি কথাটা শুনল বলে মনে হলো না। সে তাকিয়ে আছে টিভির দিকে। শুধু সে-ই না, দোকানের সামনের খোলা চত্বরটিতে বসে আছে

অনেকেই। সবাইই বাঙালি। কেউ করে রাজমিস্ত্রির কাজ। কেউ-বা আবার প্লাম্বার। কেউ আছে কোনো না কোনো কারখানার লেবার। সারা দিনের অক্লান্ত পরিশ্রম শেষে এখানে এসে বসেছে। বসে বলে টিভি দেখছে।

টিভিতে নাটক বা সিনেমা-জাতীয় কিছু হচ্ছে না। একটা বিজ্ঞাপন চলছে। আমি অবাক হয়ে কপাল কুঁচকালাম। একটা বিজ্ঞাপন এত মনোযোগ দিয়ে দেখার কী আছে!

আমার কুঁচকানো কপাল স্বাভাবিক হলো, যখন দেখলাম, বিজ্ঞাপনটা ব্যতিক্রম। নুরানি চেহারার একজন হুজুরকে বারবার দেখানো হচ্ছে। হুজুরের নামের আগে অনেকগুলো টাইটেল লাগানো হলো। নামের শেষে যখন 'রাদিয়াল্লাহু আনহু' বলা হলো, তখনই বুঝলাম, কোথাও না কোথাও ঝামেলা আছে!

বিজ্ঞাপনে পরের অংশে বলা হলো—এই হুজুর দীর্ঘ ২০ বছর মদিনার খাদেম ছিলেন। বড়ই পরহেজগার এবং বিজ্ঞ আলেম। জিন-পরি, দৈত্য-দানব তার কাছে কিছুই না। এদের বশ করা তার বাঁ-হাতের 'খেইল'।

বেশ অবাক হলাম। এই লোক তো দেখি বিরাট ক্ষমতা নিয়ে বসে আছে!

বিজ্ঞাপনের পরের অংশটি দেখে আরও বিস্মিত হলাম। দুঃখও পেলাম। লোকটা এবার প্রবাসী দর্শকদের উদ্দেশে কিছু প্রশ্ন করল—

আপনি কি অসাধ্য সাধন করতে চান?

দেশে কিংবা বিদেশে লটারি জিততে চান?

প্রেম ভালোবাসায় ব্যর্থ?

ক্যাসিনোতে গিয়ে বহু টাকা ইনকাম করতে চান?

তাহলে আর দেরি কেন? চলে আসুন আমাদের বুজুর্গের কাছে। সব সমস্যার তিনিই সমাধান!

দোকানদারকে বললাম,

: ভাই, কী দেখেন এসব?

: হে হে! দেখছেন, কত বড় বুজুর্গ? দাঁড়ান, আরেকটু দেখে নিই।

আমি বললাম, 'প্রিয় ভাই, আপনার কি সামান্য জ্ঞানটুকুও নাই? লটারি, ক্যাসিনো, জুয়া এগুলো কি হালাল কিছু? হারাম হওয়া জিনিসগুলোকে যেই লোক হালাল বানিয়ে পাবলিককে ধোঁকা দিচ্ছে, সে কি কোনো বুজুর্গ হতে পারে? সে এক মহা শয়তান!

বড় কষ্ট লাগল। মুসলমানদেরকে দ্বীন-ঈমান থেকে দূরে সরানোর জন্য কত দিকে কত প্রচেষ্টাই না চলছে! দেশে তো চলছেই, প্রবাসেও থেমে নেই। কত কষ্টের টাকা! ঘাম ঝরানো সেই টাকা আর মহামূল্যবান ঈমানকে কেড়ে নিচ্ছে একদল প্রতারক।

প্রিয় প্রবাসী ভাই আমার,

অনুরোধ করে বলি। আল্লাহর হুকুমগুলোর প্রতি যত্নবান হোন। সময়মতো নামাজগুলো আদায় করুন। অবসরে দাওয়াতের কাজ করুন। গুনাহ, ব্যভিচার, মদ, জুয়া—এসব প্রবাসে খুবই সহজলভ্য জিনিস। কষ্টের টাকাগুলো এসবে উড়িয়ে দেওয়া থেকে বিরত থাকুন।

পুরো বিশ্ব আজ বাতিলের দখলে। দখলদাররা শকুনিদৃষ্টি নিয়ে আপনার দিকে লক্ষ রাখছে। নামধারী কিছু মুসলিম, তাদের হাতের ক্রীড়নক হয়ে কাজ করে যাচ্ছে।

সাবধান হোন!

আপনার মহামূল্যবান ঈমানকে নিয়ে যেন কেউ ছিনিমিনি খেলতে না পারে, এ বিষয়ে সচেতন থাকুন।

বিড়াল দাদু

প্রবাস জীবনে অনেক কিছু দেখেছি। ভিন্ন মানুষ। ভিন্ন রূপ। জীবনের ভিন্ন ভিন্ন রং। বয়স্ক এক সহকর্মী ছিলেন আমাদের। পঞ্চাশোর্ধ। আমরা কেউ আঙ্কেল বলি, কেউ বলি চাচাজি। দেশে থাকতে বিরোধী দলের রাজনীতি করতেন। খুব ধড়পাকড় চলছে তখন। এই ভয়ে বয়সকালেও বিদেশে পড়ে ছিলেন।

যুক্তিবাদী মানুষ। যুক্তি দিয়ে সবকিছু বুঝতে চাইতেন। মোল্লা-মৌলভিরা উনার দু-চোখের বিষ। প্রায়ই কথায় কথায় বলে ফেলতেন, 'এজন্যই মোল্লাদের দেখতে পারি না।'

অথচ তিনিও কিন্তু মোল্লা ক্যাটাগরিরই। দাড়ি আছে, টুপি-পাঞ্জাবি পরেন। 'আপনি কি তাহলে মোল্লা নন?'—এই কথাটা আমার মুখে এসে যেত প্রায়ই। বলতাম না, বেয়াদবির ভয়ে।

লোকটার আরও কিছু বিষয় আমার অপছন্দ ছিল। শুধু আমারই না, সহকর্মীদের অনেকেরই ছিল অপছন্দের।

কিন্তু তার একটা মহৎ গুণ ছিল। মুগ্ধকর সে গুণটি হলো—অত্যধিক বিড়ালপ্রীতি। হ্যাংলা-পাতলা দুটা বিড়াল এসে কোত্থেকে যেন জুটেছিল। বিরক্ত করত খুব। পিয়ন ছেলেটা দুদিন পরপর বস্তায় ভরে দূরের কোনো মরুভূমিতে ছেড়ে দিয়ে এলেও, রাস্তা চিনে চিনে ঠিকই আবার ফিরে আসত।

বিড়ালগুলোর প্রিয়ভাজন লোক ছিলেন চাচাজি। এদেরকে তিনি এতই যত্ন করতেন যে, আমাদের কেউ কেউ উনাকে আড়ালে আবডালে 'বিড়াল দাদু' বলে ডাকত। চাচাজি ছিলেন খুবই খেপা ধরনের মানুষ। কখন কার ওপর খেপে যায়, এই ভয়ে সামনে বলার সাহস পেত না কেউ।

মেসে সপ্তাহে চারদিনই রুই মাছ রান্না হতো। এই জিনিস খেতে খেতে আমরা ছিলাম ত্যাক্ত-বিরক্ত। অনেকেই ডাল দিয়ে খেয়ে মাছটাকে টুপ করে

ময়লার ঝুড়িতে ফেলে দিতাম। তিনি ঝুড়িতে হাত ডুবিয়ে, ময়লা সরিয়ে মাছগুলো একটা প্লেটে জড়ো করতেন। খেতে দিতেন বিড়ালগুলোকে।

২০০ পয়সা মূল্যের (দেশি মুদ্রায় ৪০ টাকা) দুধের বোতল কিনে এনে ওদের মুখের কাছে তুলে ধরতেন মায়ের মমতা দিয়ে। দুধ, মাছ, কাঁটা হলো বিড়ালদের প্রিয় খাবার। এগুলো পেলে ওদের আর কী চাই! 'দাদু'র হাতে প্রিয় খাবার পেয়ে বিড়ালগুলো বেজায় খুশি হতো! তিনিও পেতেন স্বর্গীয় আনন্দ।

আসলে আমাদের চারপাশে এমন অনেক মানুষ রয়েছেন, যাদের সঙ্গে আমাদের মতের মিল হয়তো হয় না। কিন্তু তাদের এমন কিছু গুণ আছে, যেগুলো মহামূল্যবান।

একটা পিপাসিত কুকুরকে পানি পান করিয়ে একজন পতিতা মহিলা জান্নাত লাভ করেছিলেন। একজন অত্যাচারী বাদশাহ নাজাত পেয়েছিলেন নোংরা, অসুস্থ কুকুরের সেবা করে।

ছোট ছোট অনেক কাজ আছে, যেগুলো আমাদের চোখে পড়ে না। অথচ মহান রব এগুলোকেই হয়তো নাজাতের কারণ হিসাবে গ্রহণ করে নিয়েছেন! এমনই হয়। জগতে কাউকেই আসলে ছোট করে দেখার মতো নয়।

পথের বন্ধু

ওমানে আমি তখন নতুন। রাস্তাঘাট ভালো করে চিনি না। আমার এক আত্মীয়ও এসেছে ওমানে। সে এসেছে আমার পরে। সেই হিসাবে সে আমার চেয়েও নতুন। আসার পর থেকেই বিষণ্ন হয়ে আছে। বাড়ির জন্য মন খারাপ করে থাকে। বাড়ি থেকে তার পরিবারের লোকেরা আমাকে ফোন করেছে। আমি যেন তার খোঁজখবর নিই।

ওমানের ওয়েদার খুবই গরম। রোদের এত তাপ! দিনের বেলা বের হওয়াই মুশকিল। আমাদের প্রতিষ্ঠানের ভেতরেই মসজিদ। আমিই নামাজ পড়াতাম। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়তে তো সমস্যা নেই; এসি আছে।

সমস্যা হতো জুমার দিন। জামে মসজিদে যেতে প্রায় কোয়ার্টার মাইল হাঁটতে হতো। বড়জোর ১০ মিনিট লাগত মসজিদে পৌঁছতে। এই ১০ মিনিটের গরমেই 'আলুসেদ্ধ' হয়ে যেতাম। চাঁদি গরম হওয়া এই রোদে বের হওয়া কষ্টকর হবে ভেবে সেদিন সন্ধ্যার পর বেরিয়েছিলাম আত্মীয়টির খোঁজ নিতে।

পথঘাট ভালো করে চিনি না। আবছা আবছা ঠিকানার ওপর ভর করে বেরিয়ে পড়েছি। কিছুদূর যাওয়ার পর দেখি কয়েকজন পাকিস্তানি ভাই বসে আছে। বসে বসে গল্প করছে। আমি এগিয়ে গিয়ে ঠিকানা জানতে চাইলাম। ওরা খুব যত্ন সহকারে বুঝিয়ে দিলো কীভাবে যেতে হবে। প্রথমে সোজা গিয়ে ডানে। এরপর একটা শপিং মল আছে। সেখান থেকে বামে গিয়ে পেট্রোল পাম্পের পেছনে...।

আমি ধন্যবাদ দিতেই ওরা মুচকি হেসে বিদায় জানাল। কিন্তু হাসিটা কেমন যেন রহস্যজনক মনে হচ্ছিল। যা-ই হোক, ওদের দেখানো পথ অনুসরণ করে এগিয়ে যাচ্ছিলাম। যাচ্ছি তো যাচ্ছিই। শরীরের জামাকাপড় ঘামে ভিজে জবজবা হয়ে গেছে। হাঁটতে হাঁটতে ব্যথায় টনটন করছে পা। তবুও কোনো কূলকিনারা পাচ্ছি না।

অনেকক্ষণ হাঁটার পরও যখন কোনো শপিং মল চোখে পড়ল না, আমি সন্দেহে পড়ে গেলাম। ওরা আমাকে ভুল ঠিকানা দিলো না তো! এরকম ধোঁকাবাজি কি করবে আমার সঙ্গে? আমি তো ওদের কোনো ক্ষতি করিনি!

এক বাঙালি ভাইকে জানালাম ঘটনাটা। তিনি বললেন, 'আপনি ঠিকই ধরেছেন। ওরা আপনাকে পুরো উলটো রাস্তা দেখিয়েছে। এজন্যই মজা পেয়ে হাসছিল। আসলে এই নামে এখানে কোনো শপিং মল নেই। আপনি যেখান থেকে এসেছেন এর ঠিক বিপরীত দিকে যান। তাহলেই পেয়ে যাবেন আপনার কাঙ্ক্ষিত ঠিকানা।'

অবাক হয়ে গেলাম। বিশ্বাস করেছিলাম পাকিস্তানি ভাইদের। পথঘাট না চেনা একজন 'অসহায় বাঙালিকে' নিয়ে এভাবে মজা করবে, বুঝতে পারিনি। এই কাজটা তারা না করলেও পারত। ঠিকানাটা ঠিকভাবে দেখিয়ে দিলে ওদের কী এমন ক্ষতি হতো? প্রচণ্ড গরম আর লু-হাওয়ায় অযথাই আমাকে হাঁটিয়ে মেরেছিল। ওদের এ আচরণে অনেক কষ্ট পেয়েছিলাম

সেদিন। একজন মুসলমান আরেক মুসলমানের সঙ্গে এরকম আচরণ করতে পারে!

কাউকে ভুল পথ দেখানো অন্যায়। এটা একধরনের প্রতারণা। ভুল পথ তো নয়ই; কোনোরকমে দায়সারাভাবে পথ দেখানোও অনুচিত। পথিক এতে বিভ্রান্ত হয়। কষ্ট বাড়ে।

শ্যালককে বিয়ে করাব। ঢাকার কাছেই এক জায়গায় মেয়ে দেখাতে নিয়ে যাচ্ছি। পথ চিনি না। মেয়েপক্ষ ঠিকানা দিয়েছেন। সেই ঠিকানা নিয়ে দিগ্‌ভ্রান্তের মতো ঘুরছি। একজনকে জিজ্ঞাসা করলাম—'ভাই, এই ঠিকানাটা কোনদিকে, একটু বলবেন?'

লোকটা এমন দায়সারা একটা জবাব দিলো যে, আরও বেশি বিভ্রান্ত হয়ে গেলাম। অথচ তিনি সহজেই ঠিকানাটা স্পষ্ট করে বলতে পারতেন। কারণ, এই এলাকার পথঘাট তার চেনা। অচেনা লোক ১০ মিনিটে যা পারে না তিনি তা দুই মিনিটেই করতে পারতেন। তার হয়তো দুমিনিট খরচ হতো, কিন্তু আমরা অনেক উপকৃত হয়ে যেতাম।

আরও একবার এমনই এক বিপদে পড়েছিলাম। নতুন জায়গা। পথঘাট অচেনা। নামাজের সময় হয়েছে। মসজিদ খুঁজে পাচ্ছি না। একভাইকে বললাম, 'ভাই, মসজিদটা কোন দিকে একটু যদি বলতেন!'

তিনি এমনভাবে ঠিকানা দিলেন, খুঁজতে খুঁজতে জামাতের সময়ই চলে গেল। অথচ ভদ্রলোক তখন সম্পূর্ণ অবসর বসা ছিলেন। নেক আমলের সহযোগিতা করাও সমান সাওয়াবের কাজ। চাইলে তিনি ভালোভাবে মসজিদের অবস্থানটা দেখিয়ে দিয়ে অশেষ সাওয়াব হাসিল করতে পারতেন।

ভাবা দরকার আমাদের। একটু 'একরামি' মনোভাব না থাকায় আমরা কী বৃহৎ পরিমাণ সাওয়াব উপার্জন থেকে পিছিয়ে পড়ি! আল্লাহ আমাদের দিতে চান, আমরা ভাব দেখিয়ে, না নিয়েই সরে পড়ি।

টাকাটা ভাংতি হবে?

টাকা ভাঙানো নিয়েও কখনো কখনো বিপদে পড়তে হয় অনেকের। প্রয়োজনের সময় ভাংতি দিয়ে উপকারটুকু অনেকেই করতে চান না। এক প্রবাসী ভাইয়ের একটা লেখা পড়েছিলাম এ নিয়ে—

তখন আমি কোরিয়াতে। এক জায়গায় যাচ্ছি। বাসস্ট্যান্ডে গিয়ে ঘাবড়ে যেতে হলো। পকেটে মানিব্যাগ নেই, ভুলে ফেলে এসেছি। ভাগ্য ভালো, মানিব্যাগ না থাকলেও পকেটের এক কোনায় একটা ৫০ হাজার উয়োনের নোট পাওয়া গেল।

কোরিয়ার বাসগুলো হলো আরেক সমস্যার জিনিস। ওদের বাসে না থাকে হেল্পার, না আছে কন্ডাক্টর। গাড়ির দরজার সামনেই একটা কার্ড-পাঞ্চিং মেশিন আছে। আর সাথে নগদ পেমেন্টের জন্য বাক্স থাকে।

আপনার সাথে কার্ড না থাকলে আপনি নগদ-বাক্সে ভাড়াটা ফেলে দেবেন। এ ক্ষেত্রে শর্ত হলো যে পরিমাণ ভাড়া, ওইটাই দিতে হবে। ভাংতি দেওয়া-নেওয়ার সিস্টেম নাই। সিস্টেম যেটা আছে সেটা অনেক ঝামেলার। অনেক সময় তো এই ঝামেলার জন্য তারা ভাড়াও নেয় না বিরক্ত হয়ে। তবে সেটা লজ্জার।

তো বাস ভাড়া হলো ১ হাজার ৫০০ উয়োন। আর আমার কাছে আছে ৫০ হাজার উয়োনের নোট। গ্রাম এলাকার বাসস্ট্যান্ড। যেখানে দাঁড়িয়েছি, সেখানে দোকান বলতে একটা কফিশপ ছাড়া কিছু নেই।

কফিশপে ভাংতির জন্য ঢুকে নিরাশ হলাম। টিনএজ দোকানদার ছেলেটা স্পষ্ট জানিয়ে দিলো—ভাংতি নাই। মনে মনে বাংলায় দোকানদারের চৌদ্দগোষ্ঠী উদ্ধার করে, উদাসচিত্তে বাসস্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম। বাসের লোকেশন দেখাচ্ছে বোর্ডে। আমার এখানে আসতে বাসের আরও ১৭ মিনিট লাগবে। ঠিক মিনিট দশেক পরে দোকানের সেই ছেলেটা দৌড়ে এসে আমাকে জিজ্ঞেস করল—'তোমার কি এখন ভাংতি লাগবে?'

আমি বললাম, 'লাগবে। কিন্তু তখন আমায় ফিরিয়ে দিলে কেন?'

'তখন ক্যাশে ভাংতি ছিল না। তাই দিতে পারিনি। এখন একজন কাস্টমার এসেছেন, তিনি ভাংতি টাকা দিয়ে গেছেন। তোমার কি এখন প্রয়োজন আছে?'

খুবই লজ্জিত হলাম। একটু আগেই বেচারাকে মনে মনে গালাগাল দিচ্ছিলাম। ছেলেটার নৈতিকতা দেখে ইচ্ছা করছিল ওকে নিয়ে বাংলাদেশে চলে আসি।

অথচ আমাদের দেশে? ক্যাশভরতি ভাংতি টাকা থাকবে কিন্তু তারা আপনাকে দেবে না। হয়তো চার দোকান ঘুরলে কোনো এক দোকানদারের মায়া লাগলে লাগতেও পারে। রাস্তাঘাটে ভাংতির জন্য যারা বিপাকে পড়েছেন তারা বুঝবেন, একটা নোট হাতে নিয়ে দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়ানো কতটা কষ্টের।

ভাংতি টাকার বিষয়টা জাস্ট উদাহরণ। প্রায় সবকিছুতেই আমাদের মানবিকতা, সহমর্মিতা কিংবা কাউকে হেল্প করার মানসিকতা দিনে দিনে এত নিচে নেমেছে, যেটা আসলে মাঝে মাঝে মানতেও কষ্ট হয়। আসুন আমরা একটু মানবিক হওয়ার চেষ্টা করি। অন্তত মুখের হাসি দিয়েই নাহয় তৃপ্ত করি কারও হৃদয়!

উপকারী জনপদ

আফ্রিকার ঘনজঙ্গল। জঙ্গলের ভেতর দিয়ে রাস্তা চলে গেছে লোকালয়ের দিকে। 'দাঈ'দের এক জামাত চলছে সেই রাস্তায়। জামাতের সাথিরা সবাই বাঙালি। চলতে চলতে রাত হয়ে গেছে। এখন আর পথ চলা নিরাপদ না। স্থানীয়রাই এই সময় ঘর থেকে বের হয় না। হিংস্র প্রাণীর ভয় আছে। জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এসে আক্রমণ করতে পারে।

দীর্ঘপথ অতিক্রম করার পর তারা এক মসজিদের দেখা পেল। এখানে অবস্থান নেওয়া দরকার। আশেপাশে ঘর-বসতি আছে। প্রয়োজন বুঝে দিনের বেলা এখানে দাওয়াতের কাজ করা যাবে।

কথাগুলো বলছিলেন জামাতের সাথি শামিমুজ্জামান ভাই।... রাত তখন বারোটার মতো বাজে। আমরা মসজিদের একপাশে গাড়ি রেখে ভেতরে ঢুকলাম। সামানাগুলো রেখে বাইরে এসে অজু করে নিলাম। চারিদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার। মসজিদের এক কোণে টিমটিমে আলো জ্বলছে। সে আলোয় একপাশে চোখ যেতেই চমকে গেলাম। এক লোক জবুথবু হয়ে শুয়ে আছে। এতক্ষণ লক্ষ করিনি। আফ্রিকানরা স্বভাবতই কালো। আলো-আঁধারে লোকটাকে দেখে আরও অদ্ভুতুড়ে লাগছিল।

যা-ই হোক, আমরা দুই রাকাত 'দুখুলুল মসজিদ' আদায় করে সামান্য কিছু মুখে দিয়ে মাশওয়ারায় বসে গেলাম। সারা দিন লম্বা সফর করে সাথিরা সবাই ক্লান্ত। অল্প সময়ে মাশওয়ারা শেষ হলো। এবার ঘুমাতে যাব। দৃষ্টি গেল আফ্রিকান সেই লোকটার দিকে। একটা অচেনা-অজানা লোক আমাদের সঙ্গে ঘুমাবে। মনটা কেমন যেন খচখচ করছে। বিদেশের সফর। সাথিদের সবার ব্যাগেই টাকা-পয়সা আছে।

সামানার হেফাজত করা না গেলে ঈমানের হেফাজত করা দুষ্কর। লোকটাকে কী বলব বুঝতে পারছি না। আমির সাহেব এগিয়ে গিয়ে বললেন, 'জনাবের পরিচয়টা যদি বলতেন!'

লোকটা আমাদের শব্দ পেয়ে আগেই জেগে গিয়েছিল। শোয়া থেকে উঠে বসে বলল, 'আমাকে চিনবেন না। আমি এখানকারই। ...আপনাদের বোধহয় অসুবিধা হচ্ছে।'

'না, মানে আমরা এখন শুয়ে পড়ব তো! আপনি কি এখানেই ঘুমাবেন? ...মসজিদ ভেতর থেকে লক করে দিতে চাচ্ছিলাম আর কি।'

'ও আচ্ছা। অসুবিধা নেই। আপনারা শুয়ে পড়ুন। আমি বরং বাইরেই কোথাও ব্যবস্থা করে নিচ্ছি।'

লোকটা মসজিদ থেকে বের হয়ে কাছেই একটা খোলা শেডের নিচে লম্বা টুলের ওপর শুয়ে পড়ল, এবং ঘুমিয়ে গেল। আমি একটু পরপর লোকটার দিকে লক্ষ রাখছিলাম। জঙ্গলভরতি হিংস্র জীবজন্তু। খোলা জায়গায় ঘুমাতে গিয়ে লোকটার কোনো ক্ষয়ক্ষতি হয় কিনা! একবার মনে হলো, মসজিদেই ডেকে আনি। আবার ভাবলাম, লোকটাকে তো পুরোপুরি বিশ্বাসও করা যায় না। যদি আমাদের মেরে-ধরে টাকা-পয়সা নিয়ে ভেগে যায়! মোটকথা বাকি রাতটুকু এই দুটো বিষয় ভেবে ভেবেই কেটে গেল।

এদিকে লোকটা নিশ্চিন্তে ঘুমাচ্ছিল। ফজরের ঠিক আগেভাগে ঘুম থেকে জেগে অজু-ইসতেঞ্জা সেরে নিলো। ততক্ষণে ফজরের সময় হয়ে গেছে। আমির সাহেব ব্যক্তিগত অজিফা পাঠ শেষ করার পর বললেন, 'আজান দিতে কেউ আসবে না নাকি! নামাজও মনে হয় আমাদেরই পড়াতে হবে।'

আমির সাহেবের কথা শুনে আমাদের এক সাথি আজান দেওয়ার প্রস্তুতি নিতেই মসজিদের বাইরে আজানের শব্দ শোনা গেল। আজান দিচ্ছিল সেই লোকটা। যাকে আমরা 'সন্দেহজনক' মনে করে বাইরে রাত কাটাতে পাঠিয়েছিলাম। আজানের পর আমরা ফজরের সুন্নত পড়ে নিলাম। বাইরে ধীরে ধীরে আলো ফুটে উঠছে। জামাত শুরু করা দরকার। মুসল্লি, আমরা ছাড়াও মহল্লার আরও তিনজন।

কে পড়াবে নামাজ?

ইমাম সাহেবের আগমনের অপেক্ষায় বারবার বাইরের গেটের দিকে তাকাচ্ছি। এমন কাউকেই আসতে দেখলাম না। আমির সাহেব মহল্লার লোকগুলোর উদ্দেশে বললেন, 'আপনারা কেউ একজন নামাজটা পড়ান। সময় তো হয়ে গেছে!'

এবারও সেই লোকটাই মেহরাবের দিকে এগিয়ে গেল। স্পষ্ট সহিহ-শুদ্ধ কেরাতে নামাজ পড়াল। নামাজের পর বয়ানেও বসল। বয়ানের পর মহল্লার ভাইদের কাছে আমাদের পরিচিতি এবং সফরের উদ্দেশ্য তুলে ধরলাম। এবার মহল্লার লোকগুলোর পরিচয় জানার পালা। কে জানত 'পরিচয়পর্বে' আমাদের জন্য এক লজ্জাজনক পরিস্থিতি অপেক্ষা করছিল!

জানা গেল, যে লোকটাকে রাতে আমরা বাইরে বের করে দিয়েছি, তিনি আর কেউ নন, স্বয়ং এই মসজিদেরই ইমাম!

লজ্জায় আমাদের মাথা কাটা যাচ্ছিল। কী সর্বনাশই না করেছি! যিনি মসজিদের দায়িত্বে আছেন, তাকেই কিনা 'গোলমেলে' মনে করে মসজিদ থেকে বের করে দিয়েছি! আমির সাহেব-সহ আমরা সবাই শ্রদ্ধেয় ইমাম সাহেবের হাত ধরে মাফ চেয়ে নেব, উলটো তিনিই জিহ্বায় কামড় দিয়ে বললেন, 'আপনারা যা করেছেন ঠিকই করেছেন। আমারই উচিত ছিল তখন পরিচয় দিয়ে দেওয়া।'

তিন দিন ছিলাম এই মসজিদে। ছোট্ট একটা জনপদ। লোকসংখ্যা যৎসামান্য। নিম্নবিত্ত এই লোকগুলো এত বেশি একরাম করল, কী বলব! কেউ পিঠা এনে দেয়। কেউ কাঠ কেটে লাকড়ি বানিয়ে দেয়। কেউ খড়কুটো কুড়িয়ে আগুন জ্বালিয়ে মশা তাড়ানোর ব্যবস্থা করে দেয়। ইমাম সাহেবের একরাম দেখে আরও বেশি লজ্জায় পড়ে গেলাম। প্রথমদিন নিজে সারা রাত বাইরে কষ্ট করে আমাদের ভেতরে আরামের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। বলতে তো পারতেন—'আমি এখানকার ইমাম। আমি কেন বাইরে ঘুমাব?'

কোনো উচ্চবাচ্য করেননি। আমরা তো ভেবেছিলাম পরদিন লোকজন ডেকে অপমান করে মসজিদ থেকে বের করে দেবেন। তা তো করেনইনি; উলটো পুরো তিন দিন আমাদের সঙ্গে থেকে সব ধরনের সহযোগিতা করেছেন।

মহল্লার সবার কাছে গাশতে নিয়ে গেছেন। নিজ হাতে বাজার করে দিয়েছেন। মাটি কেটে চুলা বানিয়ে দিয়েছেন। আরও কত কী! পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে দাঁড়াল যে, একরামের বয়ান আমাদের মুখ দিয়ে বেরই হচ্ছিল না। যারা এভাবে নিঃস্বার্থে একরাম করে যাচ্ছিল, তাদের কাছে করব একরামের বয়ান! প্রথম রাতের কথা ভেবে বরং তাদের কাছে নিজেদের খুবই ছোট মনে হচ্ছিল।

একরামি বিয়ে!

এই ঘটনা যতবার পড়ি, আকাঙ্ক্ষা জাগে—আহা, এমন একটা পৃথিবী হতো আমাদের! নির্লোভ, একরামমুখর!

জায়েদের একটা অনাবাদী 'খিল' জমি ছিল। একেবারে অকাজের। চাষ করলে কাজ হয় না। ফসল ফলে না। বড়ই অনুর্বর। জমি না যেন গলার কাঁটা। জায়েদ চিন্তিত। এমন জমি বিক্রি করাও মুশকিল। কেউ কিনতে চাইবে না।

প্রতিবেশী হাসান এগিয়ে এলো। সে কিনবে জমিটা। অন্যান্য প্রতিবেশীরা বলল, 'তুমি কি পাগল হলে হাসান! এই জমি কিনবে কেন? লাভটা কী?

'লাভ আছে।'

'কী লাভ?'

'একরাম।'

'মানে?'

'জায়েদ বিপদে আছে। এমনিতেই অসচ্ছল অবস্থা। তার ওপর জমিটা কারও কাছেই বিক্রি করতে পারছে না। আমি যদি কিনে নিই, জায়েদের বড় উপকার হবে। বিপদ থেকে বেঁচে যাবে। এই টাকায় অন্য কোনো কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করতে পারবে। মুসলমান হয়ে যদি অন্য মুসলমান ভাইয়ের উপকারেই না আসি, এই জীবনের তাহলে কী মূল্য আছে?'

জমি বেচাকেনা হয়ে গেল। বিক্রি করতে পেরে জায়েদ খুবই খুশি। হাসান পরদিনই কোদাল নিয়ে নতুন কেনা জমিতে নেমে পড়ল। ভাবল, দেখিই না চেষ্টা করে। চাষবাস কিছু একটা হলেও তো হতে পারে!

হাসান আল্লাহর নাম নিয়ে কোদাল চালাল। কয়েক কোপ দিতেই কোদালের নিচে কী যেন ঠেকল। মাটি না। অন্য কী যেন। হাসান প্রথমে ভেবেছিল পাথর-টাথর হবে। উঁকি দিয়ে দেখতেই চমকে গেল। ভালো করে

মাটি সরিয়ে নিতেই দেখা গেল একটা পিতলের কলসি। মাটিচাপা পড়ে ময়লা হয়ে আছে। হাসান মাটি সরিয়ে বহু কষ্টে কলসিটা টেনে তুলল।

ঢাকনা খুলতেই চমকে গেল হাসান। পড়িমরি করে কলসি নিয়ে ছুটে গেল জায়েদের কাছে। 'তোমার তো ভাগ্য খুলে গেছে ভাই জায়েদ!'

'মানে?'

'এই দেখো কী নিয়ে এসেছি?'

'সেকী! এ তো দেখি কলসিভরতি সোনার মোহর! কোথায় পেলে এগুলো? আমার কাছেই-বা নিয়ে এলে কেন?'

'এর সবই তোমার। তোমার কাছ থেকে কেনা জমিতে কাজ করতে গিয়ে এগুলো পেয়েছি। নাও। খরচ করে জীবিকা নির্বাহ করো।'

জায়েদ বেঁকে বসল। 'পাগল নাকি? এই কলসি আমার না। এর মালিক তো একমাত্র তুমিই। আমি তো জমিটি তোমার কাছে বিক্রি করে দিয়েছি! এ আবার আমার হয় কী করে!'

হাসান কিছুতেই এ কথা মেনে নিতে পারল না। 'আমি শুধু জমিই কিনেছি, মোহর ভরা কলসি তো কিনিনি! এই কলসি তোমারই। নিয়ে নাও।'

'না, আমি নেব না।'

'নিতেই হবে।'

'বললাম তো নেব না।'

'বললেই হলো? নিতে তোমাকে হবেই।'

'আশ্চর্য! জিনিসটা তোমার। আমি কেন নিতে যাব ভাই!'

তুমুল বচসার পর দুজনেই বিচারকের কাছে গেল। বিচিত্র এ নালিশ শুনে বিচারক ঘাবড়ে যেতে যেতে নিজেকে সামলে নিলেন। এমন মানুষও পৃথিবীতে আছে? এতগুলো স্বর্ণ নিজে না নিয়ে অন্যকে দিয়ে দিতে চাচ্ছে! তাও আবার নালিশ নিয়ে সোজা চলে এসেছে বিচারকের দরবারে!

বিচারকরা বিচারকদের মতোই হয়। বিচক্ষণ আর বুদ্ধিমান। তিনি বললেন, 'বসো। আমার কথা শোনো।'

'কী কথা?'

'তোমাদের সন্তানাদি আছে না?'

জায়েদ বলল, 'হ্যাঁ, আছে। এক মেয়ে।'

'আমার আছে ছেলে।' বলল হাসান।

'বাহ! তাহলে তো সমাধান একেবারেই সহজ!' আনন্দিত কণ্ঠে বললেন বিচারক। 'জায়েদ, তুমি তোমার মেয়েকে হাসানের ছেলের কাছে বিয়ে দিয়ে দাও। আর হাসান, তুমি মহর হিসাবে এই কলসি দিয়ে দাও ছেলের বৌকে। ব্যস, মিটে গেল!'

সমাধান পেয়ে দুজনই খুশি। শুধু কি খুশি? খুশিতে আত্মহারা! বিয়ে হয়ে গেল। একজনের একরামি মনোভাবের কারণে দুটি পরিবারেই সুখের সুবাতাস বয়ে চলল।

ঘটনাটা আগেকার যুগের। যখন লোকজন অন্যের উপকারে নিজের জীবন বিলিয়ে দিত।

আমাদের যুগে এই ঘটনা অবিশ্বাস্য শোনাবে। হাস্যকর মনে হবে। কারণ, আমরা এমন এক যুগ পার করছি, যেই যুগে ভাই ভাইকে খুন করছে সম্পদের লোভে। বন্ধু বন্ধুকে সাত টুকরো করছে সম্পর্কের লোভে। স্ত্রী স্বামীকে বালিশচাপা দিচ্ছে সুখ-শান্তির লোভে।

ব্যবসায়ী খরিদ্দারকে ঠকাচ্ছে। কর্মচারী মালিককে ঠকাচ্ছে। পিতা সন্তানকে ঠকাচ্ছে। সন্তানও ঠকাচ্ছে পিতামাতাকে। শ্রমিককে ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত করছে ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট। কে কাকে ঠকিয়ে আকাশ ছোঁবে, সেই প্রতিযোগিতা চলছে। সহমর্মিতা, মমত্ববোধ, উপকারী মনোভাব—দিনদিন যেন কফিনবন্দি হচ্ছে।

জীবন যদি হতো কুঁড়েঘরের সেই গোয়ালিনির মতো! দুধে পানি মিশিয়ে লোক ঠকানোর আগে চিন্তা করতাম—আল্লাহ আমাকে দেখছেন। অথবা, হতে যদি পারতাম ইবনে উমরের সেই রাখালের মতো! অন্যের বকরি আত্মসাৎ করার আগে অবশ্যই ভাবতাম—ফা-আইনাল্লাহ!

নির্লোভ, নিবেদিত, সৌহার্দপূর্ণ একটা পৃথিবীর বড় অভাব অনুভব করছি!

ইমাম সাহেবের মোটর সাইকেল

ইমাম সাহেব মাদরাসার শিক্ষক। মাদরাসা থেকে তার মসজিদ অনেক দূরে। গ্রীষ্মের খাঁ খাঁ রোদ পাড়ি দিয়ে হেঁটে হেঁটে নামাজ পড়াতে আসতে হয়। প্রায়ই দু-চার মিনিট দেরি হয়ে যায়। মুসল্লিরা বিরক্ত।

'আমাদের সময়ের কি দাম নাই?'

'নাহ, এই ইমাম বদলাতে হবে।'

ইমাম সাহেব অসচ্ছল মানুষ। উপার্জনের পথই দুটো। মাদরাসার শিক্ষকতা আর মসজিদের ইমামতি। এর একটা ছুটে গেলে সংসার চালাতে কষ্ট হয়ে যাবে।

সংসারে কত খরচ। ছেলেটা এ বছর ভালো রেজাল্ট করেছে। কিতাবাদি কিনে দিতে হবে। তেমন ভালো কোনো জামা কাপড় নেই। যদিও ছেলে মুখফুটে কিছু বলে না। তবুও। বাবার মন তো। নিজের না থাকুক নতুন জামা। কিন্তু ছেলেটা 'ছেলেমানুষ'। এক জামায় আর কদিন কাটাবে, ক্লাসমেটেরা নিত্যনতুন কাপড় পরে আসে। ওরও নিশ্চয় ইচ্ছা হয়। নতুন এক সেট জামা না বানিয়ে দিলে যেন চলছেই না।

বাড়িতে 'অর্ধাঙ্গিনী' অসুস্থ। ওষুধপত্র লাগে। সব ওষুধ তো আর কেনা সম্ভব হয় না। কিছু কিছু তো কিনতেই হয়। একেকটা ট্যাবলেটের যা দাম!

ছেলের পড়াশোনার খরচ, মুদি দোকানের বাকি, স্ত্রীর চিকিৎসা খরচ—এখন, এই অবস্থায় যদি মসজিদের চাকরিটা চলে যায়...।

একদিন নামাজ শেষে। মোতাওয়াল্লি সাহেবের গুরুগম্ভীর সম্বোধন—'ইমাম সাহেব, সুন্নতের পরে বসবেন। জরুরি কথা আছে।'

ইমাম সাহেবের অন্তরাত্মা কেঁপে ওঠে। চাকরিটা তাহলে চলেই যাচ্ছে। কী আর করা। রিজিকে যদি না থাকে কিছু তো করার নেই। রোজ রোজ দেরি করে নামাজ পড়াতে আসা। মুসল্লিরা কতদিন সহ্য করবে?

সালাম ফিরিয়ে দেখেন মোতাওয়াল্লি সাহেব বসে আছেন। বসে আছে অন্যান্য মুসল্লিরাও। সবার চেহারায়ই থমথমে অবস্থা। যেন দীর্ঘ সময়ের ক্ষোভ, মৌমাছির চাকের মতো বাসা বেঁধে আছে। এখনই চাক ভেঙে ঝাঁকে ঝাঁকে মৌমাছি এসে ইমাম সাহেবকে কিলবিলিয়ে ধরবে। ইমাম সাহেব উদ্‌বিগ্ন চোখে মোতাওয়াল্লি সাহেবের দিকে তাকালেন।

সেই চোখে তাকিয়ে মোতাওয়াল্লির কণ্ঠ কেমন যেন হয়ে গেল হঠাৎ। গলার সে কঠিন ঝাঁঝ কিছুটা কম মনে হচ্ছে। ভারী বর্ষণের আগে আকাশের থমথমে অবস্থার কিয়দংশ কিনা, কে জানে!

মোতাওয়াল্লি সাহেব বলতে লাগলেন, '... প্রতিদিন দেরি করে আসেন। মাদরাসার ক্লাস শেষ হতে সময় লেগে যায়। এদিকে মুসল্লিদেরও কষ্ট হয়। তাই আমরা একটা কাজ করে ফেলেছি।'

কী কাজ?—জানতে চাওয়ার সাহস হয় না ইমাম সাহেবের। কাজটা আর কীই-বা হবে, নিশ্চয় নতুন কাউকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। ভালো কথা। কিন্তু তাই বলে একবারও জানানোর প্রয়োজন মনে করল না?

ইমাম সাহেবের আত্মমর্যাদায় লাগল। শত হোক ইমাম তো! দীর্ঘদিন নামাজ পড়িয়েছেন। এর প্রতিদান মুসল্লিরা এভাবে না দিলেও পারত। তার খুব অভিমান হলো। এর কোনো প্রতিবাদ করবেন না করবেন না ভেবেও করেই ফেললেন, 'আমাকে আগে থেকে একবার জানিয়ে নিলেও পারতেন।'

'জানাইনি ইচ্ছা করেই।'

'যাক, ভালো করেছেন। তো, নতুন ইমাম কবে থেকে নিয়োগ দিচ্ছেন?'

'নতুন ইমাম মানে!... ছি! ছি! কী বলছেন! আপনি বোধহয় ভুল বুঝছেন। বাইরে আসুন। আপনার জন্য একটা সারপ্রাইজ অপেক্ষা করছে!'

ইমাম সাহেব বাইরে এসে কিছুটা অবাক হলেন। একদল 'যুবক মুসল্লি' একটা নতুন মোটর সাইকেলকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে। ধবধবে সাদা রঙের ভেসপা। ঝকঝক করছে!

যুবকরা সহাস্যে এগিয়ে এসে ইমাম সাহেবের হাতে চাবি তুলে দিয়ে বলল, 'এটা আপনার। কত কষ্ট করে প্রতিদিন আপনাকে হেঁটে হেঁটে

নামাজ পড়াতে আসতে হয়। আপনার আর কষ্ট হবে না। এখন থেকে সময়মতোই নামাজে আসতে পারবেন। ...আরও আগেই আপনার সুবিধার দিকে আমাদের লক্ষ রাখা উচিত ছিল। আমাদের মাফ করে দিয়েন, হুজুর!'

ইমাম সাহেবদের সুযোগ-সুবিধার দিকে লক্ষ রাখা মুসল্লিদের কর্তব্য। এটা ইমাম সাহেবের হক। এই হক আদায়ে গড়িমসি করা শাস্তিযোগ্য অপরাধ! কতদিকে কত পয়সা খরচ করা যায়। কিন্তু ইমাম সাহেবের বেতন দিতে গেলে পকেটে পয়সা থাকে না। শুরু হয়ে যায় গা-চুলকানি। সামান্য কটা টাকা। তাও মাসের পর মাস বাকি পড়ে থাকে। চাইতে গেলে বলবে, 'হুজুর, এত পয়সা পয়সা করবেন নাতো, আপনাকে আল্লাহই চালাবে।'

অদ্ভুত অবস্থা!

যেন তোমাকে শয়তান চালাচ্ছে! কেন ভাই! আল্লাহ কি শুধু ইমাম সাহেবের জন্যই? তোমার জন্য না? আল্লাহর প্রতি যখন এতই বিশ্বাস, তবে কেন তোমার পুরো মাসের ইনকামটা নির্দ্বিধায় ইমাম সাহেবের হাতে তুলে দিতে পারো না?

গ্রামাঞ্চলের ইমাম সাহেবদের অবস্থা খুবই করুণ! এক মুসল্লির কাছে জানতে চাওয়া হলো—

: আপনাদের মসজিদের ইমাম সাহেবের বেতন কত?

: ২৫০০ টাকা।

: এত কম কেন?

: কী করব হুজুর! এর বেশি দিতে পারি না। আমরা তো গরিব মানুষ। এইটা গরিব মানুষদের এলাকা।

: গরিব!... ঘরে ঘরে ডিশ লাইন নিয়েছেন। মাসে ২০০ টাকা করে বিল দিচ্ছেন। ২০০ ঘর থেকে ২০০ টাকা করে ডিশ বিল উঠলে মাসে আসে ৪০ হাজার টাকা! সেটা তো ঠিকই দিতে পারছেন!

ইমাম সাহেবের ন্যায্য পাওনা পরিশোধ না করে পাপের পথে পয়সা খরচ করা! পরকালের আদালতে হাতকড়া পড়তে না চাইলে এখনই সাবধান হোন!

নিজেকে রাঙাব ইসলামি রঙে

এলার্জির সমস্যা নিয়ে একবার এক ডাক্তারের কাছে গেলাম। প্রসিদ্ধ ডাক্তার। নামযশ ভালো। দীর্ঘ সিরিয়ালের পর যখন চেম্বারে আমার ডাক পড়ল, বুঝলাম কম্পাউন্ডার বেচারা ভুল করে আমাকে ডেকে ফেলেছে।

কারণ, তখনো একজন তন্বী-তরুণী রোগিণী ভেতরে বসা আছেন। তার সমস্যা, চেহারায় কালো কালো দাগ পড়ে যাচ্ছে। তিনি করুণ এবং আহত গলায় বললেন, 'স্যার, একটা ব্যবস্থা করুন! দাগের টেনশনে আমার ঠিকমতো ঘুম হচ্ছে না। প্রেসার বেড়ে যাচ্ছে। কিছু একটা করুন।'

ডাক্তার তাকে ওষুধ লিখে দিয়ে বললেন, 'ওষুধগুলো নিয়মিত খাবেন। অযথা দাগ নিয়ে টেনশন করবেন না। টেনশন এলে গান শুনবেন। গান শুনলে মন ফুরফুরে থাকে।'

আমার অবশ্য দাগের প্রবলেম নেই। কালো মানুষ। দাগ থাকলেই কী, না থাকলেই-বা কী। এর জন্য আমার ঘুমও নষ্ট হয় না, আবার 'কেউ কেন হা করে তাকিয়ে থাকছে না'—এই ভেবে অস্থিরতাও কাজ করে না।

ডাক্তার আমাকে ওষুধ লিখে দিলেন। আমি ভিজিটের জন্য পকেটে হাত ঢোকালাম। হঠাৎ ডাক্তার সাহেবের চোখ গেল আমার চুলের দিকে। 'সে কী! এই বয়সেই চুল পেকে যাচ্ছে যে! টেনশন করেন নাকি?'

'না স্যার! টেনশন করব কেন? যা পেকে যাওয়ার তা তো পাকবেই!'

'চুল নিয়ে টেনশন করবেন না। এতে চুল আরও পেকে যাবে। টেনশন এলে কুরআন তেলাওয়াত করবেন। ভালো কোনো হামদ-নাত শুনবেন। এতে মন ফুরফুরে থাকবে।'

আমি তো অবাক! কিছুক্ষণ আগের পেশেন্টকে দিলেন গান শোনার পরামর্শ, অথচ আমাকে কুরআন তেলাওয়াতের! দুজনকে দুই রকম পরামর্শ। কেন?

বুঝলাম, আমার ইসলামি লিবাসই ডাক্তার সাহেবকে বাধ্য করেছে আমাকে 'সু-পরামর্শ' দিতে। মূলত আপনি যতক্ষণ পর্যন্ত ইসলামি ভাবাদর্শের ওপর অটল থাকবেন, ততক্ষণ কেউ আপনাকে বাতিলের দিকে ডাকতে সাহস করবে না। এর থেকে সরে এসে নিজেকে একেকবার একেক আদর্শে, একেক পোশাকে, একেক রঙে রাঙাতে চাইবেন, তখনই শুরু হবে বিপত্তি। বাতিল আপনাকে হাতছানি দিয়ে ডাকবে।

কে আমার বাবা?

নারায়ণগঞ্জে এক এতিমখানার মসজিদে আসর পড়ছিলাম। নামাজের পর বাইরে এসে দাঁড়িয়েছি। মক্তবের ছোট ছোট এতিম ছাত্ররা মাদরাসার মাঠে খেলছিল। হঠাৎ দেখি খেলা ফেলে হইহই করে গেটের দিকে দৌড়াচ্ছে!

ঘটনা কী! যাচ্ছে কোথায়! এই বয়সে খেলার চেয়ে প্রিয় কী এমন আছে ওদের কাছে!

এগিয়ে গেলাম। গিয়ে দেখি গেটের কাছে এক ভদ্রলোক হাসি হাসি মুখ করে পকেটে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। ছাত্রদের দেখে হাতদুটি পকেট থেকে বের করে আনলেন! মুঠি খুলতেই দেখি হাতভরতি চকলেট! ভদ্রলোক একে একে এতিম শিশুদের মাঝে বিলিয়ে দিলেন সেগুলো। এরপর সবার মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন। চকলেট পেয়ে শিশুরা এত খুশি হলো যে, আনন্দিত মুখে খেলতে চলে গেল।

পরিচিত হলাম ভদ্রলোকের সঙ্গে। কথায় কথায় জানতে পারলাম এক অজানা গল্প। ভারাক্রান্ত হলাম। ভদ্রলোকের বয়স অল্পই। বিয়ের পর ফুটফুটে একটা ছেলে হয়েছিল। এক মাসের এক অসুস্থতায় ছেলেটা মারা যায়। শোকে বিহ্বল হয়ে পড়েন তিনি এবং তার স্ত্রী। পুত্র হারিয়ে জীবনের সব স্বাদ-আহ্লাদ ভুলতে বসেছিলেন। হঠাৎ তার মনে হলো জীবনটাকে এভাবে দুঃখের সাগরে ভাসিয়ে নেওয়ার কোনো মানে হয় না। অন্যভাবে শুরু করতে হবে আবার।

তিনি বললেন, আমরা নাহয় ছেলে হারিয়েছি, কিন্তু এমন অনেক ছেলে আছে, যারা তাদের বাবা-মা হারিয়েছে। আমরা তো চাইলে তাদের মাধ্যমেই আমাদের সন্তান হারানোর শোককে ভুলে থাকতে পারি!

এরপর থেকেই ভদ্রলোক এতিমখানার এই ছাত্রদের কাছে আসেন। সন্তানের শোক ভুলে এদেরকেই নিজ সন্তান ভেবে খোঁজখবর নেন। কারও কারও পড়াশোনার খরচও নিয়মিত বহন করেন। যদিও ভদ্রলোকের আক্ষেপ এখনো কাটেনি—'আল্লাহ খুশি হয়ে দিয়েছিলেন। জানি না, কেন আবার তিনি তাঁর কাছে নিয়েও গেলেন!'

চোখ ভিজে উঠছিল আমারও। জানি, সন্তান হারানোর কষ্টটা সে-ই বুঝবে, যার হারিয়েছে। তবুও সান্ত্বনা দিয়ে বললাম, 'আক্ষেপ করবেন না ভাই! সন্তানাদি আল্লাহর পক্ষ থেকে আমানত। আল্লাহ যা করেন ভালোর জন্যই করেন। যদিও একজনকে তিনি নিয়ে গেছেন, কিন্তু আপনাকে এখন তিনি ১০ জনের বাবা বানিয়ে দিয়েছেন!'

মাঝে মাঝে এতিমখানাগুলো ঘুরে আসা উচিত। কত অসহায় জীবন ওদের। অনেকেই জানে না, কে ওদের বাবা, কে মা। একটা নির্ভরতার হাত ওদের মাথায় ছায়া বিস্তার করুক, এই চাওয়াটা ওদের অধিকার। বাবার স্নেহ আর মায়ের ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত এই শিশুদের মুখে হাসি ফোটানো সবারই কর্তব্য। আমরা যেন ওদের এ অধিকার থেকে বঞ্চিত না করি।

একদিন আমার দোষও প্রকাশ হবে

দুপুর দুইটা। পেটে প্রচণ্ড ক্ষুধা নিয়ে রেস্টুরেন্টে ঢুকলেন। আপনি একা না। বন্ধুরাও সঙ্গে আছে।

নামিদামি রেস্টুরেন্ট। ধরুন, 'প্রজেক্ট হিলশা'র মতোই। খাবারের দাম ব্যয়বহুল হলেও স্বাদ অতুলনীয়! বিশেষ করে গরুর কালাভুনাটা। আহ, অসাধারণ! খেতে খেতে বন্ধুদের সঙ্গে এর ভূয়সী প্রশংসাও করছিলেন।

এই পর্যন্ত ঠিকই ছিল। কিন্তু খাওয়ার একপর্যায়ে হঠাৎ দেখলেন কালাভুনার বাটিতে মানুষের আস্ত একটা আঙুল! একেবারে গোড়া থেকে কাটা। আড়াআড়ি হয়ে গোশতের বাটিতে শুয়ে আছে। প্রথমে লক্ষ করেননি। ভেবেছিলেন গাজরের ডগার অংশটা হয়ে। কিন্তু কালাভুনায় গাজর আসবে কেন? মনে হতেই চমকে গেলেন। এবং এটা যে মানুষের আঙুলই, তা আর বুঝতে বাকি রইল না। রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে চেঁচামেচি করে ওয়েটারকে ডাকলেন। ওয়েটার ছুটে এসে বলল, 'কী হয়েছে স্যার?'

'এটা কী?'

'কোনটা?'

'বুঝতে পারছেন না? গরুর মাংসে মানুষের আঙুল এলো কোত্থেকে? আপনার মালিককে ডাকেন।'

মালিক এলো। ওয়েটাররা সব জড়ো হয়ে গেল। জড়ো হলো অন্যান্য সব কাস্টমাররাও। সবারই চোখ কপালে। গরুর মাংসের মধ্যে মানুষের আঙুল! এ তো চরম নৃশংসতা! পুলিশে খবর দেওয়া হলো। এর আগে আপনি, আপনার বন্ধুরা এবং অন্যান্য কাস্টমাররা মিলে মালিককে আচ্ছা করে রামধোলাই দিলেন।

পুলিশ এলো। মালিকসুদ্ধ সব স্টাফকে কোমরে রশি বেঁধে ধরে নিয়ে যাওয়া হলো থানায়। মামলা হলো। হোটেল সিলগালা হলো। মালিকের জেল-জরিমানা হলো। একটিমাত্র আঙুল, মুহূর্তেই ঘটিয়ে ফেলল বিরাট ঘটনা!

কালাভুনায় মানুষের আঙুল খেতে আমাদের আপত্তি থাকলেও, আমরা কিন্তু অজান্তে মানুষের পুরো শরীরটাই খেয়ে যাচ্ছি! একদিন দুইদিন না; প্রায় প্রতিদিনই খাচ্ছি মানুষের গোশত। সেই মানুষটি আবার আমার-আপনার আপন ভাইও! জীবিতও নয়; মৃত। জি, প্রিয় ভাই! অন্যের গিবত করা মানে নিজের মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়া।

গিবত। মারাত্মক একটা গুনাহ। জটিল একটা ব্যাধি! অথচ কজনই-বা গায়ে মাখছি? ফেসবুকে আজকাল হট টপিক, এই গিবত। একজন কোনো একটা দোষ করল তো মরল। মুহূর্তেই দোষটাকে ভাইরাল করে দেওয়া হয়। তিনি বড় আলেম হোক অথবা ইমাম সাহেব হোক, তাতে কিচ্ছু আসে যায় না। তিনি যত সামান্য দোষই করুন, প্রচার করে বেড়াতেই হবে। নইলে 'ভাইরালিস্ট' হওয়ার প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়তে হবে যে!

আলেম বলে কি তার কোনো দোষ হতে পারে না?

অবশ্যই পারে! কিন্তু সেই দোষ রসিয়ে রসিয়ে প্রচার করা কিছুতেই ভালো কাজ হতে পারে না। তা ছাড়া কারও দোষ প্রচার করাকেই তো গিবত বলে! দোষ না থাকলেও দোষ প্রচার করা তো আরও মারাত্মক! সেটা হয়ে যায় তোহমত।

ফেসবুকের তথ্যগুলোর অধিকাংশই 'কানকথা'। যা এক কান থেকে আরেক কানে পৌঁছতে পৌঁছতে মূল ঘটনা থেকে বিচ্যুত হয়ে যায়। চাপা পড়ে যায় আসল সত্যিটা। তা ছাড়া যত সত্যিই হোক, গিবত তো গিবতই। এর ক্ষতি তো কোনোভাবেই অস্বীকার করা যায় না!

কোনো লোকের কোনো কাজ বা কথা আমার মতের বিরুদ্ধে গেছে, ব্যস আমি তার পেছনে লেগে গেলাম। সে যদি অতিক্ষুদ্র ভুলও করে, তা রংচং মিশিয়ে বড় করে ছড়িয়ে বেড়ানোটা তখন আমার গুরুত্বপূর্ণ কাজ হয়ে পড়ে!

এমনও দেখা যায়, সে হয়তো সত্যিই বড় কোনো দোষ করেছে, এবং ভুল স্বীকার করে ক্ষমাও চেয়েছে। এরপরও যেন নিস্তার নেই। এখন সে যদি অন্য কোনো ভালো কাজের কথা পোস্ট করে, দেখা যাবে সেই পোস্টের কমেন্টে আগের দোষগুলোই বারবার মনে করিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এটা হিংসা আর ছোট মানসিকতার পরিচয় দেওয়া ছাড়া আর কিছু হতে পারে না।

এতে তারই-বা কী উপকারে আসবে, জাতিই-বা কতটুকু উপকৃত হতে পারবে? আমরা যেন ভুলেই যাই, কারও দোষচর্চা আর ময়লা ঘাঁটাঘাঁটি করা একই কথা। এতে দুর্গন্ধ ছড়ানো ছাড়া আর কোনো উপকারিতা নেই। সে দোষ করেছে আর আপনি তা প্রকাশ করে গিবতের গুনাহ করেছেন। তো কে বেশি দোষী? হয়তো বলবেন, 'আমি তো তাকে সতর্ক করছি, যেন সে এই ভুল আর না করে।'

প্রিয় ভাই, সতর্ক করবেন তো তাকে ফোনে অথবা মেসেজে পার্সোনালি বলুন। ফেসবুকে ছড়িয়ে আপনি তার কী উপকার করতে পারছেন?

একজন আলেমের দোষ যেমন আছে, বিস্তর গুণও আছে। দেশ এবং উম্মাহর কল্যাণে তাদের অবদান কিছু না কিছু অবশ্যই আছে। এখন, যখনই সেই আলেম এমন কোনো কাজ করে বসলেন, যেটা আমার মতের সঙ্গে মিলেনি, ব্যস আমি ভুলে গেলাম তার পূর্ব অবদানের কথা। তার ১০টা ভালো কাজকে একটা দোষ দিয়ে ঢেকে দিলাম। ঢেকে দিয়েই ক্ষান্ত হলাম না, সোশ্যাল মিডিয়ায় তার বিরুদ্ধে লোকজনকে খেপিয়ে তুললাম। তাকে ইচ্ছামতো গালাগালি করতে বিন্দুমাত্রও চিন্তা করলাম না। তার এমন এমন দোষ প্রচার করতে লাগলাম, যা মূলত তার মধ্যে নেই।

ভুলে গেলাম, হাদিসে তোহমত থেকে বিরত থাকার কথা কত কঠোরভাবে এসেছে। ভুলে গেলাম, উম্মাহর মধ্যে সারাক্ষণ একে অপরের বিরুদ্ধে খেপিয়ে রাখার শাস্তি কত ভয়ংকর।

ভুলে যাচ্ছি, সোশ্যাল মিডিয়ায় আমাদের বন্ধু যেমন আছে, (এর অনেক অনেক বেশি) শত্রুও বসবাস করছে! আমাদের কাদা ছোড়াছুড়ি সেই শত্রুদের হাতে তুলে দিচ্ছে নিত্যনতুন খবরের শিরোনাম।

আপনার উদ্দেশ্য 'হয়তো' মহৎ। কিন্তু শত্রুদের উদ্দেশ্য সুদূর প্রসারী! ওরা কোনো একটার পক্ষ নিয়ে খবর ছড়াবে না। ওদের টার্গেট আমরা-আপনারা সবাই-ই। ওদের টার্গেট—মুসলমান। জি হ্যাঁ, ওরা মুসলমানদের দোষত্রুটি খুঁজে বেড়াচ্ছে হন্যে হয়ে। পাগলের মতো। আর আপনি সেই 'পাগোল'দের হাতে তুলে দিচ্ছেন মূল্যবান আমানত।

এগুলো বাদ দেওয়া চাই! যে যা করে করুক, আপনি ভালো কাজ করুন। উম্মাহর কল্যাণে কাজ করলে, কেউ আপনাকে বাহবা দিক বা না

দিক, আল্লাহ তাআলা আপনার মর্যাদা বাড়িয়ে দেবেন। আখেরাতে আপনি এর পূর্ণ প্রতিদান পাবেন, ইনশাআল্লাহ।

আসুন, আমরা আমাদেরকে একটু পালটাই। আল্লাহ অবশ্যই আমাদের মনের অবস্থা সম্পর্কে সম্যক অবগত। আমি যদি অন্যের দোষ তালাশ করার নোংরা মানসিকতা বয়ে বেড়াই, আমারও দোষ প্রকাশ হয়ে পড়বে। পড়বেই পড়বে। হয়তো এখানে, নয়তো কোটি কোটি লোকের সামনে হাশরের ময়দানে।

আমি কেমন মুসলমান?

: আপনার জন্য তো একটা সুখবর আছে। জানেন কী হয়েছে?

: কী হয়েছে?

: আপনার প্রতিবেশী আছে না, জামাল সাহেব? যে আপনাকে সবসময় কষ্ট দিত।

: হ্যাঁ। তার কী হয়েছে?

: ওই যে একবার আপনার বসতবাড়ির কিছু অংশ দখল করে নিজের বলে চালিয়ে দিয়েছিল না?

: হ্যাঁ। তো কী হয়েছে?

: মনে আছে, একবার তার ছেলে আপনার ছেলেকে অন্যায়ভাবে মেরেছিল, অথচ সে উলটো আপনাকেই শাসিয়েছিল?

: হ্যাঁ, মনে আছে। কিন্তু, হয়েছেটা কী বলবেন তো?

: লোকটা এতই খারাপ যে, তার বাড়ির পানির ট্যাংক থেকে পানি পড়ার পাইপ ইচ্ছা করেই—আপনাকে কষ্ট দিতেই—আপনার বাড়ির দিকে সরিয়ে এনেছিল, মনে আছে আপনার?

: আরে ভাই মনে আছে তো। কী হয়েছে, বলেন না এবার।

: সে তো রোড অ্যাকসিডেন্টে মারাত্মকভাবে আহত হয়েছে! একটা পা কেটে ফেলতে হয়েছে তার। দারুণ না!

: ইন্না লিল্লাহ, বলেন কী! কবে? কখন?

: বলছি। কিন্তু, এতে আপনি খুশি না হয়ে দুঃখিত হচ্ছেন কেন, বুঝতে পারছি না!

: আপনি আমার বন্ধু না শত্রু, বলুন তো!

: সেকী! অবশ্যই আমি আপনার বন্ধু! তা নাহলে কি এত বড় সুসংবাদটা দিতে আপনার কাছে ছুটে এসেছি?

: আপনি জানেন, এ পা-দুটো তার কী কাজে ব্যবহৃত হতো?

: নিশ্চয় আপনার সঙ্গে শত্রুতা করার কাজে।

: আপনি শুধু এটাই দেখলেন? এই পা দিয়ে হেঁটে হেঁটে প্রতিদিন সে মসজিদে গিয়ে জামাতে নামাজ আদায় করত—এটা দেখলেন না? আফসোস! পঙ্গু অবস্থায় এখন হয়তো তার পক্ষে মসজিদে যাওয়া সম্ভব হবে না। একটা মানুষের অনেকগুলো দোষ থাকতে পারে, কিন্তু তার কিছু কিছু গুণও তো থাকতে পারে!

আমার কাছে যদি তার দোষগুলোই চোখে পড়ে; গুণগুলো না, তাহলে আমি কেমন মুসলমান?

অন্যকে ক্ষমা করুন

একবার এক সফরে ময়মনসিংহের একজন দ্বীনি ভাইয়ের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। ভদ্রলোক প্রথম জীবনে আর্মি পারসন ছিলেন। মেজাজ-মর্জি সবসময়ই 'হট' হয়ে থাকত। কঠোর হস্তে সবকিছু দমন করতেন। কথায় কথায় তিনি বললেন, 'পরিস্থিতি কখনো কখনো বাঘকেও খরগোশ হয়ে যেতে বাধ্য করে।'

'ঘটনাটা কি খুলে বলা যাবে?'

'একবার শ্বশুরবাড়ির সঙ্গে জমিসংক্রান্ত বিষয়ে আমার দ্বন্দ্ব হয়। জমিটি আমার ছিল। কিন্তু অন্যায়ভাবে দখল করে রেখেছিল আমার শ্যালক। আত্মীয়তার সম্পর্ক থাকায় বেশি কিছু বলতেও পারছিলাম না, আবার একেবারে ছাড় দিতেও ইচ্ছা করছিল না...।'

'তো, কী করলেন এরপর?'

'পরিবারের বড়দেরকে নিয়ে মীমাংসার জন্য বসলাম। এতে শ্যালক সাহেব খেপে গেলেন। উলটো আমার বিরুদ্ধে থানায় মামলা করলেন। উকিলকে টাকা খাওয়ালেন প্রচুর! জানেন তো, টাকার খেলা বড় খেলা। মামলায় রায় শ্যালকের পক্ষে গেল। আমি আমার জমিটি আর ফেরত পেলাম না। এই ঘটনায় আমি প্রচণ্ড মুষড়ে পড়লাম! রাগ আর ঘৃণায় শ্বশুরবাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করলাম। আমার স্ত্রীও ক্ষিপ্ত ছিলেন তার ভাইদের ওপর। আমার জমি অন্যায়ভাবে কেড়ে নেওয়ায় তিনিও তার বাপের বাড়ি যাওয়া বন্ধ করে দিলেন।'

'দুঃখজনক ঘটনা। আপনার ওপর তো তাহলে চরম অন্যায় করা হয়েছে। আপনি পালটা কোনো প্রতিশোধ নেননি?'

'প্রতিশোধের সুযোগ একটা পেয়েছিলাম। কিন্তু ইচ্ছা করেই ছেড়ে দিয়েছি। প্রতিশোধ নিইনি। বরং ১০ বছর ধরে ছিন্ন করা সম্পর্ক নিজ থেকেই আবার জোড়া দিয়েছি, একটা কারণে।'

ভদ্রলোকের কথা শুনে আমি জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম। কী এমন কারণ, যা ১০ বছর আগে ছিঁড়ে ফেলা সম্পর্কের ক্ষতবিক্ষত স্থানে 'ব্যান্ডেজ' লাগিয়েছে!

'দ্বীন। দ্বীনে আসার পর বুঝতে পারলাম, যে তোমার ওপর অন্যায় করে, তাকে তুমি ক্ষমা করো।

—নিজের হককে ছেড়ে দাও।

—অন্যের হক পুরা করো।

—যে তোমার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে, তার সঙ্গে সম্পর্ক জোড়া লাগাও। আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার শাস্তির কথা কুরআন-হাদিসে এমনি এমনি আসেনি। আল্লাহ তো সর্বজ্ঞানী। তিনি ভালো করেই জানেন, যত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, তত বেশি ছিন্ন হওয়ার আশঙ্কা। তাই, তিনি সম্পর্ক টিকিয়ে রাখার তাগিদ দিয়েছেন।

—প্রিয় বন্ধু, কিংবা খুব কাছের আত্মীয়রা কখনো কখনো আপনার মনঃকষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। আল্লাহর জন্য সেসব কষ্ট মন থেকে দূর করে দিন। নিশ্চয় আপনি এর প্রতিদান পাবেন, ইনশাআল্লাহ।

ভদ্রলোকের কথায় সুন্দর কিছু উপদেশ পেয়ে গেলাম। আরও কিছু উপদেশ পেতে ইচ্ছা করেই 'খোঁচা' দিয়ে বললাম—'তো, আপনি এর কী এমন প্রতিদান পেলেন?'

'আমি যা পেয়েছি, পৃথিবীতে কজন এমন পায়? আমি পেয়েছি দ্বীনের পথে আসা আর আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের কথার ওপর আমল করার তাওফিক। আর আখেরাতে তো থাকছেই বিরাট প্রতিদান'

আসলে, এভাবে নিজের ন্যায্য পাওনা ছেড়ে দেওয়া কঠিন। মন মানতে চায় না। আমার জমি অন্য কেউ অন্যায়ভাবে দখল করে খাবে? মানা যায় না। তার ওপর প্রতিশোধ নেওয়ার সুযোগ পেয়েও না নেওয়া। জায়েজ প্রতিশোধ। তবুও ছাড় দেওয়া। সব ভুলে গিয়ে সম্পর্ক বজায় রাখা। এটাই প্রকৃত রহমদিল মুমিনের লক্ষণ।

আমি যদি অন্যকে ছাড় দেওয়ার মানসিকতা পোষণ করি, আল্লাহও আখেরাতে আমার পাপগুলোকে ছাড় দেবেন, আশা করা যায়।

নবী ইউসুফ আলাইহিস সালামের ঘটনা আমাদের জন্য চমৎকার উদাহরণ। ভাইয়েরা তাকে কুয়ায় ফেলে কষ্ট দিয়েছে। পরিবার থেকে, প্রিয় বাবা থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছে।

ইউসুফ আলাইহিস সালামকে আল্লাহ তাআলা বাদশাহ বানালেন। ক্ষমতা তখন তার হাতে। চাইলে তিনি ভাইদের ওপর প্রতিশোধ নিতে পারতেন। কঠিন থেকে কঠিনতর প্রতিশোধ। বন্দি করতে পারতেন কারাগারের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে।

তিনি প্রতিশোধ নেননি।

ক্ষমা করে দিয়েছেন।

শুধু ক্ষমাই করেননি, বরং সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন উদারচিত্তে। পরম ভালোবাসায় বুকে টেনে নিয়েছেন।

তিনি যে নবী, আল্লাহর প্রিয় বান্দা। আর, প্রিয় বান্দারা কখনো প্রতিশোধ নেন না। বুকভরা ভালোবাসা বিলিয়ে দেন সবার তরে। শত্রুকেও, বন্ধুকেও।

পালটে ফেলি চিন্তাটা

এক ভিক্ষুক ভিক্ষা করছে। তার মুখে জিকির ছাড়া অন্য কোনো কথা নেই। কেউ কিছু জানতে চাইলেও জিকির, সে কারও কাছে কিছু চাইতে গেলেও জিকির। মোটকথা জিকিরের দ্বারা তার জিহ্বা সারাক্ষণই তরুতাজা থাকছে। তো, তাকে কি সাচ্চা 'জাকের' বলা যাবে?

মনে হয় না।

কারণ, যতই সে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলতে থাকুক, তার উদ্দেশ্য জিকির করা না। এই পবিত্র কালিমা দ্বারা তার উদ্দেশ্য ভিক্ষা করে দু-চার পয়সা কামিয়ে নেওয়া। এজন্যই বলা হয়েছে—ইন্নামাল আ'মালু বিন্নিইয়্যাত।

উদ্দেশ্য ঠিক তো, দোকানদারি করাও সাওয়াবের কাজ। উদ্দেশ্য ভুল তো, জিকির করাও বিফল। শুরুতেই তাই, উদ্দেশ্য শুদ্ধ করে নেওয়া চাই।

১.

পড়াশোনা করছেন। একের পর এক ভালো রেজাল্টও করে আসছেন। বড় হয়ে কী হবেন? ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, উকিল-মুখতার। যা-ই হোন। নিয়ত রাখুন, 'এই মেধা, এই কর্মদক্ষতা দ্বীনের কাজে ব্যয় করব।' তাহলে পড়াশোনাটাও ইবাদতে গণ্য হবে, ইনশাআল্লাহ।

২.

বাড়ি বানাচ্ছেন। অনেকগুলো জানালা খুললেন। নিয়ত করুন, 'আজান শুনব। স্রষ্টার অপরূপ সৃষ্টি দেখে দেখে নয়ন জুড়াব। কখনো কখনো আসমানি আলোয় বসে পড়ে নেব পবিত্র কুরআন!'

দখিনা হাওয়া তো আসবেই, মুফতে সাওয়াবও এসে যাবে।

৩.

বাচ্চাটা, ভাগ্নেটা, ভাতিজিটা খেলছে। শিশুদের দেখলেই ভালো লাগে। যেন একেকটা আসমানি ফুল। কী ফুটফুটে! তো তাকে খেলতে দেখে আনন্দিত হলেন। ইচ্ছা করল ছুটে গিয়ে কোলে নিই। আদর করি। কাঁধে নিয়ে দোলনা দোলনা খেলি।

খেলবেন, ভালো কথা। একটু অপেক্ষা করুন। প্রথমেই সহিহ করুন নিয়তটাকে। ইচ্ছা করছে বলেই আমি কোলে নিচ্ছি, এমন যেন না হয়। 'প্রিয় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) শিশুদের ভালোবাসতেন। কোলে নিতেন। আদর করতেন। খেলতেন। আনন্দ দিতেন। এজন্যই আমি শিশুদের আদর করব'—এই নিয়ত রাখুন। এতে কী হবে? বাচ্চাকে, ভাগ্নেকে, ভাতিজিকে আদর করাও সাওয়াবে পরিণত হবে।

৪.

গ্রামের ছায়াঘেরা মেঠোপথ। পথের পাশে মসজিদ। সে পথ ধরে হেঁটে যাচ্ছিল এক পথিক। হাতে ছিল লাঠি। পথিক মনে মনে চিন্তা করল, লাঠিটা এখানে পুঁতে দিয়ে যাই। মুসল্লিরা তাদের গবাদিপশু ইত্যাদি এখানে বেঁধে রেখে নামাজ আদায় করতে পারবে।

কিছুক্ষণ পর। আরেকজন যাচ্ছিল একই পথ ধরে। সে দেখল, রাস্তার পাশে কেউ খুঁটি পুঁতে রেখেছে। সে ভাবল, কেউ না কেউ খুঁটির সঙ্গে টক্কর

লেগে হোঁচট খেয়ে পড়ে যেতে পারে। পায়ে পেতে পারে মারাত্মক আঘাত। এই ভেবে খুঁটিটা উঠিয়ে দিলো।

এখানে কার কাজটা সঠিক ছিল?

দুজনেরই। নিয়তের কারণে। দুজনেরই নিয়ত ভালো ছিল।

৫.

সম্পদ উপার্জন করছেন। নিয়ত করুন—

'এই সম্পদ হালাল পথে ব্যয় করব।'

'এই সম্পদ থেকে গরিব-দুঃখীদের দান করব।'

'এই সম্পদ পেয়ে বেশি বেশি শুকরিয়া আদায় করব।'

সুফিয়ান সাওরি রহ. যেমন ছিলেন আল্লাহওয়ালা, তেমনই ছিলেন পয়সাওয়ালাও। সুফি, ফকিহ, মুহাদ্দিস, সেইসঙ্গে ধনী। লোকেদের কেউ কেউ মেনে নিতে পারছিল না। জানতে চাইল, 'হজরত, এটা আমাদের বুঝে আসছে না!'

'কোনটা?'

'আল্লাহওয়ালা মানুষ আপনি। অথচ আপনার কাছে এত সম্পদ!'

'ও, এই কথা? তবে শোনো। যদি আমাদের কাছে সম্পদ না থাকত, শাসকেরা আমাদের রুমালের মতো ব্যবহার করত।'

রুমাল যেমন ব্যবহার করে ছুড়ে ফেলে, আমরাও তেমন করেই ব্যবহৃত হতাম। সম্পদ আছে, তো এদিক থেকে উভয়েই সমান। শাসকদের কথায় উঠবস করতে হচ্ছে না। সবচেয়ে বড় শাসক আল্লাহপাকের ইবাদতে মনোনিবেশ করতে পারছি!

সেলিব্রিটি

দৃশ্যপট-১

নির্বাচনি জনসংযোগ চলছে। শহর থেকে ছুটে আসছে প্রার্থীরা। এসে জনগণের পায়ে পড়ে যাচ্ছে। ভোটার বাড়িতে নেই, তাতে কী? ছুটে যাচ্ছে ক্ষেতে। গিয়ে দেখে কাজ করছে। পায়ে হাঁটু পরিমাণ কাদা। তাতেই নেমে পড়েছে প্রার্থী। কাদায় মাখামাখি হওয়া ভোটারকে পরম মমতায় জড়িয়ে ধরে বলছে, 'বলেন তো আমি কেন এসেছি?'

'ভোট চাইতে।'

'জি না। আমি এসেছি আপনার দোয়া নিতে। সারা জীবন যেন আপনাদের খেদমত করে যেতে পারি এই দোয়াটা করলেই হবে। আর কিচ্ছু চাই না।

'দোয়া'টা যে কী, ভোটার তো বোঝেই!

একদিকে প্রার্থী দোয়া চাচ্ছে, অন্যদিকে তার 'একনিষ্ঠ, নিঃস্বার্থ' কর্মীরা বিশাল মিছিল নিয়ে শোডাউনে বেরিয়ে গেছে। মিছিলের স্লোগান—'অমুক ভাইয়ের চরিত্র, ফুলের মতো পবিত্র।'

মিছিলে মিছিলে রোড-ঘাট প্রকম্পিত। পেছনে বিশাল জ্যাম লেগে গেছে। লোক চলাচলে বিঘ্ন ঘটছে। গাড়িগুলো স্থবির। অনেকের অফিসটাইম। কেউ যাচ্ছে হাসপাতালে। কারও আবার জরুরি কাজ। মুমূর্ষু রোগীরা যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে। 'ফুলের মতো পবিত্র' ভাইয়ের লোকেদের সেসব ভাবার সময় নেই। তারা তুমুল উৎসাহে বলেই যাচ্ছে—'অমুক ভাই চায় কী? জনগণের শান্তি।'

নির্বাচন হলো। জনগণ সেই প্রার্থীর মনোমুগ্ধকর কথাবার্তায় বিশ্বাস করে, বড় আশা নিয়ে বিপুল ভোটে নির্বাচিত করল। ক্ষমতায় যাওয়ার পর ফুটে উঠতে লাগল তার আসল চরিত্র। সেই চরিত্র মোটেও ফুলের মতো নয়। জনগণের 'শান্তি' চাওয়া লোকটা হয়ে উঠল অশান্তির কারণ।

তো, পবিত্র নেতাটির আজ গণসংবর্ধনা অনুষ্ঠান। বিরাট আয়োজন। বিশাল প্যান্ডেল বানানো হয়েছে। ব্যানারে ব্যানারে ছেয়ে গেছে পুরো এলাকা। বড় একজন মন্ত্রী আসবেন। সংবর্ধনা জানাবেন। ব্যানারের একপাশে সেই মন্ত্রীর বিশাল ছবি ছাপিয়ে লেখা হয়েছে—'মন্ত্রী সাহেবের আগমন, শুভেচ্ছা স্বাগতম!'

প্রিন্ট এবং টিভি-মিডিয়ার সাংবাদিক ভাইয়েরা এরই মধ্যে এসে পড়েছে। তারা তুমুল ব্যস্ত। স্টেজকে ঘিরে প্রায় অর্ধশত ক্যামেরা বসানো হয়েছে। কোনো কোনো টেলিভিশন চ্যানেল অনুষ্ঠানটি লাইভ সম্প্রচারের ব্যবস্থা করেছে।

দৃশ্যপট-২

বিদেশে টেস্ট ক্রিকেটে জয় পেয়ে দেশের মুখ উজ্জ্বল করেছে খেলোয়াড়রা। এখন দেশে আসার পালা। বিমানবন্দরে স্বাগত জানাতে অপেক্ষা করছে ভক্তবৃন্দ। উপস্থিত হয়েছেন স্বয়ং ক্রীড়ামন্ত্রী। সাংবাদিকদের ক্যামেরার ফ্ল্যাশগুলো অপেক্ষা করছে তীর্থের কাকের মতো। ইমিগ্রেশন সেরে বের হয়ে যে-ই না 'সোনার ছেলেরা' মুখ বাড়িয়ে দেবে, অমনি জ্বলে উঠবে সেগুলো।

জাতীয় স্টেডিয়াম সেজেছে অনন্য সাজে। এখানে ক্রিকেটজয়ী এই 'সেলিব্রিটি'দের সংবর্ধনা দেওয়া হবে। বিমানবন্দর থেকে স্টেডিয়াম, নানান স্তুতিবাক্যে ছেয়ে ফেলা হয়েছে। পুরো অনুষ্ঠান লাইভ প্রচার করবে টিভি-মিডিয়া। চারিদিকে উৎসবের ঘনঘটা। ভক্তদের মুখে যেন প্রশংসার খই ফুটছে—'এদের মতো সোনার ছেলে আর হয়-ই না!'

দৃশ্যপট-৩

প্রত্যন্ত এলাকার এক মাদরাসায় চলছে দস্তারবন্দি অনুষ্ঠান। কচিকাঁচা ছেলেগুলো বছরজুড়ে পবিত্র কুরআন হেফজ করেছে। আজ তাদের মাথায় পাগড়ি পরিয়ে দেওয়া হবে। ঢাকা থেকে বড় একজন আলেম আসবেন। তিনিই প্রধান অতিথি। তিনি নিজ হাতে হাফেজদের পাগড়ি প্রদান করবেন।

অনুষ্ঠানের প্রাথমিক পর্যায়। হাফেজরা সারিবদ্ধভাবে বসে আছে স্টেজে। মক্তবের ছোট্ট শিশুরা তেলাওয়াত করছে। যা শিখেছে তারই উপস্থাপনা চলছে এখন। হঠাৎ জানা গেল প্রধান অতিথি এসেছেন। মাদরাসার ছাত্র-উস্তাদ সবাই খুশি। স্বাগত জানাতে ছুটে গেল বাসস্ট্যান্ডে।

অতিথি একেবারেই সাদামাটা। নিজস্ব গাড়ি নেই। সঙ্গে দুজন বডিগার্ড নেই। এমনকি ব্যাগ বহন করার লোকও নেই। বাসে করে এসেছেন। তাও আবার নন-এসি। বাসের অবস্থা করুণ! সামনের গ্লাস ভাঙা। জোড়াতালি দিয়ে আটকানো। বডির রং আর রঙিন নেই; জায়গায় জায়গায় পলেস্তারা খসে পড়েছে। সিটগুলো এমন যে, পা ছড়িয়ে ভালো করে বসা যায় না। সামনের সিটের সঙ্গে হাঁটু আটকে যায়। পাশের যাত্রীর সঙ্গে গায়ে গা লাগিয়ে বসতে হয়। ভেতরে ফ্যান নেই। ঘেমেনেয়ে যাত্রীদের ত্রাহি ত্রাহি অবস্থা। এমন একটা গাড়িতে করে এসেছেন প্রধান অতিথি।

অনুষ্ঠানের মূল পর্ব শুরু হলো। পুরো অনুষ্ঠানটি এমন লোকদের সম্মানে, যারা পবিত্র কুরআন শিখেছে। আর অতিথিও এমন লোকেরা, যারা এই শিশুদের কুরআন শিখিয়েছে।

এই অনুষ্ঠান সম্প্রচার করতে কোনো মিডিয়া আসেনি। জাতীয় কোনো পত্রিকায় এ নিয়ে একটি কলামও লেখা হয়নি। টেলিভিশনে সংবাদ পাঠ করেনি সুন্দরী কোনো নিউজ প্রেজেন্টার। চারদিক আলোকিত করে জ্বলে ওঠেনি সাংবাদিকদের ক্যামেরার ফ্লাশ।

এবার আসুন বিষয়গুলো একটু বিশ্লেষণ করি।

দৃশ্যপট এক-এর মানুষটি আজকে হয়তো ক্ষমতার বলে সবার সম্মান আদায় করে নিয়েছে, কালকেই সে লাঞ্ছিত হতে পারে। হচ্ছেও। পৃথিবীজুড়ে এমন অনেক নজির আছে।

দৃশ্যপট দুই-এর সোনার ছেলেদের এ সম্মানও ক্ষণিকের। আজ ভালো খেলেছে বলে পুরস্কৃত হচ্ছে। কাল এ সক্ষমতা থাকবে না। বয়স হবে। দল থেকে বাদ পড়ে যাবে। একসময় কেউ আর খোঁজও নেবে না।

এবার আসি আসল কথায়।

প্রথম-দুটি দৃশ্যপটের লোকগুলো দিয়ে যদি পুরো পৃথিবীও ভরে যায়, আল্লাহর তাতে কিচ্ছু যায় আসে না। না এদের সাফল্যে ফেরেশতারা আনন্দিত হয়েছে, না আরশে আজিমে এদের কেউ 'চার আনার' দাম দিচ্ছে। আর না এদের সম্পর্কে প্রিয় রাসুল 'সর্বোত্তম' বলে সার্টিফিকেট প্রদান করেছেন।

অন্যদিকে **দৃশ্যপট তিন**-এর লোকদের কথা ভাবুন।

বিরাট সংবর্ধনা নেই, বিশাল আকারের কোনো আনন্দ শোভাযাত্রাও নেই। নেই, নিউজ প্রেজেন্টারদের চিত্তাকর্ষক প্রেজেন্টেশন। না কোনো টকশোতে আলোচনা হচ্ছে, না মন্ত্রীবর্গের মজলিসে এ নিয়ে কেউ কথা বলছে। তবুও তাদের মর্যাদা এত্ত বেশি যে, আলোচনা হচ্ছে রাজাধিরাজ মহান রবের দরবারে!

আলোচনা হচ্ছে ফেরেশতাদের মজলিসে।

তাদের সম্মানে পায়ের নিচে পাখা বিছিয়ে দিচ্ছে ফেরেশতাবৃন্দ। মাগফেরাতের দোয়া করছে গর্তের পিপিলিকা থেকে নিয়ে সমুদ্রের মাছেরা পর্যন্ত। সবচেয়ে বড় কথা হলো, প্রিয় নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সার্টিফিকেট দিচ্ছেন, 'সে-ই সর্বোত্তম, যে কুরআন শেখে এবং শেখায়।' [*সহিহ বুখারি*, ৫০২৭, শামেলা]

এরপরও কি বুঝতে বাকি, কে প্রকৃত সেলিব্রিটি?

বিসিএস ক্যাডার অথবা ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার হওয়াকে আমরা উচ্চশিক্ষা মনে করি। বড় কোনো চেয়ারে বসতে পারাকে মনে করি সফলতার উঁচু স্তর। সত্যিকারার্থে চিন্তা করে দেখুন তো। এগুলো কি প্রকৃতই উচ্চ ডিগ্রি? এসব তো দুনিয়া হাসিল করার কৌশলমাত্র।

পার্থিব ডিগ্রি কাফের-মুশরিকরাও অর্জন করে। কুরআন-হাদিসের এলেম তাদের কাছে নেই। আমিও সেই ডিগ্রিই অর্জন করলাম, আসমানি এলেমের কোনো কিছুই হৃদয়ে ধারণ করলাম না। তো, তাদের আর আমার মধ্যে পার্থক্য কোথায়?

হৃদয়ে কুরআন নেই—এ তো অত্যন্ত আফসোসের কথা। সব শিখতে পারছি অথচ কুরআন শেখায় সময় দিচ্ছি না—এ তো খুবই অকৃতজ্ঞতার কথা! আসমানওয়ালার গোলাম হয়ে আসমানি নুরে আলোকিত হচ্ছি না—এ তো বঞ্চিতদের লক্ষণ। প্রিয় নবীজিকে ভালোবাসি, অথচ তাঁর কথা আমলে আনছি না—এ তো ভালোবাসার নামে প্রতারণা!

'যে ব্যক্তির হৃদয়ে কুরআন নেই তা একটি বিরান ঘরের মতো।'

[*সুনানুত তিরমিজি*, ২৯১৩, শামেলা]

আসুন, হাদিসের এই আপ্তবাক্যকে স্মরণ করি! বিরান হৃদয়টাকে পূর্ণ করি কুরআনি নুরে।

ছেলে আমার অভিনেতা

আমাদের বাড়ির পাশের বাড়িটায় একটা হেফজখানা হয়েছে। ছয় তলা দালানের পাঁচ এবং ছয় নম্বর ফ্লোরের পুরোটাই মাদরাসা।

একদিন বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে আছি। দেখলাম ১২/১৩ বছরের এক ছাত্র কাঁদতে কাঁদতে মাদরাসা থেকে নামছে।

আমি চোখে-মুখে একরাশ কৌতূহল নিয়ে এগিয়ে গেলাম। বললাম—

: ঘটনা কী? কাঁদছ কেন? হুজুররা মেরেছে?

ছাত্রের গার্ডিয়ান বললেন—

: মারেনি। ও মাদরাসায় পড়তে চাচ্ছে না। বাড়ি নিয়ে যাচ্ছি। বাড়ি নিয়ে আচ্ছা করে ধোলাই দিলেই ঠিক হয়ে যাবে।

আমি ছাত্রভাইটিকে বললাম—

: কী ভাই! পড়তে চাও না কেন?

: মন চায় না।

: মন চায় না কেন? কোনো সমস্যা?

ছাত্রভাইটি আমতা আমতা করছিল। বলতে চাচ্ছিল না। তার এ আচরণে আমি আরও বেশি কৌতূহলী হলাম। বারবার প্রশ্ন করায় জবাব না দিয়ে পারল না—

: আমার এক ফুফাতো ভাই উচ্চ শিক্ষিত। বড় চাকরি করে। অনেক টাকা বেতন পায়। সে বলেছে, মাদরাসায় পড়ে হাফেজ হয়ে কোনো লাভ নেই। সার্টিফিকেট পাব না। সারা জীবন মূর্খই থাকতে হবে। এজন্য আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি মাদরাসায় পড়ব না।'

আমি বিস্মিত গলায় বললাম—

: এটা কোনো কথা হলো? তুমি কুরআনের হাফেজ হলে কি পাবে জানো?

: (সে চুপ করে আছে)

: দোজখ সাব্যস্ত হওয়া ১০ জনকে সুপারিশ করে জান্নাতে নেওয়ার চান্স পাবে। তোমার বাবা-মাকে যে সম্মানের মুকুট পরানো হবে, তোমার ওই ফুফাতো ভাই এবং তার চাকরিকে কোটিবার বিক্রি করলেও তো এর মূল্য হবে না! নিজেকে পণ্ডিত ভাবা তোমার সেই ফুফাতো ভাই-ই গণ্ডমূর্খের কাতারে দাঁড়িয়ে আছে; তুমি নও।

ছোট্ট ছেলে। কুরআনের মর্যাদা তার অতটা বোঝার কথা নয়। আফসোস লাগে ওই সব লোকদের ওপর, যারা কুরআনের শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হয়েও নিজেদের ভাবেন 'মহাপণ্ডিত'। আর ধর্মীয় শিক্ষায় শিক্ষিতদের দাঁড় করাতে চান মূর্খের লাইনে।

প্রফেসর হামিদুর রহমান। একটানা ২৬ বছর বুয়েটের প্রফেসর ছিলেন। তার ছাত্ররা ছড়িয়ে আছে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে। সুনামের সঙ্গে কাজ করে যাচ্ছে। তিনি ছোট থেকে বড় হয়েছেন জেনারেল শিক্ষিত পরিবারে। কিন্তু এলমে দ্বীনের টান তাকে নিয়ে গেছে উলামায়ে কেরামের সোহবতে।

হাফেজ্জি হুজুর রহ. ও আবরারুল হক রহ. সাহেবদ্বয়ের সোহবতে থেকে তিনি হয়েছেন আলেম, দাঈ এবং যুগশ্রেষ্ঠ ওলি।

আমেরিকা, ব্রিটেন-সহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে, লোকেরা তার মূল্যবান নসিহত শোনার জন্য ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষায় থাকে। বয়ান শুনে নিজেদের জীবনকে রাঙিয়ে নেয় আসমানি রঙে।

একবার তিনি বিমানে সফর করছিলেন। হঠাৎ তার ছোটবেলার এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা। বন্ধুটি বিমানের কর্মকর্তা। বহুদিন পর দুই বন্ধুর দেখা হয়েছে। কথায় কথায় জমে উঠেছে সময়টা। একপর্যায়ে ভদ্রলোক বললেন, 'হামিদ, আল্লাহর কাছে তুমি কী জবাব দিবা?'

'কেন?'

'একজন ইঞ্জিনিয়ার হয়েও তুমি তোমার ছেলেদের ইঞ্জিনিয়ার বানালে না! এটা তো ঠিক করোনি! কেন তাদের এ সর্বনাশ করলে?'

হজরত জবাবে বললেন, 'আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহর কাছে জবাব দেওয়ার মতো ব্যবস্থাই আমি করেছি।'

'কী এমন করলে?'

'আল্লাহ তাআলা আমাকে তাঁর দ্বীনকে বোঝার এবং দ্বীনের ওপর চলার সৌভাগ্য দিয়েছেন। এখন আমি যদি আমার ছেলেদের মাদরাসায় না দিতাম, তাহলে আল্লাহর কাছে জবাব দিতে হতো, কেন তাদেরকেও সেই সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত করলাম। ছেলেদের মাদরাসায় দিয়ে আমি সেই জবাবের পথটাই তৈরি করেছি।'

বন্ধুটি এতটুকু কথায় সন্তুষ্ট হতে পারলেন না। তিনি বললেন, 'কিন্তু দ্বীন তো তুমি মাদরাসায় না দিয়েও শেখাতে পারতে! যেমনটা তুমি শিখেছ?'

'হুম, শিখেছি বলেই তো বুঝেছি এই দুটোর মধ্যে কতটা পার্থক্য! ইংরেজি শিক্ষিত হয়ে দ্বীন সম্পর্কে জানা, আর মৌলিকভাবে জানার মধ্যে তো অনেক তফাত!'

বন্ধুটি এই কথায় চুপ হয়ে গেলেন। আর কোনো কথা খুঁজে পেলেন না।

আসলে, দ্বীনি ইলম শিক্ষা করা রত্নের চেয়েও দামি। বুয়েটের একজন প্রফেসর হয়ে দ্বীনকে কতটা প্রয়োজন মনে করেছেন! আর আমরা দু-কলম পড়েই ভেবে নিয়েছি, দ্বীন শেখায় কোনো কামিয়াবি নেই।

এক বন্ধুর জন্য মেয়ে দেখতে গেলাম। পরহেজগার মেয়ে। ফ্যামিলিও দ্বীনদার। মুরব্বি হিসাবে যাকে নিয়ে গেলাম, তিনি পাত্রীপক্ষের কাছে পাত্রের প্রশংসা না করে তার নিজের ছেলের প্রশংসা শুরু করলেন—

: আমার ছেলে তো গ্র্যাজুয়েট। এসএসসিতে স্টারমার্ক, এইচএসসিতে লেটারমার্ক... এখন একটা টেলিভিশনে কাজ করে। ভালো বেতন। কদিন পরপরই ভূটান-মালদ্বীপ করছে। অভিনয়ও করে। নাটক বানাচ্ছে...।

পাত্রীর বাবা বুঝতে পারছিলেন না, কাকে বর বানাবেন! যার সম্বন্ধ এসেছে তাকে, নাকি এই মুরব্বির নাটক বানানেওয়ালা ছেলেকে।

আজকের মুসলিম মাতা-পিতারা গর্ব করে এই বলে যে—

আমার ছেলে গ্র্যাজুয়েট।

আমার ছেলে নেতা।

আমার ছেলে অভিনেতা।

আমার ছেলে ডাক্তার।

অথচ গর্ব করা উচিত ছিল—হাফেজের বাবা হতে পেরে। আলেমের মা হতে পেরে। শহিদের পিতা হতে পেরে।

আফসোস!

ইঞ্জেকশনের সুঁই

নুহার হঠাৎ প্রচণ্ড জ্বর উঠল। জ্বরের তীব্রতায় শুরু হলো খিঁচুনি। চোখ-মুখ উলটে এমন অবস্থা হলো যে, পরিবারের সবাই ভয় পেয়ে গেল। দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলো। ডাক্তার পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে বললেন—

: রোগীকে এখনই ভর্তি করিয়ে দিন। অবস্থা জটিল। দ্রুত এই ওষুধ আর ইঞ্জেকশনগুলো আনার ব্যবস্থা করুন। প্রতিদিন একটা করে মোট ১৪টা ইঞ্জেকশন দিতে হবে। একটাও কম করা যাবে না।

প্রথম দিন হাতে ক্যানোলা পরানো হচ্ছিল। যেহেতু প্রতিদিন 'সুঁই' দিতে হবে, ক্যানোলা পরানো থাকলে সুঁই দিতে সুবিধা হবে। ক্যানোলা পরানোর সময় মর্মান্তিক এক ঘটনা ঘটল। নুহার সঙ্গে সঙ্গে উম্মে নুহাও হাউমাউ করে কেঁদে উঠল। কেঁদে কেঁদে নার্সদের বলছিল—

: প্লিজ, সিস্টার। আমার মামণিকে ছেড়ে দিন। ওকে ইঞ্জেকশন দিতে হবে না। ও ব্যথা পাচ্ছে। ওর খুব কষ্ট হচ্ছে!

নার্সরা প্রথমে শান্ত গলায়, পরে কিছুটা খেপে গিয়ে বলল—

: চুপ করেন তো! আপনি কি আপনার বাবুকে বাঁচাতে চান না? সুস্থ দেখতে চান না?

: চাই তো, চাই। (কান্নাজড়িত গলায়)

: তাহলে একদম কান্নাকাটি করবেন না। চুপচাপ বসে থাকুন।

উম্মে নুহা চুপ করে গেল। ভেজা চোখে শুধু তাকিয়ে রইল। অসহায় চোখে চেয়ে চেয়ে মেয়ের কান্নাকাটি দেখল। কিছুই করার নেই। বুকের ধনকে রোগমুক্ত করতে হবে। এই মুহূর্তে হৃদয়টাকে পাষাণ করা ছাড়া উপায় নেই।

শুধু উম্মে নুহা না; সব মা-বাবাই চান, সাময়িক একটু কষ্ট হয় হোক, তবুও আদরের ধন, মানিক-রতন প্রিয় বাবুটা রোগমুক্ত থাকুক।

এ তো গেল শারীরিক রোগ। সন্তান বড় হয়ে কখনো কখনো আত্মার রোগেও রোগী হয়।

আমার পরিচিত এক ভদ্রমহিলা আছেন। সন্তানদের গায়ে সামান্য কাঁটা ফুটলেও অস্থির হয়ে যেতেন। ইঞ্জেকশন দেওয়া তো দূরের বিষয়, ওষুধ খাওয়াতে চাইলে, তিতার কারণে যদি ছেলে কান্নাকাটি করে, খেতে না চায়, তিনি খাওয়াতেন না। বলতেন, আহারে তিতকুট লাগে। খাইতে চায় না। খাইতে না চাইলে কী দরকার জোর করে কষ্ট দেওয়ার?

অতি আদরের কারণে তার ছেলেপিলেরা মানুষ হয়নি। নামাজ-রোজার প্রতি মোটেও যত্নশীল না। আয়-রোজগারে হালাল-হারামের তোয়াক্কা করে না। অথচ মায়ের এই নিয়ে কোনো মাথাব্যথা নেই। এই মহিলার মতো অনেকেই আছেন, সন্তানের আখেরাত তৈরির ব্যাপারে মোটেও মাথা ঘামান না।

সন্তান ঘুমিয়ে আছে। ওদিকে ফজরে মুয়াজ্জিন ডাকছে। এই পরিস্থিতিতে অনেক বাবা-মা এমন আছেন, ভাবেন, 'আহারে! অনেক রাতে ঘুমিয়েছে। ঘুমাক না আরেকটু। থাক, ডাকাডাকির দরকার নাই।

সন্তান টিভি-মুভি দেখছে? দেখুক না!

একটু-আধটু বিনোদিত হচ্ছে, হোক না!

নামাজের সময় খেলতে যাচ্ছে? যাক না!

মেয়েবন্ধু কি বন্ধু না? বন্ধুই তো। এত কাঠখোট্টা হলে কি চলে? মেয়ে বন্ধুর সঙ্গে মিশুক না!

এই যে সন্তানের প্রতি আদরে বিগলিত হয়ে গেলেন। তাকে সাময়িক Attracion (আকর্ষণ) থেকে বিরত থাকার যৎসামান্য কষ্টটুকু দিতে চাইলেন না। মূলত এটাই তার দীর্ঘমেয়াদি ক্ষতির কারণ। আর যদি আপনি তাকে এর থেকে বিরত রাখতে চান, তাহলে হয়তো সে বেঁকে বসবে। মানতে চাইবে না। 'অন্যরা করছে, আমি করলে সমস্যা কী'—বলে গোয়ার্তুমি করবে। 'কেন বাধা দিচ্ছ'—বলে উচ্চবাচ্য করবে। করুক। এ সবই 'ইঞ্জেকশনের সামান্য সুঁই' হিসাবে ধরে নিতে হবে। মূলত এতেই তার জন্য মঙ্গল। এটাই হবে বাবা-মা হিসাবে সন্তানের 'ভালো চাওয়া'।

অসীম অমঙ্গলের দিকে ছুড়ে মারার চেয়ে এ-ই হবে স্বস্তির কারণ।

পানির ট্যাংক

বাড়ির ছাদের ওপর বিশাল একটা পানির ট্যাংক। ট্যাংক থেকে পাইপের অনেকগুলো লাইন নিচে নেমে এসেছে। একেক পাইপ একেক দিকে গেছে।

কিছু পাইপ রান্নাঘরের দিকে।

কিছু পাইপ বাথরুমের দিকে।

কিছু আবার দেয়াল বেয়ে নেমে এসেছে বেসিনে।

ট্যাংক একটা। কিন্তু পাইপলাইন অনেকগুলো। এর থেকে অনেকেই সুফল পাচ্ছে। কেউ রান্না করছে। কেউ গোসল সারছে। কেউ কেউ একই ট্যাংক থেকে পান করার জন্য গ্লাসে করে পানি নিয়ে নিচ্ছে।

এভাবেই চলছিল। চলছিল ভালোই। কেন যেন ট্যাংকটি একদিন বিদ্রোহ করে বসল—অনেক হয়েছে! এখন থেকে আমি আর ঠিকঠাক পানি সাপ্লাই দেবো না। নিজেও নোংরা থাকব, অন্যদেরকেও বিশুদ্ধ পানি থেকে বঞ্চিত করব।

পরদিন সকালবেলা। গৃহবধূ রান্নাঘরে গেল। কল টিপতেই দুইপা পিছিয়ে এসে বলল, 'এ্যাঁমা! কী বিচ্ছিরি অবস্থা! কল থেকে দেখছি ময়লা পানি বের হচ্ছে!'

রান্নাই বন্ধ হয়ে গেল। ময়লামুক্ত পানি ছাড়া কি রান্নাবান্নার কাজ চলবে? এই পানি কি পান করার যোগ্যতা হারাবে না? শিশু-কিশোর, জোয়ান-বুড়ো সবাই কি অসুস্থ হয়ে পড়বে না? শৌচকার্যেও তো কেউ এই পানি ব্যবহার করতে চাইবে না!

তাহলে, সবকিছুর মূলেই হলো ট্যাংক। ট্যাংকে যা থাকবে, পাইপ দিয়ে সেই জিনিসই বের হবে।

প্রতিটি সন্তানের জন্য মায়েরা হচ্ছেন একেকটি পানির ট্যাংক। মায়েদের হাত-পা, চোখ-মুখ, উঠা-বসা, চলা-বলা—সন্তানদের জন্য একেকটি

পাইপলাইন। মায়েরা যেভাবে চলবেন, সন্তানও সে পথই অনুসরণ করতে চাইবে।

আমার পরিচিত একজন মায়ের কথা বলি। তিনি তার ছেলেকে মাদরাসায় দিয়েছেন। কুরআনের হাফেজ বানাতে চান। ছেলে পড়াশোনায় মনোযোগ দিতে পারে না। আমুখতা শোনাতে গেলে সাতসবক ভুলে যায়। সবক শোনাতে গেলে ভুলভাল পড়ে। কিছুই মনে রাখতে পারে না। কেন তার এ অবস্থা?

শিক্ষক জানতে চাইলেন—

: ছুটিতে বাসায় গেলে সে কী করে?

ছেলের মা জানালেন—

: সারাক্ষণ মোবাইল নিয়ে বসে থাকে। গেমস খেলে। নাটক-সিনেমা দেখে।

শিক্ষক বিস্মিত হয়ে গেলেন—

: ইন্না লিল্লাহ! এসব সে পায় কোথায়?

ছেলের মা লজ্জিত হয়ে গেলেন। লজ্জিত না হয়ে উপায়ও নেই। মা নিজেই এগুলো ইন্টারনেট থেকে ডাউনলোড করেন। সংসারের কাজকর্মের অবসরে এগুলোই তার সঙ্গী। নাটক-সিনেমা না দেখলে তার সময় কাটে না। মা যদি এমন হন, তাহলে সন্তানের ওপর তো এর প্রভাব পড়বেই! সন্তানের পড়াশোনা, আদব-লেহাজ, তাহযিব-তমদ্দুনে ব্যাঘাত তো ঘটবেই।

মায়েদের কাছে অনুরোধ। দয়া করে ট্যাংকটি ময়লামুক্ত, স্বচ্ছ এবং পবিত্র রাখুন।

হৃদয়ে মা জননী

(মা। একটি মায়াময় শব্দ। যার মা নেই সে-ই বোঝে মা হারানোর ব্যথা। বইটি লেখার সময় আমাদের মা-ও চলে গেছেন না ফেরার দেশে। মাকে নিয়ে লিখতে চেয়েছিলাম। পারিনি। কোন শব্দে মাকে আঁকব? চোখ ঝাপসা হয়ে এসেছিল। ঝাপসা চোখে তো আর কিছু লেখা যায় না।

আমাদের সাত ভাইবোনের মধ্যে যে বোনটি একটু বেশি ধৈর্যশীল, সে কিছুটা লিখতে পেরেছে। নিচের এই লেখাটি তার ডায়েরি থেকেই নেওয়া।

পারিবারিক কিছু লিখে বইটির কলেবর বাড়িয়েছি, এমনটি নয়; বরং যাদের মা এখনো বেঁচে আছেন, তারা যেন এই লেখাটি পড়ে মায়ের মূল্যায়ন করেন, এই নিয়তেই লেখাটি তুলে ধরেছি। আল্লাহ সবার মাকে বেহেশতের মেহমান বানিয়ে নিন।)

বিসমিহি তাআলা।
মাকে নিয়ে আমি কিছু লিখতে চাই। জানি এই যোগ্যতা আমার নেই। তবুও চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ।

১০ অক্টোবর ২০২১।
আমাদের জন্য একটি শোকের দিন। মা আমাদের ছেড়ে এই দিনই চলে যান রবের ডাকে। বেঁচে থাকতে তেমন বুঝিনি মায়ের মর্ম। দিতে পারিনি মাকে মর্যাদা ও সম্মান। কখনো প্রাণভরে মায়ের সেবা-যত্ন করিনি। কখনো পা-দুটো জড়িয়ে ধরে ক্ষমা চাওয়া হয়নি। কিন্তু আজ প্রতিটি শিরায় শিরায় উপলব্ধি করছি, মা কী রত্ন ছিলেন। কী অমূল্য সম্পদ আমরা হারিয়েছি।

জানি না পৃথিবীর প্রতিটি মা-ই এমন হয় কি না। আর আমিই-বা পারব কি না আমার মায়ের মতো আদর্শবান হতে। ছোট থেকে তিনি আমাদের সীমাহীন পরিশ্রম ও যত্ন করে লালন করেছেন।

আমরা সাত ভাইবোন ছিলাম মায়ের কাছে মহা মূল্যবান রত্ন। কেননা আমাদের ছাড়া দুনিয়ায় আপন বলতে মায়ের তেমন কেউ ছিল না। মা তার

বাবা-মা হারিয়েছিলেন জন্মের পরই। তাই আমাদের দিকে তাকিয়ে তিনি মা-বাবা হারানোর দুঃখগুলো ভুলে থাকতেন।

শিশুকালে প্রাথমিক শিক্ষা আমরা মায়ের কাছেই নিয়েছি। যখন গ্রামে ছিলাম, মা সারা দিন ছাত্র-ছাত্রী পড়াতেন। আবার রাতে বসতেন আমাদের নিয়ে। অনেক কষ্ট করেছেন। সংসারে হাজারটা টানাটানি থাকা সত্ত্বেও বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে সংসার চালাতেন। নিজে খুব বেশি পড়াশোনা করতে পারেননি, কিন্তু আমাদের পড়াশোনার ব্যাপারে খুব সজাগ ছিলেন। ভালো লেখাপড়ার জন্য আমাদের ভর্তি করান ঢাকার মাদরাসায়। যা ওই সময় আমাদের পরিবারের পক্ষে খুবই দুঃসাধ্য ছিল।

আম্মা সারা জীবনই অনেক অসম্ভবকে জয় করেছেন। গ্রাম ছেড়ে ঢাকায় আসার পরেও করেছেন অক্লান্ত পরিশ্রম। যেহেতু আমাদের ছাড়া আম্মার আপন কেউ ছিল না, তাই আমাদের সামান্যতম বেয়াদবিও আম্মা সইতে পারতেন না, খুব কষ্ট পেতেন।

আমাদের লেখাপড়ার পেছনে আম্মার অবদান ছিল সবচেয়ে বেশি। তিনি সাহস দিয়েছেন ও সাহায্য করেছেন এবং মোনাজাতে কেঁদেছেন। মেয়েরা বেশি পড়াশোনা করুক এটা আব্বার তেমন পছন্দ ছিল না। অবশ্য এর যুক্তিসংগত কারণও ছিল। কিন্তু মায়ের কথা ছিল, 'পড়তে চাইলে বাধা নেই। যত পারো পড়ো।'

পড়াশোনার কারণে আমাদের থাকতে হতো মাদরাসার বোর্ডিংয়ে। আবার পড়াশোনা শেষ করার পরপরই চলে যাই শ্বশুরালয়ে। যার কারণে মা তার কোনো মেয়েকেই নিজের কাছে রাখতে পারেননি।

দূরের বা বাসের জার্নি করতে খুব কষ্ট হতো আম্মার। সেজন্য তিনি চাইতেন অন্তত একটা মেয়ের হলেও কাছাকাছি বিয়ে হোক। আল্লাহ সে চাওয়া পূরণ করেছেন। মায়ের সবচেয়ে আদরের ছোট মেয়ের বিয়ে হয়েছে একেবারে কাছাকাছি; রিকশার দূরত্বে।

কিন্তু আল্লাহর কারিশমা তো একমাত্র আল্লাহই বোঝেন! ছোটবোনের বিয়ের কিছুদিনের মধ্যেই মাকে নিয়ে যান তাঁর কাছে। যেন তিনি এটাই বোঝাতে চেয়েছেন যে, সাতটি সন্তান মানুষ করার জন্যই আমি তোমাকে দুনিয়ায় বাঁচিয়ে রেখেছিলাম। এখন তো সবার পড়াশোনা ও বিয়েশাদি শেষ হয়েছে। অতএব, তুমি চলে এসো আমার কাছে।

আম্মাকে নিয়ে লিখতে গিয়ে একটা কথা খুব মনে পড়ছে। আমি তখন ক্লাস থ্রিতে পড়ি। একদিন অত্যন্ত বরকতপূর্ণ একটা স্বপ্ন দেখেছিলাম। দেখি, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। কথা বলছেন। কথা প্রসঙ্গে বুঝলাম, তিনি আমার নানা হন। এই স্বপ্নের মানে আমি তখন বুঝিনি। বড় হয়ে জেনেছি, আল্লাহর রাসুলের একজন মেয়ের নাম ছিল উম্মে কুলসুম। কাকতালীয় ব্যাপার হলো, আমার মায়ের নামও ছিল উম্মে কুলসুম। সেদিক দিয়ে চিন্তা করলে, প্রিয় হাবিব আমার নানার মতোই।

যা-ই হোক, আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ, নবীর মেয়ের নামের বরকতে যেন তিনি আমার আম্মার কবরের জানালা রওজা মুবারকের সঙ্গে সংযুক্ত করে দেন। চির এতিম মা আমার। যেন এতিম রাসুলের সঙ্গে মিলিত হয়ে আত্মার প্রশান্তি লাভ করতে পারেন।

৬০ বছরও হয়নি মায়ের বয়স। এত কম বয়সে এত তাড়াতাড়ি আম্মা আমাদের ছেড়ে চলে যাবেন, স্বপ্নেও ভাবিনি। আম্মার দায়িত্ব তো তিনি শেষ করে গেছেন সন্তানদের দ্বীন শিখিয়ে। কিন্তু আম্মার প্রতি আমাদের যে দায়িত্ব ছিল তা তো কেবল শুরু হয়েছিল। সেই সুযোগ আমরা আর কাজে লাগাতে পারলাম না। তার আগেই মা আমাদের ছেড়ে চিরবিদায় নিলেন।

ও মা, তোমার সেবা-যত্ন করার সৌভাগ্য আমাদের কেন হলো না, মা! তোমার স্মৃতির মাঝেই আমরা বেঁচে আছি। তোমার হাঁটা-চলা, তোমার হাসি, তোমার খাওয়া ও চেয়ারে বসে নামাজ পড়া—সবই চোখের সামনে ভাসে। তালিমের সময় ধীরে ধীরে হাদিস পড়ার আওয়াজ, তোমার চিকন, মিহি গলায় পুরোনো দিনের গজলের সুর, তোমার নাতি-নাতনিদের নিয়ে হাসি-মজার সেই মুহূর্তগুলো—সবই একে একে মনে পড়ছে।

তোমার মোবাইল নম্বরটা এখনো সেভ করা আছে, মা। মুছে ফেলিনি এই আশায় যে, যদি কখনো কল আসে! রিসিভ করে 'মা তুই কেমন আছিস'—এই মিষ্টি গলাটা শুনতে পাই! এখনো মনে হয় তুমি কোথাও লুকিয়ে আছ। হয়তো একদিন আসবে। এসে বলবে, ঘরটা এমন অগোছালো কেন?

মাগো, কেন দিয়েছ এত ভালোবাসা? যদি এত মমতা না দিতে, তাহলে তো এতটা কষ্ট হতো না। যখন মনে হয় সত্যিই আমার মা আর ফিরবে না, তখন আর ঠিক থাকতে পারি না। কলিজাটা দুমড়েমুচড়ে যায়। দুনিয়াটা হয়ে যায় অন্ধকারে আচ্ছন্ন।

আম্মার কাছে কোনো প্রয়োজনে টাকা চাইলে নিষেধ করেননি। যত কষ্টই হোক টাকা জোগাড় করে বলতেন, 'প্রয়োজনীয় খরচ যখন যা লাগে করবি। কিন্তু কখনো অপচয় করবি না।'

শেষ পর্যন্ত একটা নাকফুল ছাড়া আম্মার নিজের স্বর্ণালংকার বলতে আর কিছু ছিল না। তিনবার চেইন কিনেও আম্মা গলায় ঝোলাতে পারেননি। কোনো না কোনো প্রয়োজনে বিক্রি করে দিয়েছেন। আম্মার দেওয়া গহনা সব মেয়ের কাছেই আছে। আমারও ছিল। কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য, মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে আম্মার স্মৃতিটাও হারিয়ে গেল। অসভ্য ছিনতাইকারীরা ছিনিয়ে নিলো সেটা। ওরা আমার গলা থেকে চেইন কেড়ে নিয়েছে ঠিকই। কিন্তু আমার হৃদয় থেকে মায়ের ভালোবাসা কি কেড়ে নিতে পেরেছে!

ছেলেমেয়ের সুখের জন্য এমন কিছু নেই, যা আম্মা করেননি। কেনার সময় কিনতেন সবচেয়ে ভালোটা। খাওয়ার বেলায় বাসি ও পুরোনো খাবার ছাড়া কিছু খেতে চাইতেন না। যেন ভালোটা সবাই পেটপুরে খেতে পারে, আবার বাসিগুলোও অপচয় না হয়।

আমাদের জন্য তিনি বেশি চিন্তা করতেন। কত বোঝাতাম, মা দুনিয়ার বাড়ি-গাড়ি দিয়ে কী হবে? দোয়া করো যেন পরকালের বাড়ি বানাতে বাড়ি। আম্মা অনেক দোয়া করতেন। প্রিয় আম্মার কাছে জানতে ইচ্ছা করে, মৃত্যুর পরেও কি আমাদের কথা ভাবো, মা?

আম্মা অন্য সকল মায়েদের মতো সামনাসামনি এতটা মায়া দেখাতে পারতেন না। কিন্তু হৃদয়ে ছিল সবার জন্য গভীর ভালোবাসা। আব্বার সঙ্গে বাচ্চাদের মতো টুকটাক কথা কাটাকাটি লেগেই থাকত। অথচ আড়াল হলেই তার জন্য সারাক্ষণ চিন্তা করতেন। বাড়ি ছেড়ে কোথাও গিয়ে থাকতে দিতেন না। নিজেও কোথাও গেলে একরাতও থাকতে চাইতেন না।

এখন কীভাবে আছ, মা? এখন কে দেখে রাখবে তোমার সাজানো এ সংসার? কেউ কি পারবে তোমার মতো এত যত্ন করতে? আমাদের সকলকে শোক-সাগরে ভাসিয়ে কেন এভাবে চলে গেলে?

প্রথম যখন মায়ের মৃত্যুর সংবাদটা কানে শুনি, তখন কেমন লেগেছিল তা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব হবে না মনে হচ্ছিল! পৃথিবীটা বুঝি এখানেই শেষ হয়ে যাবে! মা ছাড়া কীভাবে থাকব দুনিয়ায়, এটাও কি সম্ভব? আল্লাহর কাছে শুধু দোয়া করেছি, হে আল্লাহ, ধৈর্যধারণের তাওফিক দিন।

হ্যাঁ, তিনি দিয়েছেন। এই ধৈর্যটুকু দেওয়া হয় বলেই মা-বাবাহারা সন্তানরা বেঁচে থাকছে। নয়তো মা-বাবা হারানোর শোক নিয়ে বেঁচে থাকা সম্ভব হতো না। হাসপাতাল থেকে আনার পর মায়ের চেহারা দেখে মনে হচ্ছিল, আম্মা সবেমাত্র ঘুমিয়েছেন। কাফন পরানোর পরের সেই মধুমাখা হাসিটা আজও চোখের সামনে ভেসে ওঠে। আম্মা সবসময় জলপাই ও বিস্কুট রংটা পছন্দ করতেন। অথচ সেদিন একটা সাদা কাফন গায়ে দিয়ে চলে গেলেন। সর্দির সমস্যা ছিল আম্মার। অথচ সেদিনের পর থেকে আজ অবধি শুয়ে আছেন মাটির বিছানায়।

তুমি তো একা থাকতে ভয় করতে, মা! তাহলে এখন কাকে নিয়েছ তোমার সঙ্গে? সেদিন চোখের সামনে দিয়ে ওরা তোমাকে কবরে নিয়ে গেল। পারিনি সেদিন তাদের বাধা দিতে। তুমি আমাদের সঙ্গে রাগ করলে বলতে, 'কাউকে কিছু না বলে হারিয়ে যাব।' কিন্তু তুমি তো সকলের সামনে দিয়েই চলে গেলে! এটাই কি সেই চলে যাওয়া?

তুমি তো সারা জীবন শুধু কষ্টই করেছ। আমাদের কোনো কষ্ট পেতে দাওনি। কিন্তু আমরা তো তোমাকে দিয়েছি সীমাহীন কষ্ট। ক্ষমা চাওয়ারও সুযোগ দাওনি। নাকি মায়ের কাছে সন্তানের কোনো অন্যায় থাকে না, এ কথাই প্রমাণ করেছ, মা?

তুমি আমাদের দ্বীন শিখিয়েছ। আলোর পানে চলার রাস্তা দেখিয়েছ। সবসময় বলতে, আল্লাহ যেন তোমাকে সবচেয়ে বড় জান্নাত দান করেন। তুমি তা পাবে ইনশাআল্লাহ। কারণ যৌবনকাল থেকেই তুমি অনেক ইবাদত-বন্দেগি করেছ। তাহাজ্জুদ ছিল তোমার আত্মার প্রশান্তি। শেষ বয়সে শারীরিক এত সমস্যা থাকা সত্ত্বেও তুমি সর্বদা অজুর সাথে থাকার চেষ্টা করেছ।

তুমি যেমন সারা জীবন আমাদের ভুলত্রুটি ক্ষমা করেছ, তেমনই তোমার আমলের ভুলত্রুটিও আল্লাহ্ ক্ষমা করবেন। আম্মা ও আম্মা, কেমন লাগে তোমার কবরের বাড়িটা? কেমন কাটছে তোমার দিনগুলো? মনে কি পড়ে আমাদের? আমরা তো ভুলতে পারি না, মা! চিরকাল মনে রাখব, মা!

তোমাকে আমরা সত্যিই অনেক ভালোবাসতাম, মা। কিন্তু আমরাও যে তোমার মতো স্বভাব পেয়েছিলাম। যার কারণে ভালোবাসাটা কখনো প্রকাশ করতে পারিনি।

ফুল শুধু সুবাস দেয়। ফল শুধু ক্ষুধা মেটায়। কিছু জিনিস শুধু শান্তি দেয়। কিছু জিনিস শুধু আশ্রয় দেয়। কিন্তু মা এমন জিনিস, যেখানে সবকিছুই একসঙ্গে পাওয়া যায়।

মায়ের কাছে আছে শান্তি, আছে আশ্রয়, আছে আনন্দ আর তৃপ্তি। মায়ের হাসিতে যে সুবাস আছে তা দুনিয়ার কোনো ফুলে নেই। আমার মায়ের হাসি সত্যিই এতটা সুন্দর ছিল। আম্মার হাসিতে কখনো শব্দ হতো না। মুচকি হাসতেন। তাতেই ছিল অতুলনীয় সৌন্দর্য। যা আমরা হারিয়েছি জীবনের তরে।

মুখফুটে বলার আগেই মা বুঝে যেতেন সন্তানের মনের ব্যথা। শব্দ করে কাঁদার আগেই মা বুঝতে পারতেন সন্তানের মনের দুঃখ। চাওয়ার আগেই বুঝতেন, কীসের অভাব আমাদের? আন্দাজ করতে পারতেন বলার আগেই।

আজ বুঝি গো মায়ের ব্যথা,
মা যে কত আপন।
কখনো বুঝিনি মা যে কী ধন,
দিয়েছি যখন দাফন!

আমার মা এতিম ও অসহায়ভাবে বড় হয়েছেন যদিও, কিন্তু সকল ক্ষেত্রে তাঁর যে পরিমাণ মেধা ও বুদ্ধি ছিল তা অনেক উচ্চশিক্ষিত মানুষদেরও থাকে না। মা সবসময় এ কথাটি বলতেন—'শিক্ষার চেয়ে জ্ঞান অনেক বেশি দামি। প্রকৃত জ্ঞানী হওয়ার চেষ্টা করো।'

কাউকে যখন আম্মা উপদেশ দিতেন, মনে হতো তিনি আসলেই উচ্চতর ডিগ্রি অর্জন করা মহিলা। এ কারণে প্রতিবেশী অনেক মহিলাই

আম্মার পরামর্শগুলোকে গুরুত্ব দিতেন। আমাদের বাসায় মাসতুরাতদের (মেয়েদের) তালিম হয়। অনেকেই তালিম শুনতে আসেন। আম্মার আন্তরিক প্রচেষ্টায় অনেক মহিলা দ্বীনদার হতে পেরেছেন। অনেকে দ্বীনদার পরিবার গঠনের দীক্ষা পেয়েছেন। আম্মা চলে যাওয়ার পর পুরো মহল্লাটাই যেন অভিভাবকশূন্য হয়ে যায়। মেয়েরা, মেয়ের মায়েরা, এমনকি শিশুরাও আম্মার মৃত্যুতে কেঁদেছে।

আম্মার সঙ্গে যাদের ওঠাবসা ছিল, সেসব মহিলা বলছিলেন, 'আমরা যেন বিরাট একটা বটবৃক্ষ হারিয়ে ফেললাম।'

পরিচিত-অপরিচিত সবাইকে অকাতরে মায়া-মহব্বত করতেন। কারও ব্যথায় তিনি ব্যাকুল হতেন তো, কারও বিপদে এগিয়ে যেতেন। কারও বাবা-মা মারা গেলে তাদের জন্য অনেক আফসোস করতেন। বলতেন, আহারে কীভাবে থাকবে বাচ্চাগুলো? গিয়ে দেখে আসতেন।

তোমার শিক্ষা নিয়েই বাকি জীবন চলতে চাই, মা।

তুমি শিখিয়েছ কীভাবে মানুষকে ভালোবাসতে হয়। কীভাবে দুঃখের দিনগুলো ভুলে গিয়ে সুখের দিনগুলোর কথা বেশি বেশি মনে করতে হয়। তুমি শিখিয়েছ কেউ দুঃখ দিলেও কীভাবে তাকে আপন করতে হয়। শিখিয়েছ কীভাবে সন্তানকে সুশিক্ষায় শিক্ষিত করতে হয়।

তুমি শিখিয়েছ কীভাবে সকল সন্তানকে সমানভাবে ভালোবাসতে হয়। আর শিখিয়েছ মা-বাবা না থাকলেও সন্তানের মুখ চেয়ে সকল যাতনা সয়ে কীভাবে হাসিমুখে জীবন পার করতে হয়। তোমার থেকে শিখেছি ধৈর্য। তোমার থেকে শিখেছি সাহস। শিখেছি, হাজারও অভাবকে সঙ্গী করে কীভাবে পথ চলতে হয়।

পৃথিবীতে ভালোবাসার মতো বহু লোক আছে। কিন্তু তোমার মতো ভালোবাসতে পারবে না কেউ। মায়ের ডাকে যে মায়া ঝরে পড়ে তা আর কারও ডাকে নেই। তোমার চলে যাওয়ার বছর দুয়েক আগে পিত্তপাথরের যে অপারেশনটি হয়েছিল, তখন অপারেশন থিয়েটারে প্রবেশের আগে আমি তোমাকে দেখতে গিয়েছিলাম। তুমি আমাকে জড়িয়ে ধরে কপালে চুমু খেয়েছিলে। সেই চুমুর স্বাদ এখনো আমি পাই, মা।

স্বপ্নে তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। কিন্তু বাস্তবে তোমার দেখা আর তো পাব না। তবে কেন শেষ বিদায়ের আগে একটু আদর করে দিয়ে গেলে না? এভাবে তুমি কী করে সন্তানের মায়া ত্যাগ করলে?

দুনিয়ায় থাকতে যেভাবে সন্তানের দুঃখে দুঃখী হতে, সেভাবে পরকালেও আমাদের মনে রেখো। ভুলে যেয়ো না তোমার অবাধ্য সন্তানদের কথা। যখন সবাই বাসায় একত্রিত হই, তখন তোমার কথা খুব মনে পড়ে। তোমার জন্য তখন সম্মিলিত মুনাজাতে দোয়া হয়। ইসালে সাওয়াব পাঠানো হয়। কুরআন-হাদিসের তালিমের যে পরিবেশ তুমি চালু করে গিয়েছিলে, তা এখনো আছে এবং আজীবন থাকবে। সকলেই তোমার জন্য দোয়া করে। কবরে তুমি ভালো থাকবেই, মা। এটা আমাদের একান্ত বিশ্বাস।

যখন নীরবে তোমার কথা মনে করি। তখন জানালার পাশে বসে বাচ্চাদের মতো রাতের তারার ভিড়ে তোমায় খুঁজি। আকাশপানে তাকিয়ে মনের কথাগুলো তোমার কাছে বিড়বিড় করে বলি। জানি তুমি শুনবে না। কিন্তু কী করব, মা? তোমার মতো কাউকে তো আর খুঁজে পাব না! কেউ তা শুনতেও চাইবে না। 'ক্ষণিকের আবেগ' বা 'পাগলের প্রলাপ' মনে করে এড়িয়ে যাবে। তাই তারাদের সঙ্গে কথা বলি আর ডায়েরিতে লিখে রাখি।

তোমার স্মৃতিগুলো আমি যেই ডায়েরিতে লিখেছি তার নাম কি জানো, মা? আল-মক্কী। তোমার হজ্জ করার অনেক ইচ্ছা ছিল। জীবিত থাকতে তাওফিক হয়নি। তাই 'মক্কী' নামক ডায়েরিতে তোমার স্মৃতিচারণ করেছি। একটি কথা জানলে তুমি খুশি হবে, মা। তোমার পক্ষ থেকে বদলি হজ্জ করা হবে! এর সাওয়াব তুমি কোনো পরিশ্রম ছাড়াই কবরে পেয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ।

তোমার স্মৃতি সারা জীবন স্মরণ করেও শেষ করা যাবে না, মা। জান্নাতে একদিন তোমার সঙ্গে আমাদের দেখা হবে। হৃদয়ে জমে থাকা কথাগুলো তখন আমরা বলতে থাকব। তখন তো তোমার অসুস্থতা থাকবে না। কোনোরূপ কষ্টও থাকবে না। তুমি হবে জান্নাতের অপরূপা রমণী। তুমি তো সৌন্দর্য অনেক পছন্দ করতে। তোমার মনের আকাঙ্ক্ষা আল্লাহ সেদিন পূর্ণ করবেন ইনশাআল্লাহ।

প্রিয় বাইকার, লেখাটি আপনার জন্য

রুখসানা আপার দুই ছেলে। বড়টার নাম সিয়াম। মহা ত্যাঁদড়। ফ্যামিলির কাউকেই পাত্তা দেয় না। ক্লাস এইটে পড়ার সময় এই ছেলে মা'র কাছে দাবি করে বসল, 'আমাকে বাইক কিনে দেবে কি না বলো। নইলে গাড়ির নিচে চাপা পড়ে মরে যাব।'

ছেলেদের বাবা সৌদি প্রবাসী। মাস শেষে মোটা অঙ্কের টাকা পাঠায়। দায়িত্ব বলতে এইটুকুই। মা বেচারি ভয় পেয়ে গেলেন। আদরের ছেলে। বড় আদরের! বাইক না কিনে দিলে যদি সত্যি সত্যি গাড়ির নিচে মাথা দেয়! মহামুশকিল! মায়ের মন। বাপকে বললেন, 'এই মাসে বেশি করে টাকা পাঠিয়ো।'

'কেন?'

'দরকার আছে।'

'কী দরকার?'

'নতুন কিছু ফার্নিচার কিনতে হবে। আরও কিছু কেনাকাটা আছে।'

স্বামীকে ভুলভাল বুঝিয়ে টাকার ব্যবস্থা করলেন। সেই টাকায় ছেলেকে কিনে দিলেন বাইক। ছেলে তো মহা খুশি! খুশি হওয়ার কারণ দুটি। ১. ঘাড়ত্যাড়ামিতে কাজ হয়েছে। ২. বন্ধুদের সঙ্গে টেক্কা দেওয়ার ব্যবস্থা হয়ে গেছে!

দুই দিন মাত্র। তৃতীয় দিন ট্রাকের সঙ্গে লেগে বাইক-সহ চিৎপটাং। হাইওয়েতে বন্ধুদের সঙ্গে পাল্লাপাল্লি চালাচ্ছিল। এক বন্ধু আবার মোবাইল ফোনে সেই পাল্লাপাল্লির ভিডিয়ো করছিল। সেই ভিডিয়োতে অ্যাকসিডেন্টের দৃশ্য স্পষ্ট। সিয়ামের বাইকটি সবার পেছনে ছিল। ফুল স্পিড দিয়ে মহা আনন্দে একে একে সবাইকে পেছনে ফেলে এগিয়ে যাচ্ছিল!

সবার সামনের বাইকারকে পেরিয়ে যাওয়ার সময় নেচে নেচে আবার আনন্দের জানানও দিচ্ছিল! ততক্ষণে ঘটে গেছে ঘটনাটা। ট্রাকের কোনায়

সামান্য একটু টোকা লেগেছিল। এতেই কুপোকাত। ছিটকে গিয়ে ধাক্কা খেল ১০ হাত দূরের গাছের সঙ্গে।

ফলাফল, পায়ের হাড্ডি গুঁড়ো গুঁড়ো! মাথায় গোটাচারেক সেলাই।

এ সময়ের ছেলেগুলো যেন কেমন! অন্যায় আবদার না করলে যেন চলেই না। মা-বাবাকে ব্ল্যাকমেইল করে খায়েশ মেটানো চাই-ই চাই। বড়দের অসন্তুষ্টি আর প্রতিবেশী কিংবা পথচারীদের বিরক্তিকর বদদোয়ায় ছারখার হয়ে যাচ্ছে একেকজন। তবুও যেন বিকার নেই।

ফেসবুকে একবার একটা লাইভ ভিডিয়ো দেখছিলাম। অ্যাকসিডেন্টের ভিডিয়ো। ওপরের ঘটনাটার মতোই। বন্ধুদের সঙ্গে রেসিং খেলছিল। ফলাফল তো সহজেই বোঝা যায়। হাত-পা ভেঙেচুরে পড়ে আছে রাস্তায়। তড়পাচ্ছে! কেউ এগিয়ে আসছে না।

কেন আসছে না?

ভিডিয়োটি দেখতে থাকা দর্শকদের কমেন্টগুলো দেখলেই বোঝা যাবে—

কমেন্ট ১. এদের কারণে রাস্তায় অনেক দুর্ঘটনা ঘটে! এরা যেমন নিজের জীবনের মূল্য বোঝে না, অন্যের জীবনের দামও দেয় না। যার ফলে এসব বাইকাররা জীবনের অনেকটা সময় পঙ্গুত্ব নিয়ে কাটায়, আর বাবার কষ্টার্জিত টাকাগুলো নষ্ট করতে থাকে। আবার এদের কারণে কোনো কোনো পরিবার চিকিৎসা খরচ চালাতে গিয়ে অর্থনৈতিকভাবে পঙ্গু হয়ে পড়ে।

কমেন্ট ২. কষ্ট পেলাম এদেরকে জীবিত দেখে। মরলে ভালো হতো।

কমেন্ট ৩. আগে বাইক চালাত খুব স্পিডে। এখন থেকে হুইল চেয়ার চালাবে খুব সাবধানে।

কমেন্ট ৪. এসব (খুব বাজে একটা গালি ছিল। সেটা আর বইয়ে লিখলাম না) বাইকারদের হাত-পা ভাঙতে দেখলে আমার বিন্দুমাত্রও মায়া লাগে না। এদের কারণে আমার ভাগনির একবার খুব বড় একটা অ্যাকসিডেন্ট হয়। মাথায় বড় রকমের আঘাত পায়। মরতে মরতে বেঁচে গেছে। আর ওই ছোকরার শুধু হাত পা ছিলছে। এগুলারে দেখলে জুতাইতে মন চায়।

কমেন্ট ৫. কোনো কোনো দুর্ঘটনা বা মৃত্যু যে মানুষের স্বস্তির কারণ হয়, তা এই পোস্টের কমেন্টগুলো পড়ে বুঝতে পারলাম।

কমেন্ট ৬. বাইকের টপ স্পিড তুলে উড়াধুরা চালানো কোনো বাহাদুরি নয়! লিজেন্ড বাইকার তারাই, যারা নিরাপদে বাইক চালিয়ে পরিবারের কাছে ফিরে আসতে পারে।

ভয়েস অব গুলিস্তান

গুলিস্তানের মোড়। নামটা মনে পড়লেই চোখের সামনে ভেসে ওঠে ঢাকা শহরের সবচেয়ে বিশৃঙ্খল এবং অস্থির অবস্থার এক মোড়ের কথা। হকারের হাঁকডাক, জোকারের কসরত, চোর-বাটপারের আনাগোনা, পকেটমারের জোচ্চুরি—এখানে যেন নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার।

এই যখন অবস্থা, গুলিস্তান কর্তৃপক্ষ বিষয়টা নিয়ে নড়েচড়ে বসলেন। গুলিস্তানের মোড় থেকে এই বদনাম ঝেঁটিয়ে বিদায় করার উদ্যোগ নিলেন। বিভিন্ন মোড়ে মাইক লাগানো হলো। গুলিস্তানে আসা জনগণকে কী কী করা যাবে না, আর কীভাবে চলতে হবে এটা জানানোর উদ্যোগ নেওয়া হলো।

মাইকে একজন ঘোষক নিরলসভাবে ঘোষণা করে যাচ্ছেন—সম্মানিত পথচারীবৃন্দ, শুনছেন ভয়েস অব গুলিস্তান!... অনুগ্রহ করে রাস্তাঘাটে অপরিচিত কারও দেওয়া কিছু খাবেন না।

আপনার টাকা-পয়সা, মোবাইল ফোন, মানিব্যাগ, স্বর্ণালংকার ইত্যাদি সাবধানে রাখুন।

ট্রাফিক আইন মেনে চলুন। যখনতখন তাড়াহুড়া করে দৌড়ে রাস্তা পারাপার হবেন না! দেখেশুনে রাস্তা পার হোন। কানে হেডফোন লাগিয়ে রাস্তায় চলাচল করবেন না।

সম্মানিত ড্রাইভার ভাইয়েরা, যত্রতত্র গাড়ি পার্ক করবেন না। তুচ্ছ বিষয় নিয়ে যাত্রীসাধারণের সাথে তর্কবিতর্কে জড়াবেন না।

এক গাড়ি আরেক গাড়ির সাথে যাত্রী উঠানো নিয়ে প্রতিযোগিতা করবেন না। হাইড্রলিক হর্ন ব্যবহার করবেন না।

অনুগ্রহ করে যেখানে-সেখানে যাত্রী উঠানামা করাবেন না।

হকাররা ফুটপাত দখল করে দোকান বসাবেন না।

যাত্রীরা গাড়ির জানালার পাশে বসে মোবাইল ব্যবহার করবেন না।

... চমৎকার এই উদ্যোগটা দেওয়া হয়েছিল জনসাধারণের ভালোর জন্যই। কিন্তু, কথায় আছে—সুখে থাকতে ভূতে কিলায়। মানামানির ভেতর দিয়ে যাচ্ছে না কেউ। ঘোষণাগুলো এক কানে ঢুকিয়ে অন্য কান দিয়ে বের করার যেন আপ্রাণ চেষ্টা করছে।

চলছে যে যার মতো।

পথচারীরা যেভাবে পারছে রাস্তা পার হচ্ছে। যেখানে-সেখানে ময়লা-আবর্জনা ফেলছে। পাশেই পাবলিক টয়লেট, অথচ এক ভদ্র লোককে দেখা গেল, রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে 'হিসু' করে ঠান্ডা মাথায় লোকচলাচলের জায়গাটা নোংরা করছে।

বাসড্রাইভাররা যত্রতত্রই গাড়ি পার্ক করছে। তুচ্ছ বিষয় নিয়ে যাত্রীদের সঙ্গে ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হচ্ছে। উভয়েই একে অন্যের গায়ে হাতও তুলছে!

হকারদের দৌরাত্ম্য চলছেই! ২ হাজার টাকা দামের জুতা ২০০ টাকা কেন বলল, এই নিয়ে ক্রেতাকে উত্তম-মাধ্যম দেওয়া হচ্ছে।

মাইকের ঘোষণা, ঘোষকের মুখেই শোভা পাচ্ছে; কার্যে পরিণত হচ্ছে না। খুব কম মানুষই মানছে। গা ছাড়া অবস্থা। মানবে দূরে থাক, ইচ্ছাটাও কারও মধ্যে নেই।

এ পরিস্থিতি আজকাল সর্বত্রই। রাস্তাঘাটে। হাটে-বাজারে। ঘরে-বাইরে। এখানে-ওখানে সবখানে।

ছেলে বাবাকে মানছে না।

স্ত্রী স্বামীকে মানছে না।

কর্মচারী মালিককে মানছে না।

ছাত্র শিক্ষককে মানছে না।

জনগণ 'আইনকে' মানছে না। কী একটা বিতিকিচ্ছিরি অবস্থা!

অথচ নিয়ম মেনে চলাটাই ছিল সকলের জন্য মঙ্গলজনক। এতে সমাজ হতো সুন্দর। পথ হতো মসৃণ। শিক্ষালয় হতো কোমল। সংসার হতো সুখময়। সম্পর্ক হতো গভীর এবং মায়াময়।

মানার যোগ্যতা না থাকায় আমাদের জীবন হয়েছে ওই গুলিস্তানের মোড়ের মতোই। চির অশান্তির। চির হাঙ্গামার। হইচই আর বিশৃঙ্খলার।

ইনসাফগার রিকশাওয়ালা

বাসার কাছেই এক জায়গায় পথচারীদের জটলা দেখে এগিয়ে গেলাম। গিয়ে দেখি, ঘটনা সাংঘাতিক। এক রিকশাওয়ালার নাক-মুখ ফাটিয়ে দেওয়া হয়েছে। কাজটা করেছে এক যাত্রী। ফাটাফাটি করার কারণ, রিকশাওয়ালা ভাড়া বেশি চাচ্ছে।

রিকশাওয়ালাও কম যায় না। প্রতিশোধ নিতে চাচ্ছে। সে কোমরে গামছা বেঁধে ফাটা নাক নিয়েই তেড়ে গিয়ে বলল, 'তোর আইজকা খবর আছে!'

যাত্রীর ভাবভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে, সেও ছেড়ে দেওয়ার পাত্র না, আরও মারধর করবে। সে শার্টের হাতা গোটাতে লাগল। সঙ্গে শুধু গামছাটা নেই বলেই কোমরে কিছু বাঁধতে পারছে না। জটলার ভিড় ক্রমেই বাড়ছে। কেউ কেউ শুরু থেকেই মূল ঘটনার সাক্ষী হলেও অধিকাংশরাই বুঝতে পারছে না কী হয়েছে। তবুও কৌতূহলী হয়ে ভিড় করে আছে।

পথেঘাটে প্রায়ই যাত্রী আর রিকশাওয়ালার মধ্যে বাদানুবাদ হতে দেখা যায়। এ ক্ষেত্রে রিকশাওয়ালাদের নরম পেয়ে যাত্রীরা সবসময়ই মারধর করেও পার পেয়ে যায়। নিরীহ রিকশাওয়ালাটি কিংবা কুলি-মজুরটি কোনো প্রতিবাদ করে না, নীরবে সেই মার সহ্য করে যায়। কিন্তু এই রিকশাওয়ালাটি পুরোই ব্যতিক্রম। সে 'ছেড়ে কথা বলা'র ধারেকাছেও গেল না। সিটের নিচ থেকে রিকশার ইয়ামোটা চেইন বের করে বলল, 'ব্যাটা ফকিরনি! এমন হইলে ভাড়া আগেই ফাইনাল করে নিলি না কেন?'

এতক্ষণে বুঝতে পারলাম পুরো বিষয়টা। যাত্রী ভদ্রলোক ভাড়া চূড়ান্ত করে ওঠেননি। এজন্যই ঘটনাটা মারপিটের দিকে মোড় নিয়েছে। বোঝা গেল দোষের পরিমাণ যাত্রীরই বেশি।

আমরা অনেকেই ভুলটা করি। কোথাও যাব। রিকশা ডাকলাম, 'এ্যাই, যাবেন?'

'যামু।'

ব্যস, 'যামু' বলার সঙ্গে সঙ্গেই হুট করে উঠে পড়ি। ভাড়াটা চূড়ান্ত করে নিই না। এমন একটা ভাব করি, যেন যত ভাড়াই হোক, দিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা আমার আছে। অথচ গন্তব্যে পৌঁছার পর বোঝা যায় ক্ষমতার দৌড়।

কী হয় তারপর?

পরিণতি তো চোখের সামনেই। রিকশাওয়ালাকে বকাঝকা। চোখ রাঙানি। মারধর করা। কখনো কখনো উলটো মার খাওয়া, আরও কত কী! অথচ রিকশায় ওঠার আগে ভাড়া এবং সঠিক গন্তব্য চূড়ান্ত করে নিলেই কিন্তু আর কোনো ঝামেলা থাকে না। নইলে কতটা বিড়ম্বনা যে পোহাতে হয়, ওপরের ঘটনাটিই এর প্রমাণ।

সামান্য সচেতনতার অভাবে রাস্তাঘাটে পড়তে হয় লজ্জাজনক পরিস্থিতিতে। আমরা পরের ঘটনাটা একটু পড়ি—

একবার এক নতুন জামাই রিকশায় করে শ্বশুরবাড়ি যাচ্ছিলেন। বাড়ির সামনে নেমে ভাড়া দিতেই রিকশাওয়ালা বলল, 'এইটা কী দিলেন?'

'ভাড়া দিলাম।'

'আপনি যেই জায়গার কথা বইলা রিকশায় উঠছেন, এইটা কি সেই জায়গা? সেই জায়গা তো অনেক পেছনে রাইখা আসছি।'

'তো, এখন কী করতে হবে?'

'২০ টাকা বেশি দিতে হবে।'

ব্যস, শুরু হয়ে গেল ঝামেলা। যদিও এইটুকু বেশি আসার ভাড়া ১০ টাকাও না। কিন্তু রিকশাওয়ালা নাছোড়বান্দা। ২০ টাকার কম সে কিছুতেই নেবে না। জামাইও কম যান না। তিনি তার আত্মঅধিকার আদায়ে

সোচ্চার! তেড়েফুঁড়ে বলে উঠলেন, 'এর জন্য পাঁচ টাকা বেশি নিতে পারো, তাই বলে ২০ টাকা! তোমাকে এক টাকাও ভাড়া দেবো না। পারলে কিছু করো।'

কথা কাটাকাটির একপর্যায়ে রিকশাওয়ালা আচমকা নতুন জামাইয়ের গালে চড় বসিয়ে দিলো। চড় খেয়ে ভদ্রলোক হতভম্ব হয়ে গেলেন। লজ্জাজনক এক পরিস্থিতি। তিনি হয়তো এতটা আশা করেননি।

এই ঘটনায় মুহূর্তেই লোকজন জড়ো হয়ে গেল। রিকশাওয়ালার কাণ্ড দেখে সবাই ক্ষিপ্ত। শালা-সম্বন্ধীরাও এগিয়ে এলো। অতি উৎসাহী কেউ কেউ রিকশাওয়ালাকে চড়-থাপ্পড় দিয়ে ভাগিয়ে দিলো। রিকশাওয়ালাকে যতই মারধর আর তিরস্কার করা হোক, নতুন জামাইয়ের মানসম্মান কি এতে বাড়ল না কমল?

রিকশায় ওঠা নিয়ে আরেকটা ব্যাপারেও সচেতন থাকা চাই। মনে করুন, কোথাও যাবেন। রিকশার জন্য অপেক্ষা করছেন। পেয়েও গেলেন! ভাড়া জিজ্ঞাসা করতেই রিকশাওয়ালা বলল—'ওঠেন স্যার। ইনসাফ করে দিয়ে দিয়েন।'

আপনার মনে হতে পারে, বেচারা বুঝি খুবই সৎ। অত্যন্ত ইনসাফগার! মনটা খুবই নরম। ওর মতো মানুষই হয় না। ...না ভাই, ভুলেও এমনটা ভাববেন না। ওদের এই 'ইনসাফ' এর ফাঁদে পড়লেন তো মরলেন! টাকা দিতে দিতে আপনার পকেট 'সাফ' হয়ে যাবে, তবুও ইনসাফের নাগাল পাবেন না। অর্থাৎ বিশের ভাড়া ৪০ টাকা দিয়েও মন ভরাতে পারবেন না।

জায়গা চেনে না এমন রিকশায়ও উঠবেন না দয়া করে। ঝামেলা হবে। ন্যায্য ভাড়া দিলেও রিকশাওয়ালা বলবে—'আরেকটু বাড়ায়া দেওন যায় না?'

প্রখ্যাত মুবাল্লিগ প্রফেসর হামিদুর রহমান সাহেব একবার এমনই এক পরিস্থিতিতে পড়েছিলেন। দেশে তখন কোনো এক রাজনৈতিক দলের অবরোধ চলছে। বাস বন্ধ। রিকশা ছাড়া আর কোনো গতি নেই। প্রফেসর সাহেব উত্তরা থেকে গাজিপুরের আইইউটিতে যাবেন। প্রায় ১০ কিলোমিটার। রিকশাওয়ালাকে গন্তব্য সম্পর্কে বিস্তারিত বলা হলো। রিকশাওয়ালা বলল, 'অসুবিধা নাই। চিনিয়ে নিয়ে গেলেই হবে।'

ভাড়া নিয়ে যতই পীড়াপীড়ি করা হচ্ছিল, রিকশাওয়ালা একই কথা বলছিল—'অসুবিধা নাই... ।'

এদিকে অবরোধ-পরিস্থিতির কারণে অন্য কোনো রিকশাও পাওয়া যাচ্ছিল না। অগত্যা প্রফেসর সাহেব রিকশায় উঠে বসলেন। গন্তব্যে পৌঁছার পর যখন ভাড়া দিতে গেলেন, তখনই দেখা গেল বিড়ম্বনা। তিনি পরিমাণের চেয়ে বেশি ভাড়া দেওয়ার পর জানতে চাইলেন, 'ভাই, এতে চলবে তো?'

রিকশাওয়ালা গালভরা হাসি হেসে বলল, 'হুজুর, আগেই তো বলছি আমি কিছু বলব না।'

প্রফেসর সাহেব আরও কিছু টাকা বাড়িয়ে দিয়ে জানতে চাইলেন, 'এবার ঠিক আছে তো ভাই?'

'আমি আর কী বলব হুজুর! আপনার যা খুশি।'

পরিস্থিতি এমন অবস্থায় গিয়ে দাঁড়াল যেন, প্রফেসর সাহেব যতবারই টাকার পরিমাণ বাড়াচ্ছিলেন, রিকশাওয়ালা ততবারই বলছিল—'আমি আর কী বলব হুজুর! আপনার যা খুশি।'

অর্থাৎ কিছুতেই তাকে সন্তুষ্ট করা যাচ্ছিল না। সব রিকশাওয়ালা যে একই রকম, আমি তা বলছি না। ভালো এবং ইনসাফওয়ালা অবশ্যই আছে। কে ভালো কে মন্দ সেটা যাচাই করার উপায় যেহেতু নেই, সেহেতু সবকিছু আগেভাগে স্পষ্ট করে নেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ।

রিকশা ভাড়া নিয়ে প্রফেসর হজরতের আরেকটি শিক্ষণীয় ঘটনা। একবার তিনি সফরসঙ্গী-সহ রিকশায় করে কোথাও যাচ্ছিলেন। যেখানে যাবেন, স্পষ্ট করে বলে নিলেন। ভাড়াও চূড়ান্ত করে নিলেন। চলতে চলতে হঠাৎ মনে হলো অন্য একটা কাজ আছে। মাঝপথেই নেমে পড়তে হবে তিনি রিকশাওয়ালাকে বললেন, 'ভাই, আমি এখানেই নেমে পড়ব।'

রিকশাওয়ালা প্যাডেল চালানো থামিয়ে দিলো। রিকশাটা একপাশে দাঁড় করাল। প্রফেসর সাহেব রিকশা থেকে নেমে ভাড়া পরিশোধ করলেন। সফরসঙ্গী বিস্মিত হয়ে বলল, 'আপনি তো পূর্ণ ভাড়াই দিয়ে দিলেন। আমরা তো মাঝপথে নেমে পড়েছি। এখানকার ভাড়া তো এত টাকা না!'

প্রফেসর সাহেব বললেন, 'আমি যখন ভাড়া চূড়ান্ত করেছি, তখন থেকেই বেচারার আশা ছিল গন্তব্যে পৌঁছে সে ওই টাকাটা পাবে। আমি তো তার আশাটা ভঙ্গ হতে দিতে পারি না!'

সুবহানাল্লাহ! কী অপূর্ব শিক্ষা!

সুস্থ থাকার নিরাপদ টিপস

পটোল দিয়ে রান্না করা কই মাছটা অসাধারণ হয়েছে। সাথে ছিল ঘন করে রাঁধা মসুরির ডাল। ছিল, তেল-পেঁয়াজে ভাজা প্রিয় আলুর ভর্তা। ক্ষুধাও ছিল প্রচুর। চকচকে চোখে খাবারগুলোর দিকে তাকিয়ে খেতে বসলাম। খেতে খেতে হঠাৎ মনে হলো—'ক্ষুধা লাগলে খাও, ক্ষুধা থাকতে উঠে যাও!'

কথাটার ওপর আমল করলাম। শরীরটা ঝরঝরে লাগছে!

অতিরিক্ত খাওয়ার তিক্ততা অনেক। মুটিয়ে যাওয়া, বদহজম হওয়া, চর্বি বেড়ে যাওয়া, ওরস্যালাইন নিয়ে টানাটানি—তিক্ততার শেষ নেই। অধিকাংশ রোগের জন্ম হয় পেট থেকে। পেট ঠিক তো দুনিয়া ঠিক। রোগমুক্তি ছাড়াও কম খাওয়ার মধ্যে রয়েছে বহুবিধ উপকারিতা।

মহামানবেরা পেটকে তিন ভাগে ভাগ করতেন। এক ভাগ খাবারের জন্য। এক ভাগ পানির জন্য। আরেক ভাগ খালি রাখতেন ইবাদতের নিমিত্তে।

খলিফা হারুনুর রশিদ রাহিমাহুল্লাহ একবার যুগশ্রেষ্ঠ চারজন হেকিমকে তার মজলিসে ডেকে পাঠালেন। তাদের কাছে খলিফা জানতে চাইলেন, 'এমন কোনো ওষুধ কি আছে, যার কোনো পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নেই?'

হিন্দুস্তানি হেকিম বললেন, 'হালিলায়ে সিয়াহ।'

ইরাকি বললেন, 'হাব্বুর রাশাদ।'

ইংরেজ হেকিম বললেন, 'গরম পানি। যা কোনোদিক দিয়েই শরীরের ক্ষতি করে না।'

সাওয়াদের অধিবাসী হেকিম সাহেব বললেন, 'সবগুলোই ভুল। হালিলা পাকস্থলী এবং কলিজার জন্য খুবই ক্ষতিকারক। হাব্বুর রাশাদও বিশেষ সুবিধের নয়; পাকস্থলীকে পিচ্ছিল করে ফেলে। আর গরম পানির কথা বলছেন? ওটাও ক্ষতিকর। পাকস্থলী শিথিল করে ফেলে। যা বিভিন্ন রোগকে স্বাগত জানায়!'

হেকিমগণ নড়েচড়ে বসলেন। 'তাহলে আপনিই অনুগ্রহ করে বলুন, কোন ওষুধটি বেশি উপকারী?'

'সবচেয়ে উপকারী হলো—ক্ষুধা লাগলে খানা খাওয়া। ক্ষুধা থাকতেই খাওয়া শেষ করা।'

মজলিসে উপস্থিত তিনজন বিজ্ঞ চিকিৎসকই সমস্বরে বলে উঠলেন, 'বড় চমৎকার বলেছেন! সুস্থ থাকার জন্য পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াহীন এর চেয়ে উত্তম চিকিৎসা আর হতেই পারে না।'

তাহাজ্জুদের মজা

ডা. খন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর রাহিমাহুল্লাহ একবার একটা বয়ান শুনিয়েছিলেন। এক ভদ্রলোক দুঃখ ভারাক্রান্ত মন নিয়ে তার কাছে এসে বললেন, 'হুজুর, আমি একটা সমস্যায় পড়েছি।'

'কী সমস্যা?'

'আমার একটা মূল্যবান জমি আছে। হাইরাইজ বিল্ডিং করব বলে এক ডেভেলাপারকে জমির দলিলপত্র দিয়েছিলাম। এখন ওরা দলিলও ফেরত দিচ্ছে না, কোনো অ্যাগ্রিমেন্টও করছে না। মনে হচ্ছে আমার কয়েক কোটি টাকার এই জমিটা হাতছাড়াই হয়ে যাবে। ওদের কাছ থেকে দলিল আদায় করা কঠিন। ওরা সন্ত্রাসী পোষে। খুব খারাপ লোক। বড় বিপদে আছি। আমাকে কেউ বলেছে—অমুক হুজুরের কাছে যাও। জিন দিয়ে উদ্ধার করে দেবে। কেউ বলেছে—তমুক ফকিরের কাছে যাও। জাদু-টোনা করে কাজ হাসিল করে দেবে।

কিন্তু আমি আপনার কাছে শুনেছি, ওসব করলে ঈমান চলে যায়। এজন্য আপনার কাছে ছুটে এসেছি। এমন কোনো সুন্নত আমল বলে দেন, যেন আমি আমার জমিটা ফেরত পাই।'

আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর বললেন, 'কঠিন বিপদ বা মানুষের অনিষ্ট থেকে বাঁচার জন্য কিছু দোয়া আছে। এগুলো অর্থ বুঝে তাহাজ্জুদের সেজদায় গিয়ে পড়বেন। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শেখানো দোয়ার অসিলায় আশা করা যায় আল্লাহ আপনার দোয়া কবুল করে নেবেন।'

মাসখানেক পর ভদ্রলোক এসে বললেন, 'আলহামদুলিল্লাহ, কাজ হয়ে গেছে! বলা নেই কওয়া নেই, ওরা বাসায় এসে দলিলগুলো দিয়ে গেছে।'

'মাশাআল্লাহ, ভালো হয়েছে।'

'কিন্তু আমার ভালো লাগেনি।'

'কেন?'

'দলিলের আশায় এই কয়েক দিন তাহাজ্জুদ পড়েছি। আল্লাহর দরবারে দোয়া করেছি। শেষদিকে এসে (দোয়া আর তাহাজ্জুদে) এত মজা লাগছিল! মনে হচ্ছিল দলিলগুলো যদি আরও ছয় মাস পর ফেরত দিত, কত ভালোই না হতো!'

স্বচ্ছলতার সংজ্ঞা কী?

সুন্দরী প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করা প্রতিযোগীদের মধ্যে সবই থাকে। শুধু থাকে না কমনসেন্স। H^2O মানে 'ধানমন্ডির একটা রেস্টুরেন্ট'—এই উত্তরটি হতে পারে এর উৎকৃষ্ট উদাহরণ। তো, এমনই এক প্রতিযোগিতার ফাইনাল রাউন্ডে এক সুন্দরীকে প্রশ্ন করা হলো—'আপনাকে যদি একটা ইচ্ছা পূরণের ক্ষমতা দেওয়া হয়, আপনি কোন ইচ্ছাটা পূরণ করতে চাইবেন?'

প্রতিযোগিনী বললেন, 'আমি চাইব দেশে একজনও গরিব না থাকুক। সবাই আমরা সমান হয়ে যাই।' (অর্থাৎ সবাই পয়সাওয়ালা, ধনী হয়ে যাক!)

আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে, জবাবটিতে উদারতা এবং বুদ্ধিমত্তা প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু একটু চিন্তা করলেই বোঝা যাবে এই জবাবে বেশ অসাড়তা আছে।

ধরুন আপনি সকালবেলা ঘুম থেকে উঠেই অনুভব করলেন, প্রচণ্ড টয়লেট চেপেছে। দৌড়ে গেলেন টয়লেটের দিকে। অনেক টাকা খরচ করে টয়লেটটি বানিয়েছেন। বিদেশি টাইলস, বিদেশি কমোড। পুরো ফিটিংসটাই বিদেশি। কিন্তু টয়লেটে ঢুকেই আপনার আক্কেলগুড়ুম। কমোডের ভেতরের পাইপ আটকে ময়লায় সয়লাব হয়ে আছে। বের হয়ে এসেছে সবকিছু। দুর্গন্ধে টেকা যাচ্ছে না।

যতই বিদেশি ফিটিংস হোক, যেই কাজে টয়লেটটি বানানো হয়েছে সেই কাজ তো করা যাচ্ছে না! ছুটে গেলেন এক ক্লিনারের কাছে। 'ভাই, একটু তাড়াতাড়ি আয়।'

'কেন?'

'টয়লেট ময়লায় ভরে গেছে। কিছুতেই সরানো যাচ্ছে না।'

'কিন্তু আমি তো এখন ময়লা পরিষ্কারের কাজ করি না।'

'কেন?'

'জানেন না, আমি এখন অনেক টাকার মালিক হয়ে গেছি? ওই সব ছোটখাটো কাজ কি এখন আর আমাকে দিয়ে মানায়?'

আশেপাশে অন্য ক্লিনারদের দরজায়ও নক করলেন। সবার একই কথা। '... এইসব কাজ এখন আর করি না।'

হতাশ হলেন। কার কাছে যাবেন? কে করে দেবে কাজটা? সব ক্লিনারই বড়লোক হয়ে গেছে।

সেদিনই সন্ধ্যাবেলা। প্রচণ্ড গরম পড়েছে। তার ওপর বিদ্যুৎ নেই। গরমে হাঁসফাঁস অবস্থা। একবার মোমবাতি খোঁজেন তো আরেকবার হাতপাখা। হঠাৎ লক্ষ করলেন, আশেপাশের সব বাড়িতে বিদ্যুৎ আছে; শুধু আপনার বাসায়ই নেই। ঘটনা কী? এমন হলো কেন? ছুটে গেলেন ইলেক্ট্রিশিয়ানের দোকানে। গিয়ে দেখেন দোকানে মস্তবড় তালা ঝুলছে। দোকানের সাইনবোর্ড থেকে নম্বর নিয়ে ফোন করে বললেন, 'ভাই একটু আসবেন?'

'কেন, কী ব্যাপার?'

'বাসার লাইনটা ডিস্টার্ব করছে। ঠিক করে দিতে হবে।'

ইলেক্ট্রিশিয়ান মুখের ওপর বলে দিলো, 'আমার এখন অনেক পয়সা। ওই সব 'ডিস্টার্ব' নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় আমার নেই।'

বিদ্যুৎ সমস্যা থাকায় রাতে ভালো ঘুম হয়নি আপনার। ঘুম না হয় হলো না। কিন্তু না খেয়ে তো আর থাকতে পারবেন না! ঘুমে ঢুলুঢুলু হয়ে ব্যাগ হাতে বাজারের উদ্দেশ্যে বের হলেন। রাস্তায় নেমেই আপনার মেজাজ খারাপ হয়ে গেল। একটা রিকশারও দেখা নেই। ঘটনা কী? রিকশাওয়ালারা সব গেল কোথায়? আজকে হরতাল-টরতাল নেই তো!

আকাশের চাঁদ হাতে পাওয়ার মতো হঠাৎই একটা রিকশা পেয়ে গেলেন। পরিচিত রিকশাওয়ালা। আপনার দিকেই আসছিল। প্রায় ছুটে গিয়ে উঠে বসতেই রিকশাওয়ালা বলল, 'নামেন।'

'নামব কেন? বাজারে চলো।'

'আমি কি আপনাকে আমার রিকশায় উঠতে বলছি? নামেন তো! গতকাল থেকে আমি বড়লোক হয়ে গেছি। এখন আমার অনেক টাকা-পয়সা। এখন কি আর এত পরিশ্রমের কাজ আমাকে দিয়ে মানায়?'

'তাহলে রিকশা নিয়ে বের হলে কেন?'

'গ্যারেজে জমা দেওয়ার জন্য। নামেন তো!'

মন-টন খারাপ করে রিকশা থেকে নেমে পায়ে হেঁটেই বাজারে গেলেন। গিয়ে দেখেন পুরো বাজার ফাঁকা। মাছওয়ালা, গোশতওয়ালা, তরকারিওয়ালা, মুটে-মজুর কেউ নেই। আপনি বাজারে ঢুকলেই যারা এতদিন 'স্যার স্যার' বলে ডাকাডাকি করে মাছ-মাংস বিক্রি করত। যারা আপনার মাছের ব্যাগ, চাউলের বস্তা, তরকারির ঝাঁকা সযত্নে কাঁধে বয়ে নিয়ে রিকশায় উঠিয়ে দিত, কিংবা বাড়ি পৌঁছে দিত তাদের কারও মুখই আজ দেখতে পাচ্ছেন না।

পরে জানতে পারলেন, ওরা সবাই বড়লোক হয়ে গেছে। একেকজন হঠাৎ প্রচুর টাকা-পয়সার মালিক হয়ে গেছে। এখন আর কেউ এসব ছোট কাজ করছে না।

এখন বলুন, এরকম একটা পৃথিবী কি কখনো সৌন্দর্য বয়ে আনতে পারে? কখনোই না। সবাই যদি ধনী হয়ে যায়, তাহলে তো সমাজের ভারসাম্যই নষ্ট হয়ে যাবে। কেউ কাউকে পাত্তা দেবে না। পৃথিবী ভরে যাবে অহংকারী আর দাম্ভিক লোকে। এজন্যই আল্লাহ্ তাআলা কাউকে গরিব আর কাউকে ধনী বানিয়ে রেখেছেন।

সবাই যদি ধনী হতো, বাথরুম পরিষ্কার করার মতো লোক পাওয়া যেত না। বাড়ির দারোয়ান, কাজের মহিলা, কুলি-মজুর, গাড়ির ড্রাইভার, কাউকেই সাহায্যকারী হিসাবে পাওয়া যেত না। সবার হাতেই যদি সমান পয়সাকড়ি থাকত, তাহলে শহরগুলো সব ময়লার ভাগাড় হয়ে যেত। দুর্গন্ধে বসবাস করাই সম্ভব হতো না।

সচ্ছলতার সংজ্ঞাটা আরেকটু ক্লিয়ার হতে, নিচের এ কথোপকথনটি একবার দেখে নিতে পারি—

'আচ্ছা হুজুর, একটা প্রশ্ন করি?'

'জি, করুন।'

'এই যে দেশে এত গরিব লোক! টাকা নেই, পয়সা নেই; খাবার নেই, অভাব-অনটনে হাহাকার অবস্থা। আল্লাহর এ কেমন বিচার! তিনি তো পরম করুণাময় এবং অতি দয়ালু। তিনি কি পারেন না সবাইকে ধনী করে দিতে?'

'পারেন।'

'তাহলে করেন না কেন?'

'কারণ, তিনিই জানেন কে কতটুকু সহ্য করতে পারবে।'

'মানে?'

'ধরুন, একলোকের কঠিন অসুখ হলো। ডাক্তার তার রোগ পরীক্ষা করে একগাদা ওষুধ লিখে দিলেন। সবগুলো ওষুধই মজাদার—মিষ্টি সিরাপ! লিখে দিয়ে বললেন, 'এগুলো খান। সাত দিন পর দেখা করবেন। তখন আরও কিছু ওষুধ বাড়িয়ে দেবো।'

ঘটনাক্রমে আপনিও গেলেন একই ডাক্তারের চেম্বারে। আপনার অসুখ অত বড় নয়। সামান্য জ্বর আর অল্প একটু ডায়রিয়া। ডাক্তার সাহেব আপনার নাড়ি টিপেটুপে লেটারপ্যাডটা হাতে নিলেন। কলমের খোঁচায় খসখস করে একটা ওরস্যালাইন আর দুটো প্যারাসিটামল লিখে দিয়ে বললেন, 'এতেই চলবে। আর আসতে হবে না।'

আপনার প্রচণ্ড মন খারাপ হলো। প্রেসক্রিপশন হাতে, নাছোড়বান্দার মতো ডাক্তার সাহেবের ঘাড়ের কাছে দাঁড়িয়ে রইলেন। একটুও নড়াচড়ার নাম নিলেন না। ডাক্তার সাহেব বললেন, 'দাঁড়িয়ে আছেন কেন, আর কিছু বলবেন?'

'অবশ্যই বলব। আপনার তো স্যার একেবারেই বিচারবুদ্ধি নেই! আগের রোগীকে কতগুলো মিষ্টি মিষ্টি ওষুধ লিখে দিলেন। দিয়েই ক্ষান্ত হলেন না, বলে দিলেন, আবার যেন আসে, আরও ওষুধ দেবেন। অথচ আমাকে দিলেনই কেবল দুটো। তাও একটা আবার তিতা। তার ওপর বলে দিলেন, আর যেন না আসি। এ কেমন বিচার আপনার? আমি কি ভিজিট কম দিয়েছি? আমাকে কি পারতেন না আগের রোগীর মতো মিষ্টি স্বাদের এক ব্যাগ ওষুধ লিখে দিতে!'

আপনার কথা শুনে ডাক্তার সাহেব হতভম্ব হবেন, নাকি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হবেন বুঝতে পারছিলেন না। মাথাটা চুলকে মনে মনে বললেন, 'এমন বোকাসোকা লোকও কি দুনিয়ায় আছে!'

প্রিয় ভাই, চাইলেই ডাক্তারকে দিয়ে আপনি আপনার ইচ্ছামতো ওষুধ লিখিয়ে আনতে পারবেন না। এটা উচিতও হবে না। কারণ একেক রোগীর জন্য একেক পদ্ধতি। কোন রোগীকে কী ওষুধ দিতে হবে, ডাক্তারই ভালো বোঝেন। ডাক্তারের ওপর ওস্তাদি করে কোনো ফায়দা তো হবেই না; প্রাণটাও হারাতে হতে পারে।

সম্পদের ব্যাপারটাও এমনই। খুবই মিষ্টি আর রসালো। কিন্তু তাই বলে সবার জন্য সমান উপযোগী না। আমাদের রব ভালো করেই জানেন, কাকে কতটুকু দিতে হবে। কে কী পরিমাণ 'লোড' নেওয়ার যোগ্য। অতিভোজন যেমন বদহজমের কারণ, অতিসম্পদও হতে পারে অকাল ধ্বংসের কারণ।

ইসলাহি মাজালিস গ্রন্থে শাইখুল ইসলাম মুফতি তাকি উসমানি হাফিজাহুল্লাহ একটা ঘটনা লিখেছেন। ঘটনাটা তিনি শুনেছেন ডাক্তার আবদুল হাই আরেফি রহ.-এর কাছ থেকে। মুসা আ. তুর পাহাড়ে যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে এক গরিব লোক বলল, 'হে আল্লাহর নবী! আপনি তো আল্লাহর সঙ্গে কথা বলতে যাচ্ছেন।'

'হ্যাঁ।'

'আমার জন্য কি একটা দরখাস্ত করা যাবে?'

'কী দরখাস্ত?'

'আমি খুবই অসহায়। ভীষণ অভাবে আছি। আল্লাহ যেন আমাকে সচ্ছলতা দেন।'

মুসা আ. আল্লাহর সঙ্গে কথা বলার পর ওই লোকটার দরখাস্তটি তুলে ধরলেন, 'বেচারা খুবই অসহায় অবস্থায় আছে। অভাব তার পিছু ছাড়ছে না। পেরেশান হাল। হে আমার রব, আপনি তাকে সচ্ছলতা দিন!'

'কতটা সচ্ছলতা দেবো? অল্প না বেশি?'

'আপনি তো মহান দাতা। বেশিটাই দিন!'

আল্লাহ বললেন, 'আচ্ছা, যাও। তাকে আমি প্রচুর সম্পদের মালিক বানিয়ে দিলাম।'

এরপর অনেকদিন কেটে গেছে। একদিন মুসা আ.-এর মনে হলো, লোকটাকে একটু দেখে আসা দরকার, কেমন কাটছে তার সচ্ছল জীবন! দরজায় আওয়াজ দিতেই এক মহিলা দরজা খুলে দিয়ে বললেন,

'কাকে চান?'

'এটা কি অমুকের বাড়ি না?'

'জি।'

'আমি তার সঙ্গে দেখা করতে চাই।'

'সে তো আর বেঁচে নেই। অনেক আগেই মারা গেছে।'

মুসা আ. পেরেশান হয়ে গেলেন। আল্লাহর কাছে আরজ করলেন, 'হে আল্লাহ, কিছুই বুঝতে পারছি না। লোকটা আপনার কাছে সচ্ছলতা চেয়েছিল। অথচ জীবনটাই হারিয়ে বসল!'

'মুসা পেরেশান হয়ো না। তুমিই তো বলেছিলে, আমি যেন তাকে বেশি সম্পদ দান করি। সামান্য সময়ের দুনিয়ায় তাকে আর কীই-বা দেবো! কতটুকুই-বা ভোগ করতে পারবে সে? এজন্য আমি তাকে আমার কাছে ডেকে নিয়েছি। এবং জান্নাতের বিশাল সম্পদের মালিক বানিয়ে দিয়েছি।'

ওপরের ঘটনাটা পড়ার পর মনে হয়তো প্রশ্ন আসতে পারে, আল্লাহ তো চাইলে লোকটাকে দুনিয়াতেও সম্পদশালী করতে পারতেন, আবার আখেরাতেও বেহেশত দিতে পারতেন।

তা পারতেন। কিন্তু দুনিয়ায় সচ্ছলতা পেয়ে হয়তো সে আল্লাহকে ভুলে যেত। একদিকে সম্পদের মোহে দ্বীন থেকে সরে যেত, অন্যদিকে গুনাহ আর গোমরাহিতে পড়ে বঞ্চিত হতো জান্নাতের নেয়ামত থেকেও। আমও যেত ছালাও যেত! সুতরাং আল্লাহ যাকে যতটুকু দেন, বুঝেশুনেই দেন। তিনিই জানেন, কে কতটুকু যোগ্য। কে সম্পদ পেয়ে শুকরিয়া আদায় করবে, আর কে এর মোহে পড়ে হারিয়ে যাবে জাহান্নামের অতল গহ্বরে।

স্ক্রু লাগানো হাত

একলোক ঈদের আগের রাতে লঞ্চে করে বরিশালে যাচ্ছিল। ঈদের ছুটি। লঞ্চ ছিল যাত্রীতে ঠাসা। তিল ধারণের ঠাঁই ছিল না। লোকটা অনেক চেষ্টা করেও কোথাও একটু শোয়ার জায়গা পেল না। রাত গভীর হতেই ঝিমানি এসে গেল! বসে বসে কতক্ষণই-বা ঝিমানো যায়?

শোয়ার মতো কোনো ব্যবস্থা করতে না পেরে লোকটা হতাশ। মনে মনে ভাবল—

: আল্লাহ তো যা করেন ভালোর জন্যই করেন! হাত-পাগুলো যদি স্ক্রু সিস্টেম করে দিতেন কতই-না ভালো হতো! স্ক্রু খুলে ব্যাগে ভরে, ছোট্টটি হয়ে কোনো এক কোণায় আরামসে ঘুমিয়ে পড়া যেত।

ভাবতে ভাবতে লোকটা বসে বসেই ঘুমিয়ে পড়ল। ঘুম ভাঙল সকালে। ঘুম থেকে উঠে তো তার চক্ষু চড়কগাছ! ব্যাগটা নেই। চুরি হয়ে গেছে। লোকটা চিৎকার করে বলে উঠল—

: আলহামদুলিল্লাহ!

চিৎকার শুনে লোকজন বলল,

: কী হয়েছে ভাই? এত খুশি কেন? লটারি লেগেছে?

: না ভাই, ব্যাগ হারিয়ে ফেলেছি!

: সেকী! ব্যাগ হারিয়ে গেলে তো বেজার হওয়ার কথা! আপনি দেখছি আলহামদুলিল্লাহ বলছেন!

: আরে, জানেন না। আমার হাত-পাগুলো চুরি হওয়ার হাত থেকে বেঁচে গেছে! স্ক্রু খুলে যদি ব্যাগের ভেতর রেখে দিতাম, কী করুণ অবস্থাটাই না হতো!

আল্লাহর এমন অসংখ্য নেয়ামতের প্রমাণ পাওয়ার পরও কিছুলোক প্রশ্ন তুলবে—

: আল্লাহ যা করেন ভালোর জন্যই তো করেন, তাই না?

: হ্যাঁ! অবশ্যই ভালোর জন্য করেন।

: তাহলে তিনি তাঁর আদরের বান্দাদের অসুখ-বিসুখ দেন কেন?

: ও আচ্ছা, এই কথা? পরীক্ষায় এ প্লাস পেতে তো অনেক ছাত্রই আশা করে। এ প্লাস তখনই পায়, যখন সে সব প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে পেরে সর্বোচ্চ নম্বর পেয়ে উতরে যায়।

পৃথিবীতে এমন কোনো বান্দা কি আছে, পরকালে সুখী হতে চায় না? বেহেশতের অফুরান নেয়ামত ভোগ করতে চায় না? নিশ্চয় নেই! আল্লাহ তাআলা প্রকৃত অর্থেই দয়ালু। তিনিও চান না, কোনো বান্দা দোজখে যাক। চির অসুখী হোক।

কিন্তু বেহেশত পেতে চাইলেই তো হবে না; সর্বোচ্চ নম্বর তো পেতে হবে। যাদের পক্ষে সেই পরিমাণ নম্বর পাওয়া সম্ভবপর হয়ে ওঠে না, তাদেরকে সে পর্যন্ত পৌঁছাতেই মহান আল্লাহ তাকে বিপদাপদ দেন, অসুখ-বিসুখে পতিত করেন। এই অসুখ-বিসুখের অসিলায় বান্দার মর্যাদা বেড়ে যায়। পরকালে চিরসুখী হওয়ার পথটা সহজ হয়ে যায়।

একটি দুর্ঘটনা তিনজন ক্ষতিগ্রস্ত

গভীর রাতে এক ট্রাকড্রাইভার তার ট্রাক নিয়ে বের হলো। ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক ধরে চলছিল গাড়িটি। চলতে চলতে ড্রাইভারের চোখে নেমে এলো রাজ্যের ঘুম। অনেক চেষ্টা করেও ঘুম আটকাতে পারল না।

মহাসড়কের পাশে ছোট্ট একটা পানদোকান। দোকানদার প্রতিদিন রাতের বেলা দোকানেই ঘুমাত। সেদিন সে আত্মীয়ের বাড়ি বেড়াতে গিয়েছিল।

রাতের ডিউটি শেষে একলোক ক্লান্ত হয়ে বন্ধ দোকানটার সামনের টেবিলটায় বসে ছিল। বসে বসে টাকা-পয়সার হিসাব কষছিল। ট্রাকটা ছুটে এসে প্রচণ্ড গতিতে সেই লোক-সমেত দোকানের ভেতরে ঢুকে গেল। ক্লান্ত লোকটা সঙ্গে সঙ্গেই স্পটডেড। দোকানটাও ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। গাড়িটাও ক্ষতিগ্রস্ত হলো। হাত-পা ভেঙে গুঁড়ো গুঁড়ো হলো ড্রাইভারের।

সকালবেলা অ্যাকসিডেন্ট দেখতে অনেক লোক জমায়েত হলো। কেউ কেউ বলল, 'আল্লাহর এইটা কেমন বিচার? কী অন্যায় ওদের? কেন এমন হলো?'

খোলা দৃষ্টিতে মনে হতে পারে, সত্যিই তো! কোনো অন্যায় ছাড়া কেন এদের ওপর এ অবিচার হলো? এবার পুরো বিষয়টার পোস্টমর্টেম করা যাক।

১. ড্রাইভার

ড্রাইভারের একটা বৃদ্ধা মা ছিল। মায়ের সঙ্গে সে কখনোই ভালো আচরণ করত না। খাবার দিত না ঠিকমতো। কথায় কথায় গালিগালাজ করত। অ্যাকসিডেন্টের দিন সকালে নরাধমটা মাকে মারধর পর্যন্ত করেছিল! মারের ব্যথা আর মনের কষ্ট সইতে না পেরে বৃদ্ধা মা মনে মনে বলেছিল—'যেই হাত-পা দিয়ে আমাকে মেরেছিস তা যেন লুলা হয়ে যায়।'

২. টেবিলে বসা লোক

দোকানের সামনের টেবিলে যে লোকটা বসে বসে টাকা-পয়সার হিসাব কষছিল, সে ছিল ভয়ংকর ডাকাত। তার অত্যাচারে সবাই অতিষ্ট ছিল। মজলুম জনগণ দোয়া করছিল—'এই হারামিটা মরে না ক্যান? আল্লাহ যেন তারে উঠায়ে নেন।'

সেই রাতেও সে এক এতিমের ঘরের সব মালামাল ডাকাতি করে বিক্রি করে দিয়েছিল। বিক্রির লাভ-লস হিসাব করতেই সে ওখানে বসেছিল। কুরআনের ভাষায়—'এতিমের সম্পদ লুণ্ঠনকারীর ধ্বংস অনিবার্য।'

[সুরা বাকারা, ২৭৬]

মাজলুমের দোয়া আল্লাহ তাআলা অতিদ্রুত আসমানে উঠিয়ে নেন। তাই সে তার ন্যায্য শাস্তিই পেয়ে গেল।

৩. দোকান

আর দোকানটা? সেটা কেন ধ্বংস হলো? আসলে দোকানদার ছিল সুদের কারবারি। চড়া সুদে অনেককেই ঋণের জালে আটকে ফেলেছিল। গরিব অসহায় লোকদের প্রলোভন দেখিয়ে ঋণ দিত আর সময়মতো পরিশোধ করতে না পারলে বিভিন্নভাবে অত্যাচার করত। দোকানটাও দিয়েছিল সুদের টাকায়। কুরআনের ভাষায়—'সুদ সম্পদকে ধ্বংস করে।'

[সুরা নিসা, ১০]

মূলত আল্লাহ যা করেন ভালোর জন্যই করেন। সেই ভালোটার পেছনের কারণগুলো পুরোপুরি জানি না বলেই আমরা কখনো কখনো (নাউজুবিল্লাহ) আল্লাহকে দোষারোপ করে বসি। এটা আমাদের জ্ঞানেরই স্বল্পতা। আমাদের জ্ঞান এত ক্ষুদ্র যে, এইটুকু জ্ঞান দিয়ে বড়জোর বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষ সাধন করা সম্ভব। কিন্তু আল্লাহর জ্ঞানের বিশালতাকে পরিমাপ করা সম্ভব নয়।

কষ্ট করার নাম ইসলাম না, হুকুম মানার নাম ইসলাম

মসজিদে জামাত চলছে। ইমাম সাহেব রুকুতে চলে গেছেন। এক মুসল্লি দৌড়ে গিয়ে রুকু ধরার চেষ্টা করলেন। কাজ হলো না। এর আগেই দুর্ভাগ্যবশত কার্পেটের সঙ্গে হোঁচট খেয়ে তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। এতে তিনি হাতে এবং হাঁটুতে ব্যথা পেলেন প্রচণ্ড।

বয়সে প্রবীণ হওয়ায় অজুও ছুটে গেল। জামাত তো পেলেনই না; কনকনে শীতের মধ্যে দ্বিতীয়বার অজু করতে হলো। অথচ তিনি যদি মসজিদে প্রবেশ করে, ধীরেসুস্থে, শান্তচিত্তে নামাজে দাঁড়াতেন তাহলে এর কিছুই ঘটত না।

এক মুসল্লি অজু করছিলেন। দুই হাতের কব্জি ধোয়া, কুলি করা, নাকে পানি দেওয়া... শুরু থেকেই তিনি তাড়াহুড়ার মধ্যে ছিলেন। ওদিকে ইমাম সাহেব সুরা ফিল পড়ছেন। সুরার প্রায় শেষ পর্যায়ে এসে গেছেন।

মুসল্লিটি তখন মাথা মাসেহ করছিলেন। এরপর কোনোরকমে এক পা ধুয়েছেনমাত্র; হঠাৎ তিনি দৌড় লাগালেন। প্রথমে ভেবেছিলাম জরুরি কিছু বাইরে ফেলে এলেন কিনা! পরে দেখলাম এমন কিছু না! তিনি রাকাত ধরার জন্যই ছুটে গিয়েছেন। তার টার্গেট ছিল ইমাম সাহেবের সুরা শেষ করার আগেই আমি মসজিদে ঢুকব। অথচ বেচারার অজুটাই শুদ্ধ হয়নি। ওই মুহূর্তে ঠিকমতো অজু করাটাই ছিল তার ওপরে হুকুম; রাকাত ধরা না।

আরেক ভদ্রলোককে দেখলাম নামাজ শেষে গেটের কাছে এসে হইচই করছেন। এতে মসজিদের ভেতরে থাকা মুসল্লিদের নামাজের মনোযোগ নষ্ট

হচ্ছিল। ভদ্রলোক এই গেট থেকে ওই গেটে ছুটছেন আর বারবার বলছেন, 'ধ্যাৎ, আর মসজিদেই আসব না!'

ঘটনা হলো, বেচারার জুতা চুরি হয়েছে। জুতাজোড়া গেটের বাইরে রেখেই ছুটে গিয়ে রাকাত ধরেছিলেন। নামাজ শেষ করে এসে দেখেন, জুতা নেই। এখন তার আক্ষেপ, মসজিদে এসে দামি জুতাগুলো হারিয়ে ফেললাম। অথচ তিনি যদি ছোটাছুটি না করে জুতাজোড়া নিরাপদ জায়গায় রেখে নামাজে দাঁড়াতেন, তাহলে হয়তো এই দুর্ঘটনা ঘটত না। তার মনটাও খারাপ হতো না।

'কষ্ট হবে' এমন কিছু ইসলাম আমাদের ওপর চাপিয়ে দেয়নি। যেখানে বলা হয়েছে, কেউ যদি জামাতের উদ্দেশ্যে মসজিদের দিকে রওনা দেয়, আর গিয়ে দেখে জামাত শেষ হয়ে গেছে, তবুও সে পূর্ণ সাওয়াব পাবে। সেখানে রাকাত ধরার জন্য দৌড়াদৌড়ি করার প্রয়োজনই-বা কী?

রমজানের রোজা কখনো কখনো ২৯টা হয়। এতে অনেককে অসন্তুষ্ট হতে দেখেছি। বিশেষ করে মহিলারা। আফসোস করতে থাকেন—'ইশ! এইবারও ৩০টা পুরা হলো না। একটা রোজাই তো। কী এমন কষ্ট হতো? পুরা একটা রোজার সাওয়াব থেকে বঞ্চিত হলাম!'

এসব 'সরলপ্রাণ' লোকদের কে বোঝাবে, যিনি ৩০ রোজা ফরজ করেছেন, তিনিই একদিন আগে শাওয়ালের চাঁদ উদিত করে ২৯টাতে রমজান শেষ করে দিয়েছেন। এই হুকুম মেনে নেওয়ার মধ্যেই কল্যাণ। এর বাইরের আফসোসটুকু অবান্তর।

একবার এক এলাকায় সফরে গিয়েছি। ৪৮ মাইলের অনেক বেশি দূরত্ব। গ্রাম্য এলাকা। মসজিদে নামাজ আদায় করব। ইমাম সাহেব ছুটিতে আছেন। মুসল্লিরা বললেন, 'আপনিই নামাজটা পড়ান।'

'কিন্তু, আমি তো মুসাফির।'

'সমস্যা নেই। পড়ান আপনিই।'

ভেবেই নিয়েছিলাম, মুসাফির আর মুকিমের নামাজের পার্থক্যটা তারা জানেন। তবুও ইকামতের পর বললাম, 'আমি কিন্তু দুই রাকাত পড়ব। সালাম ফেরানোর পর আপনারা দাঁড়িয়ে বাকি দুই রাকাত পড়ে নেবেন।'

তাকবিরে তাহরিমা বলতে যাব, এমন সময় মেম্বার বা মাতব্বর গোছের একজন বলে উঠলেন, 'দাঁড়ান, দাঁড়ান! দুই রাকাত পড়বেন কেন? নতুন আইন কই পাইছেন? সারা জীবন আমরা...!'

সালাত বন্ধ রেখে দীর্ঘ সময় নিয়ে তাদের বোঝালাম যে, 'এটাই মাসআলা। মুসাফিরের সালাতে কসর করতে হয়। আপনারা হয়তো এই মাসআলা আগে শোনেননি, তাই বুঝতে পারছেন না।'

আমার কথা কেউ সহজভাবে মেনে নিতে পারল না। তাদের কথা হচ্ছে—'মুসাফির হইছেন তো কী হইছে? তাই বসে কি নামাজ মাফ আছে? কষ্ট করে হলেও পুরা চার রাকাতই পড়ান।'

সরলপ্রাণ মুসল্লিদের বোঝাতেই পারলাম না, যিনি জোহর, আসর, এশা চার রাকাত ফরজ করেছেন, তিনিই আবার মুসাফিরের জন্য দুই রাকাত করে কমিয়ে দিয়েছেন। কেউ যদি অতি আনুগত্য দেখাতে গিয়ে চার রাকাত পড়তে চায়, অন্যায় হবে। শুধু অন্যায় না, এ হবে হুকুমের বিরোধিতা করা।

কারণ, হুকুম মানার মধ্যেই কামিয়াবি; জোশের তোড়ে ভেসে যাওয়ার নাম দ্বীন না, এ হচ্ছে—বদদ্বীনি।

এসো আমরা মোমের মতো বাঁচি

রিকশা ভাড়া বাঁচানোর জন্য পায়ে হেঁটেই বাড়ি ফিরছিলেন। ধীর কদমে আনমনে হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ রাস্তার মোড়ে জরাজীর্ণ শরীরের এক ভিখিরি হাত পেতে দাঁড়াল আপনার সামনে। তার করুণ শুকনো চাহনিকে অগ্রাহ্য করা যায় কিনা ভাবছিলেন। পারলেন না। রিকশা ভাড়ার পুরো টাকাটা ভিখিরিকে দান করে বাড়ি ফিরলেন শূন্য পকেটে।

রক্ত দান করছেন এক মুমূর্ষুকে। রোগী আপনার কেউ না। তারপরও রক্ত দিচ্ছেন। কারণ, 'বেঁচে থাকতে হলে মানুষের রক্তের প্রয়োজন হয়।'

রাস্তার এক টোকাই-পিচ্চির হাতে ১০০ টাকার একটা কচকচে নোট দিয়ে তার রিয়াকশন দেখার অপেক্ষা করছেন। ছেলেটা কয়েক সেকেন্ড

নোটের দিকে ইতস্তত তাকিয়ে থেকে ভুবনমোহিনী যে হাসিটা উপহার দিলো, সেই দৃশ্যের অসম্ভব সৌন্দর্য বলে বোঝানো অসম্ভব।

এই আপনিই একবার-দুবার নয়, বারবার ছুটে যাচ্ছেন উচ্ছৃঙ্খল প্রতিবেশী কিংবা ছন্নছাড়া সহপাঠী যুবকটির কাছে এক সুন্দর জীবনের নিমন্ত্রণ নিয়ে। পথহারা পথিকের সমীপে ব্যয় করছেন আপনার অর্থ, সময়, জীবন।

হ্যাঁ, নিজেকে পুড়িয়ে, কিন্তু অন্যকে আলো দিয়ে মোমের মতো বেঁচে থাকার কথাই বলছিলাম এতক্ষণ। সুবিশাল এই বসুন্ধরায় দুদিনের এই বাঁচা-মরায় আমাদের জীবনটা কীভাবে মসৃণ ও সুন্দর হতে পারে তার কিছু নমুনাই বাতলে দিচ্ছিলাম।

পরোপকার, কল্যাণকামিতা, ভালোবাসা ও ত্যাগ মিশ্রিত মোমের দেয়াল হয়ে যাপিত হয় কি আমাদের জীবন? যে জীবনে কল্যাণকামিতার ভাবনা নেই, নিঃস্বার্থ ভালোবাসার কোনো উল্লাস নেই, সে জীবন জন্তু-জানোয়ারের, সে জীবন খেয়েদেয়ে মরে যাওয়ার। অতি তুচ্ছ সেই জীবন।

এমন জীবন আমাদের না হোক। বরং নিজেকে অন্যের তরে বিলিয়ে দেওয়ার মতো চির সুন্দর হোক আমাদের বেঁচে থাকা।

মানবতার দেয়াল

চৌরাস্তার মোড়। ব্যস্ততম জায়গা। নানান রঙের মানুষ। নানান ধরনের ঘর-বাড়ি। একপাশে 'মানবতার দেয়াল' নামে একটা বড়সড় সাইনবোর্ড ঝুলছে। সাইনবোর্ডের দুইপাশে দুটা হ্যাঙার ঝোলানো। ওপরে লেখা— 'আপনার যেটা প্রয়োজন, এখান থেকে নিয়ে যান। যেটা অপ্রয়োজনীয়, এখানে রেখে যান।'

এই সাইনবোর্ড দেখে অনেকেই নিজেদের অপ্রয়োজনীয় কাপড়চোপড় রেখে যাচ্ছিল। কেউ শার্ট, কেউ প্যান্ট, কেউ পাঞ্জাবি, কেউ কেউ অন্যান্য ব্যবহৃত জিনিসপত্রও দান করতে লাগল। দ্রুতই ভরে উঠল হ্যাঙারগুলো। এত বেশি জমা হলো যে, হ্যাঙারে আর জায়গাই রইল না। এরপর জমতে লাগল দেয়ালের নিচেও। অবাক করা বিষয় হলো, জমাই হচ্ছিল বেশি, খরচ হচ্ছিল কম। অর্থাৎ দিচ্ছিল সবাই, নিচ্ছিল না কেউই। দাতা সবাই, গ্রহীতা নেই।

এভাবে কয়েক দিন গত হলো। কাপড়ের স্তূপ বড় থেকে বড় হচ্ছিল। সবাই কানাঘুষা করতে লাগল, তাহলে কি এই শহরে গরিব, নিঃস্ব, অসহায় কেউ নেই!

হঠাৎ এক সকালে দেখা গেল, একটা কাপড়ও নেই। সব হাওয়া। একসঙ্গে এত কাপড় গেল কোথায়? নিজের প্রয়োজনে নিলে তো দুয়েকটা নিত। এতগুলো সরাত না। তাহলে কি কেউ চুরি করল?

এভাবেই চলছিল। প্রতিদিনই নতুন নতুন কাপড় জমা হয়, আর রাত ফুরোতেই সেগুলো কেউ এসে নিয়ে যায়। কে নেয় কাপড়গুলো? পাত্তা লাগাতে হবে। এলাকাবাসী পাহারা বসাল।

রাত বাড়ল। মানুষ এবং যানবাহনের কোলাহল একে একে থেমে গেল। পাহারাদাররা নড়েচড়ে বসল। চারিদিকে সজাগ দৃষ্টি। কোথায় যায় এত কাপড়? কে সেই চোর? আজ তাকে ধরতেই হবে। অপেক্ষা করতে করতে পাহারাদাররা ক্লান্ত। টুলে বসে ঘুমে ঢুলছিল। ভোর হবে যাচ্ছে।

কিন্তু কই, কেউ তো এলো না! তবে কি চোর ব্যাটা পাহারার ব্যাপারটা টের পেয়ে গেল?

রাতের একেবারে শেষভাগ। হঠাৎ আবছা আলোয় দেখা গেল থুত্থুরে এক বুড়ো লাঠিতে ভর করে মৃদুপায়ে 'মানবতার দেয়ালে'র দিকে এগিয়ে আসছে।

দেয়ালে ঝোলানো সবগুলো কাপড় একটা পুটলিতে বাঁধল। এরপর পুটলিটা কাঁধে করে যেদিক থেকে এসেছিল সেদিকেই হাঁটা ধরল। পাহারাদাররা একমুহূর্তও দেরি করল না। হাতেনাতে ধরে ফেলল বুড়োকে।

রাত পেরিয়ে সকাল হলো। আশেপাশে লোকজন জমা হয়ে গেল। জটলা ক্রমেই বড় হচ্ছিল। জটলার মধ্যখানে একটাই মুখ। গত রাতের সেই 'বুড়ো চোর'! মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে। ক্লান্ত, রোগাক্লিষ্ট শরীর। কুঁজো হয়ে আছে। যেন এখনই দাঁড়ানো থেকে ধপ করে বসে পড়বে।

বুড়োর এখন বিচার হবে। মেম্বার সাহেবের জন্য সবাই অপেক্ষা করছে। তিনি এলেই বিচারকার্য শুরু হবে। রোদের তাপ ক্রমেই বাড়ছে। বিচার দেখতে আসা লোকজনদের কপালগুলো সেই তাপে তেলতেলা হয়ে গেছে। তবুও কেউ নড়ছে না। তাড়িয়ে তাড়িয়ে বুড়োচোরের অসহায়ত্ব উপভোগ করছে। সবার মধ্যেই রাজ্যের কৌতূহল। বুড়োর কী বিচার হয়, দেখতে হবে। না দেখে কেউ যাবে না।

অবশেষে মেম্বার সাহেব এলেন। তিনি একটা জরুরি মিটিংয়ে ছিলেন। সরকারের তরফ থেকে গ্রামের গরিব, অসহায়দের জন্য ১০০ বস্তা চাল এসেছে। চালের বস্তাগুলো কাকে কাকে বণ্টন করা হবে এই নিয়ে লিস্ট করা হচ্ছিল। কিছু বস্তা 'এদিক-ওদিক' করার ব্যাপারও ছিল। এই নিয়েই এতক্ষণ ব্যস্ত থাকতে হয়েছে।

বিচার শুরু হলো। মেম্বার সাহেব হুংকার ছেড়ে বললেন—ওই চোরা, কেন চুরি করেছিস? তোর কি লাজ-লজ্জা নেই?

বুড়োচোর মাথা নিচু করে রইল। চারিদিকে এত লোক। কারও চোখেমুখে দরদের ছিটেফোঁটা নেই। সবাই তার দিকে ঘৃণ্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। সে ক্লান্ত গলায় বলতে শুরু করল, 'পরপর তিনদিন আমি ক্ষুধায় কষ্ট পেয়েছি। কেউ আমাকে খাবার দেয়নি। নিরুপায় হয়ে কাপড়গুলো

নিয়ে বাজারে বিক্রি করে আমি দুমুঠো খাবার জুটিয়েছি। আমি আমার প্রয়োজন মিটিয়েছি।

: তাই বলে চুরি করতে হবে? চোর কোথাকার!

: এটাকে চুরি বলছেন কেন?

: এ্যাঁহ, বড় বড় কথা বলে! চুরি নয়তো কী এটা?

: এটা চুরি নয়; প্রয়োজনীয়তা। মানবতার দেয়ালেই তো লেখা ছিল—আপনার যেটা প্রয়োজন, সেটা এখান থেকে নিয়ে যান। আমি আমার প্রয়োজনটুকুই নিয়েছি। এতে নিশ্চয় আমার অন্যায় হয়নি! আমি গর্বিত যে, গরিবদের রিলিফের চাল নিয়ে যাইনি।

তালা-চাবি প্রেম

জার্মানি। ইউরোপের অন্যতম প্রধান শিল্পোন্নত দেশ। ৩৫ ট্রিলিয়ন জিডিপি নিয়ে ইউরোপের বৃহত্তম অর্থনীতির দেশ হিসাবে এগিয়ে আছে। আয়তনের দিক থেকে ইউরোপের ৭ম বৃহত্তম রাষ্ট্র এটি।

ঢেউ খেলানো পাহাড় ও নদী উপত্যকা। ঘন অরণ্যাবৃত পর্বত ও বরফাবৃত আল্পস পর্বতমালা—দেশটির ভূ-প্রকৃতিকে বৈচিত্র্যময় করেছে।

দেশটির মধ্য দিয়ে ইউরোপের অনেকগুলি প্রধান প্রধান নদী যেমন রাইন, দানিউব, এলবে প্রবাহিত হয়েছে। এবং দেশটিকে একটি বাণিজ্যিক কেন্দ্রে পরিণত করতে সাহায্য করেছে।

ভক্সওয়াগন, বিএম ডব্লিউ, এডিডাস, মার্সিডিজ বেঞ্জ, সিমেন্স ইত্যাদির মতো সুপরিচিত বৈশ্বিক ব্রান্ডের ধনী দেশ জার্মানি। ১৬টি রাজ্য নিয়ে গঠিত এটি একটি সংযুক্ত ইউনিয়ন। এত এত সমৃদ্ধি থাকা সত্ত্বেও জার্মানিতে একটি জিনিসেরই বড় অভাব। পারিবারিক সম্প্রীতি। মজবুত পরিবারব্যবস্থা।

৩ লাখ ৫৭ হাজার ৩৮৬ কিলোমিটারের বিশাল আয়তনের দেশ হলেও, একই ছাদের নিচের ছোট্ট আয়তনকে সম্প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ

রাখতে পারছে না জার্মানি। ১৬টি রাজ্যকে জোড়া লাগাতে পারলেও, পারছে না পারিবারিক অনুরক্তিকে জোড়া লাগাতে।

বিজ্ঞান ও শিক্ষাব্যবস্থায় এগিয়ে থাকা এ দেশটিতে আছে নানান কুসংস্কারের ছোঁয়া। এর একটির সাক্ষী—রাইন নদীর ভাঙা ব্রিজের ওপর ঝুলিয়ে রাখা শত শত তালা।

নগরায়ণের উঁচু হারের দেশ জার্মানিতেও ভাঙা ব্রিজ!

অবাক লাগছে?

লাগারই কথা।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মানরাই ব্রিজটি বোমা মেরে উড়িয়ে দেয়। ইচ্ছা করেই। যেন ব্রিটিশ বাহিনী শহরে প্রবেশ করতে না পারে। সেই ভাঙা ব্রিজটি এখন জার্মানদের ঐতিহাসিক নিদর্শন।

ব্রিজের ধ্বংসাবশেষের ওপর, তারের বেড়ার গায়ে ঝুলে আছে অসংখ্য তালা। নতুন কেউ এখানে গেলে তালার বহর দেখে ভিরমি খাবে। তবে একটু লক্ষ করলেই দেখা যাবে, প্রতিটি তালাতেই লেখা আছে 'কাপল'দের নাম।

দুজনের মধ্যে প্রেম হয়েছে, তালার ওপর মিস্ত্রী দিয়ে খোদাই করে নিজেদের নাম লিখিয়ে নিয়ে ঝুলিয়ে দিয়ে গেছে।

কোনোটায় আছে স্বামী-স্ত্রীর নাম। নতুন বিবাহ। সারা জীবন একসঙ্গে থাকার প্রতিজ্ঞা নিয়ে ঝুলিয়ে দিয়েছে তালা। এরপর সেই তালার চাবিটি ফেলে দেবে রাইন নদীর গভীর জলে।

তাদের ধারণা, চাবিও খুঁজে পাওয়া সম্ভব না, তালাও খুলবে না, প্রেমও ছুটবে না। তালার মতো প্রেমটাও আজীবন আটকে থাকবে।

ভেঙে পড়া পারিবারিক কাঠামোকে জোড়া লাগানোর এ এক আজব পদ্ধতি। হাস্যকর এ ভাবনার বিপরীত প্রতিফলন ঘটে জার্মান পত্রিকাগুলোতে। যেখানে উঠে আসে বিচ্ছেদের অহরহ খবর। কেউ টেকে দুই বছর। কেউ কেউ এক-দেড়। কারও 'চাবি' দুইদিনেই আবিষ্কৃত হবে যায়। অর্থাৎ ছুটে যায় তালা-চাবির ঠুনকো সম্পর্ক।

আসলে, সম্পর্ক টিকে থাকে পরস্পরের আত্মীক বন্ধনের ওপর। আত্মার বন্ধনের চেয়ে জোরালো আর কিছু নেই। দ্বীন নামক তালা যদি হয় সম্পর্কের বাঁধন, সহিষ্ণুতায় বাঁধানো চাবি হলো তার রক্ষাকবচ।

উন্নত নগরায়ণ, সুবিশাল আয়তন, প্রমাণ সাইজের আর্থিক উন্নতি কখনো ভালোবাসা বয়ে আনে না।

সহনশীলতা, সবর, একে অন্যকে ছাড় দেওয়ার মানসিকতা আর দ্বীন-অনুসরণই পারে সম্পর্ককে টিকিয়ে রাখতে।

বছরের পর বছর।

হিংসায় ধ্বংস, অহিংসায় বরকত

এক ছিল গরিব মুসলমান। খুবই অসহায় অবস্থা তার। দিন এনে দিন খাওয়া পর্যায়ের অসহায়ত্ব। অভাবের তাড়নায় লোকটার স্ত্রী সবসময় খিটমিট করত। বলত, 'যান না মসজিদে, আল্লাহর কাছে কেঁদেকেটে বলুন, তিনি যেন আমাদের অবস্থা ফিরিয়ে দেন।'

পাশের বাড়িতে বাস করত এক হিন্দু ব্যবসায়ী। বড় কোনো ব্যবসায়ীও না। সামান্য এক চটপটির দোকানদার। কিন্তু সে বেশ সচ্ছল ছিল।

তারও অবশ্য এমন অবস্থা ছিল না। সেও গরিব ছিল। আগে পরিবার নিয়ে অন্য কোথাও বসবাস করত। এখানে এসেছে বেশি দিন হয়নি। এরপর থেকেই উন্নতি হতে শুরু করেছে। অন্যদিকে গরিব মুসলমানটির অবস্থা যেন দিনদিন খারাপই হচ্ছে।

হিন্দুটির এত উন্নতি গরিব মুসলমানটির সহ্য হচ্ছিল না। সে প্রতিদিন আল্লাহর কাছে অভিযোগ করত, 'ও আল্লাহ, আমাকে আপনি এ কোন বিপদে ফেললেন? সে একটা হিন্দু মানুষ! আপনাকে মানে না। আপনার নাফরমানি করেও সে এত বেশি ভালো থাকছে! আর আমি মুসলমান হয়েও আপনার কাছ থেকে কিছুই পাচ্ছি না!'

এভাবেই চলছিল। গরিব লোকটার অবস্থার পরিবর্তন হচ্ছিল না। ন্যদিকে, হিন্দু চটপটিওয়ালা আরও বেশি সম্পদশালী হচ্ছিল। একদিন

পথে দেখা। গরিব মুসলমান প্রশ্নটি করেই বসল—'কী এমন কাজ করো বাপু তুমি? আল্লাহ তোমাকে সম্পদ দিয়েই চলছেন! অথচ আমাকে রেখেছেন অভুক্ত অবস্থায়?'

চটপটিওয়ালা জবাব দিলো, 'আপনি তো জানেন, আমার এক চটপটি-দোকান ছাড়া আর কিছুই নেই। এ দিয়ে কি সংসার চলে?'

'তাহলে? সুদ-ঘুষ খাও নাকি?'

'কী যে বলেন ভাই! এসব তো আমাদের ধর্মেও নিষিদ্ধ কাজ। আমি শুধু চটপটিই বিক্রি করি। তবে প্রতিদিন আমি একটা প্রার্থনা করি। হয়তো এর অসিলাতেই বরকত পাচ্ছি।'

'কী প্রার্থনা?'

'হে মুসলমানদের আল্লাহ, আমার পাশের এ মুসলমান পরিবারটির বরকতে আমাকে সম্পদশালী করুন!'

দ্বীন না থাকলে যা হয়

আমার এক কাজিন এক ভণ্ডপীরের মুরিদ হয়ে গেছেন। মুরিদ হওয়ার পেছনের কারণটা শুনলে যে কেউ অবাক হবেন। ভাববেন এই যুগেও এমন 'অতি বুদ্ধিমান' মানুষও তাহলে আছে!

অথচ তিনি একজন শিক্ষিতা মেয়ে। যথেষ্ট জ্ঞানবুদ্ধিসম্পন্ন এবং স্মার্ট! বিয়ের পর শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে দেখলেন সবাই এই ভণ্ডপীরের মুরিদ। নামাজ পড়ে না। রোজা রাখে না। দ্বীন-ধর্মের ধারেকাছে দিয়েও যায় না। সারাক্ষণ শুধু পীরবাবার লেকচারের ক্যাসেট শোনে। কাজিন সবার ওপর নাখোশ! কী শুরু করেছে ওরা? মুসলমান হয়ে ইবাদতের ধারেকাছেও যায় না; এ কেমন মুসলমান! কাজিন বরাবরই বিরোধিতা করে আসছিলেন। অন্যদিকে স্বামী-সহ ওই পরিবারের সবাই তাকে তাদের পীরবাবার দিকে দাওয়াত দিয়ে যাচ্ছিল। প্রতিদিন পাঁচবার করে শোনাচ্ছিল পীরবাবার গুণগান! তিনি অত্যধিক কামেল। যা বলেন তা-ই হয়। কেউ তার দরবার থেকে খালি হাতে ফেরে না—ইত্যাদি বলে বলে মাথাটা খেয়ে দিচ্ছিল! কাজিন সেসব বিশ্বাস করতেন না। ইগনোর করতেন। একদিন ঘটল 'অভাবনীয়' সেই ঘটনাটা। যেন হাতেনাতে 'কামালাত'-এর প্রমাণ পেয়ে গেলেন! ঘরে সেদিন কাজিন ছাড়া কেউ ছিল না। সবাই বেড়াতে গিয়েছিল। ঘর পুরোপুরি ফাঁকা। কাজিন রান্নাবান্নার কাজ করছিলেন। ওদিকে ক্যাসেট বাজছিল। হঠাৎ ক্যাসেটের সাউন্ড কমে গেল। প্রায় দেড় থেকে দুই মিনিট। সাউন্ড আর বাড়ে না। কাজিন মনে মনে বললেন, আজকেই প্রমাণ হবে। ক্যাসেটের সাউন্ড যদি ঠিক হয়ে যায় তাহলে বুঝব এই পীর কামেল। যদি আর ঠিক না হয়, তাহলে...।

কাকতালীয়ভাবে তখনই ক্যাসেটের সাউন্ড ঠিক হয়ে গেল। কাজিন অবাক! রান্না বাদ দিয়ে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন। 'হায় হায়, এ আমি কী করেছি! এত বড় ওলিরই কি না এতদিন বিরোধিতা করে এসেছি! তওবা তওবা!'

ব্যস, সেই থেকে যে আমাদের প্রাণপ্রিয় কাজিনটি বদলে গেলেন, আর তাকে ফেরানো গেল না। দেওয়ানবাগি পীরবাবার এতই ভক্ত হলেন, এমনও শুনেছি, মা-বাবা, ভাইবোনকে বলেছেন—আমি তোমাদেরও ত্যাগ করতে পারব, কিন্তু পীরবাবাকে ছাড়তে পারব না।

আত্মীয়স্বজনদের এমন কেউ নেই উনার জন্য আফসোস করেনি। মেয়ে হিসাবে খুবই ভদ্র এবং গুণবতী ছিলেন। ইবাদতগোজারও ছিলেন মোটামুটি। কিন্তু দ্বীনের যথাযথ জ্ঞান না থাকায় একটা সামান্য ঘটনাকেই কি না বিরাট বুজুর্গি মনে করে বসলেন।

নিজেরা তো বটেই; বড় আলেমদের দিয়েও বুঝিয়েছি। কাজ হয়নি। উলটো বলেছেন—আমার তো বরং আপনাদের নিয়ে আফসোস হয়। কী নিয়ে কবরে যাবেন? এখনো কামেল পীর চিনলেন না।

ফেসবুকে একবার একটা ভিডিয়ো দেখেছিলাম। কে বা কারা নবজাত শিশুকে ডাস্টবিনের পাশে রেখে চলে গেছে। লোকজন ভিড় করে দেখছে। কেউ শিশুটিকে উঠিয়ে নিচ্ছে না। হঠাৎ সেখানে এক জটাধারী, লালসালু পরিহিত বৃদ্ধের আগমন ঘটল। তিনি শিশুটিকে পরম মমতায় উঠিয়ে নিলেন। এরপর ধীরে ধীরে এগিয়ে গেলেন একটা শিশুসদনের উদ্দেশে। লোকজন পেছন পেছন ছুটতে লাগল। কেউ কেউ এই 'ভালো মানুষ'টার চরম ভক্ত হয়ে গেল। অনেকে মুরিদ হওয়ার আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করল। টাকা-পয়সা গছিয়ে দিতে লাগল বৃদ্ধের কাঁধে ঝোলানো গাট্টিতে। কেউ কেউ তো পায়েও পড়ে গেল। তাদের কথা হচ্ছে ইনি কামেল না হয়ে যায়-ই না। ইনাকে পেলেই পাওয়া হয়ে যাবে দ্বীন-দুনিয়া সব। সুতরাং একে আর ছাড়ছি না।

একটি অসহায় শিশুর আশ্রয়ের ব্যবস্থা করে নিঃসন্দেহে তিনি মানবিক একটি কাজ করেছেন। এর কোনো তুলনা হয় না। খুব কম মানুষই এইরূপ মানবিকতার পরিচয় দিয়ে থাকে। কিন্তু তাই বলে তো তিনি ওলি হয়ে যাননি। একটা লোক দিনের পর দিন বিনা গোসলে থেকে মাথায় জট বাঁধিয়ে ফেলেছেন। নামাজ-রোজা তো দূরের কথা, দ্বীনের মৌলিক শিক্ষাও যার মধ্যে নেই। বৈরাগীর মতো জীবনযাপন করছেন। তিনি কী করে 'ওলি'

হয়ে যেতে পারেন? দ্বীনের বুঝ না হয় বাদই দিলাম, সামান্যতম জাগতিক জ্ঞান থাকলেও তো এমন লোককে ওলির আসনে বসানোর কথা নয়!

দ্বীনের মৌলিক শিক্ষাটা সবার জন্যই জরুরি। এই শিক্ষা না থাকলে আসল-নকল পার্থক্য করা কঠিন। শুধু জাগতিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে 'দ্বীন কি আমরা কম বুঝি' ধারণা করে বসে থাকা একটা বড় রকমের নির্বুদ্ধিতা। এমন অনেক লোককে দেখেছি, সৌদি আরবকে দ্বীনের আলোকবর্তিকা মনে করেন।

সৌদি আরব গান-বাজনা আর নাটক-সিনেমার অনুমোদন দিলে তারা মনে করেন গান-বাজনা হালাল। সৌদির মেয়েরা বোরকা ছাড়া চলছে তো, বেপর্দা হালাল। অথচ তারাই আবার সৌদি আরবের ব্যভিচারের শাস্তির বিরোধিতা করেন। সেখানকার চুরি-ডাকাতির শাস্তিকে মানবাধিকার লঙ্ঘন বলে মনে করেন। দ্বীন থাকলে বুঝতে পারতেন, সৌদি আরব আমাদের দ্বীনের আলোকবর্তিকা না। আবার কুরআন ও হাদিসে জিনা-ব্যভিচারের যে শাস্তির কথা বলা হয়েছে, তারও বিরোধিতা করা যাবে না। সম্প্রতি সৌদি আরব তাবলিগ করাকে নিষিদ্ধ বলেছে, তাই বলে কি তাবলিগ করা হারাম হয়ে গেছে? যায়নি। অন্যদিকে, গান-বাজনা, নাটক-সিনেমা চালু করায় কি এগুলো হালাল হয়ে যাবে? মোটেও না। মূলত আমাদের দ্বীন শেখার মূল মাধ্যম হলো, কুরআন ও হাদিস। যেখানে আমাদের দেশেই কুরআন ও হাদিসের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করার মতো অসংখ্য উলামায়ে কেরাম বিদ্যমান, সেখানে সৌদি আরবকে মাধ্যম মনে করা, মনগড়া চিন্তা-চেতনা ছাড়া আর কিছু নয়।

ভালো হয়ে যাও মাহমুদ

কথাটি বলেছিলেন আমাদের এক সম্মানিত মন্ত্রী মহোদয়। নিঃসন্দেহে ভালো কথা। তিনি তার অনুগত কোনো এক শিষ্যের উদ্দেশে কথাটি বললেও, 'ভালো হয়ে যাওয়া' আসলে সবার জন্যই জরুরি। ভালো মানুষ দেখতে পেতে কে না চায়?

একজন নেতা চান, তার দলের লোকগুলো ভালো হোক। তাহলে তারা বাধ্যগত থাকবে। একজন মালিক চান, তার কর্মচারীরা ভালো হোক। তাহলে তারা খেয়ানত করবে না।

একজন বাড়িওয়ালা চান, তার ভাড়াটিয়ারা ভালো হোক। তাহলে তার বাড়ির কোনো ক্ষতি হবে না। গ্যাস, বিদ্যুৎ, পানি ইত্যাদির অপচয় হবে না। ঘরের ভেতর কোনো অবৈধ কর্মকাণ্ড করে বাড়িওয়ালাকে আইনি ঝামেলায় ফেলবে না।

একজন বাবা চান, তার সন্তান ভালো হোক। তাহলে এই সন্তানের কারণে বদনাম হবে না। প্রতিবেশীদের কাছে কখনো অপমানিত হতে হবে না। ভালো রেজাল্ট করুক, তাহলে কারও কাছে ছোট হয়ে থাকতে হবে না। সমাজে মাথা উঁচু করে বাঁচা যাবে।

বাসের ড্রাইভার চায়, তার যাত্রীরা ভদ্র হোক। তাহলে ভাড়া নিয়ে ঝামেলা করবে না। তুচ্ছ কারণে হেল্পারের গায়ে হাত তুলবে না।

একজন দেশপ্রধান চান, দেশের সব মানুষ ভালো হোক। তাহলে দেশটা সোনার দেশে পরিণত হবে। মারামারি, খুনোখুনি, ছিনতাই, চুরি-চামারি থাকবে না।

কিন্তু সমস্যা হলো, সবাই চায় অন্যরা গড়ে উঠুক। অন্যরা ভালো হয়ে যাক। নিজের জন্য খুব কম মানুষই চিন্তা করে। সবাই যদি অন্যের ভালো হয়ে যাওয়ার অপেক্ষায় থাকে, তাহলে তো কারোরই ভালো হওয়া হলো না!

আমি যদি আমাকে গড়তে না পারি, তাহলে 'সুন্দর পৃথিবী' গড়ার সব চেষ্টাই বৃথা যাবে। অতএব, শুধু মাসুদকে ভালো হওয়ার কথা বলে নিজে পিছিয়ে থাকব কেন? নিজেকেও বলতে হবে। নিজের ভালো হওয়াটা বেশি দরকার। চাইলে এখনই লিখে নিতে পারি। লিখে নিলে মনের মধ্যে কথাটা সহজেই গেঁথে যাবে ইনশাআল্লাহ। তো, শুরু হোক! একটা কলম হাতে নিই। এরপর নিচের এই শূন্যস্থানে বসিয়ে দিই নিজের নামটা—

"ভালো হয়ে যাও ...."

হেদায়েতের কথা আমরা অনেকেই শুনি। গুনাহ ছাড়া দরকার, নামাজটা ধরা দরকার, সর্বোপরি দ্বীনের পথে চলা দরকার—এই বোধ আমাদের কমবেশি সবার মনেই কাজ করে। কিন্তু তারপরেও কেন শুরু করতে পারি না, বলতে পারেন?

'কাল থেকে ভালো হয়ে যাব'—এই প্রবোধই আমাদের থামিয়ে রাখে। এটা আসলে প্রবোধ নয়, প্রবঞ্চনা। আজ নয় কাল। এখন নয় একটু পর। এই একটি ভাবনাই আমাকে 'পরপারের পাথেয় সংগ্রহ প্রতিযোগিতা' থেকে পিছিয়ে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট। এই ভাবনার জনক আর কেউ না; অভিশপ্ত শয়তান। সে সারাক্ষণই আমাদের পেছনে লেগে আছে। ভালো হতে চাইলেই বাধা দেয়। পাশে বসে কানের কাছে ফিসফিস করে বলতে থাকে, আল্লাহ অতি দয়াবান। নিশ্চয় তিনি মাফ করে দেবেন।

'কাল থেকে ভালো হয়ে যাব' বইটি শয়তানের এই কুমন্ত্রণাকে পেছনে ফেলে এগিয়ে যাওয়ার আহ্বান নিয়ে লেখা। দ্বীনের পথে ফেরার আকুতিভরা আহ্বান। গল্পের আদলে জনপ্রিয় লেখক মাহিন মাহমুদ এই বইটি লিখেছেন। দ্বীনের পথে ফেরার শক্ত উদ্দীপনা পেতে কিংবা অন্য কাউকে দ্বীনের পথে ফেরার আহ্বান জানাতে বইটি আপনার জন্য সেরা উপহার হতে পারে।

ISBN 9789848012833
B0098
মাকতাবাতুল হাসান